خودی

ڈاکٹر محمد اقبال

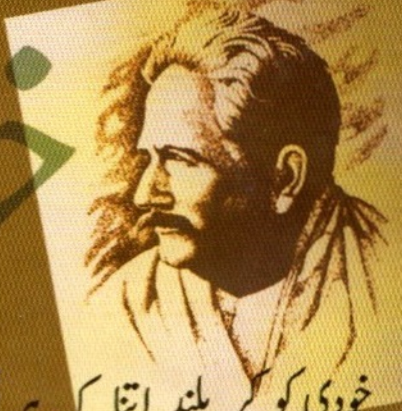

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

মুসলিম জাগরণের
মহাকবি ও দার্শনিক

আল্লামা ইকবালের

খুদিতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞান রহস্য

মোস্তাক আহ্‌মাদ

ঘুমন্ত ও দিকভ্রান্ত মুসলিম জাতিকে এগিয়ে চলার প্রেরণাদায়ী ও ঈমানী চেতনায় শাণিত করার মহাসৈনিক ড. আল্লামা ইকবাল (র.)। তাঁর ঐশীজ্ঞান ও স্রষ্টাতত্ত্বমূলক রচনা সুফিজগতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ রহস্যের সন্ধানে তিনি দক্ষ ডুবুরীরূপে গুপ্তজ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন।

তাঁর অবদানের শ্রেষ্ঠতম বিষয় হচ্ছে 'খুদীতত্ত্ব ও ঐশী জ্ঞানরহস্য' যা তাঁকে মুসলিম চিন্তাজগতে উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। মানব সাধারণকে তিনি আল্লাহর চরম ও পরমতত্ত্বের সন্ধান দিয়ে বিশ্বনবীর আদর্শ ও মহত্ত্বতকে বিকাশের ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

উপমহাদেশ তথা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর রেনেসাঁর দিকপাল হিসেবে খ্যাত শতাব্দীর চিন্তাজগতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা ইকবালের অবদান মুসলিম জাতিকে আজীবন ঋণী করে রাখবে। এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও সুফিতত্ত্বের মহান সাধক পুরুষ হিসেবে সমাদৃত। উম্মতে মুহাম্মদীর একনিষ্ঠ সেবক ও আশেকে রাসুল মাশুকে এলাহীর অনুগ্রহধন্য এই মহান কবি ও সংস্কারকের জীবন ও বাণী থেকে শক্তি সঞ্চয় করে মুসলিম জাতি অতীত ঐতিহ্য, বর্তমান করণীয় ও ভবিষ্যতের আলোকিত জীবন গড়তে অনুপ্রাণিত হতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

সেই মহান প্রত্যাশা নিয়েই আমরা আল্লামা ইকবালের জীবন, দর্শন ও ঐশীজ্ঞানের আলোচনাসমৃদ্ধ এ গ্রন্থের অবতারণা করেছি।

উৎসাহী ও আগ্রহী পাঠকগণ এ গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লামা ইকবাল ও তাঁর দর্শনতত্ত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে বলে আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

-লেখক

প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন

মোস্তাক আহ্‌মাদ দীর্ঘদিন যাবত আত্মোন্নয়ন ও গবেষণা কর্মে নিয়োজিত আছেন। সুফিতত্ত্ব ও ইলমে মারেফতের দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর গবেষণা কর্মের সাথে যুক্ত হয় ইসলামের আধ্যাত্মিক ও রূহানী জ্ঞানের বিষয় ইলমে তাসাওউফ। বর্তমানে তিনি মুর্শিদের নির্দেশে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ মারেফতের পথে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি ফরাজী কান্দি ওয়াইসিয়া আলীয়া মাদরাসা থেকে দাখিল ও আলিম সম্পন্ন করার পর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নকালে মাদরাসা থেকে ফাযিল ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তখনই হাফিজ, হাল্লাজ, রুমি, শেখ সাদি ও ওমর খৈয়ামের আধ্যাত্মিক ও রূহানী ভাবাবেগের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। সেই থেকেই তাঁর গবেষণা ও ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকের চর্চা অব্যাহত থাকে। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই, নিরলস প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে প্রত্যেকেই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে– এই মন্ত্রে উজ্জীবিত মোস্তাক আহ্‌মাদের শতাধিক গ্রন্থ পাঠক-নন্দিত হয়ে সর্বাধিক বিক্রয়ের রেকর্ডধারী। যা তাঁকে পেশাদার লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তরুণ প্রতিভাবান এই লেখকের জন্ম রংপুর জেলার অন্তর্গত বদরগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর গ্রামে ১৯৮২ সনের ১ জানুয়ারিতে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। পিতাঃ মাওলানা মুহাম্মদ তমিজ উদ্দীন (র.) ছিলেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মহাপুরুষ। মাতাঃ মনোয়ারা বেগম।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে তাঁর অনেক লেখা ছাপা হয়। কাজ করেছেন অ্যাসেনশিয়াল নিউজ-এর ক্রাইম রিপোর্টিং ও সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে। এরপর দৈনিক যুগান্তরে প্রুফ এডিটিং-এ কাজরত অবস্থায় স্কয়ার টয়লেট্রিজ লি.-এ মার্কেটিং বিভাগে এক বছর চাকরি করেন। তারপর দুটি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চীফ এক্সিকিউটিভ ট্রেইনার হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়া গল্প, কবিতা, ছড়া, উপন্যাস,সাইন্স ফিকশন, নাটক, চিত্রনাট্য, কিশোর ক্লাসিক, থ্রিলার ও অনুবাদসহ দেড়-শতাধিক গ্রন্থের পাঠকপ্রিয় লেখক মোস্তাক আহ্‌মাদ। তিনি একজন সুদক্ষ মোটিভেটর, ট্রেইনার, সফল শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে আধুনিক ধারার প্রবর্তক।

আল্লামা ইকবালের

খুদিতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞান রহস্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লামা ইকবালের

খুদিতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞান রহস্য

মোস্তাক আহ্মাদ

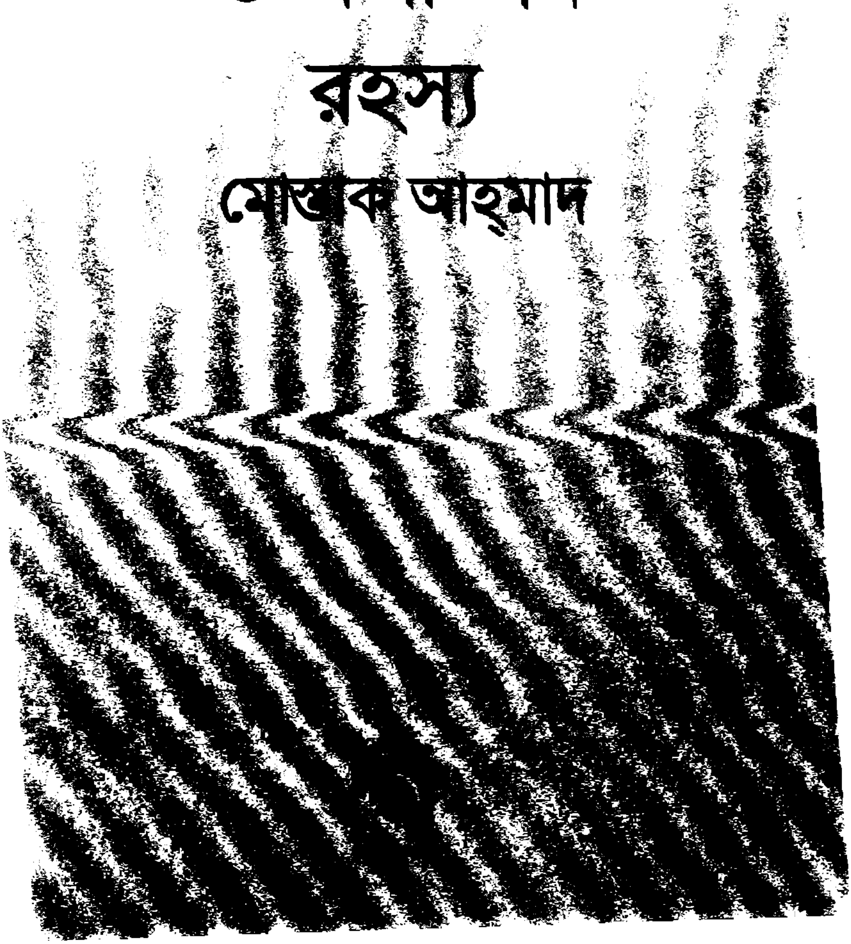

www.pathagar.com

মুসলিম জাগরণের মহাকবি ও দার্শনিক
আল্লামা ইকবালের
খুদিতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞান রহস্য
মোস্তাক আহ্মাদ

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১৬

রোদেলা ৩৮১

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
সেল: ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭ হৃষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা মাত্র

Muslim Jagoroner Mohakobi O Darshonic Allahma Iqbaler Khuditotto O Ayshigan Rohosso By Mostaque Ahamad
First Published Boimela 2016
Published by Riaz Khan. Rodela Prokashani
68-69. Paridas Road, Banglabazar. Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 450.00 only US $ 5.00
ISBN: 978-984-91335-6-8 Code: 381

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ইকবাল অনুরাগী আশেক-সালেক
আল্লাহ্ ও নবী প্রেমিকদের উদ্দেশে উৎসর্গীত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

পটভূমি	৯
মুসলিম চিন্তা ও জাগরণের মহাকবি আল্লামা ইকবাল (র.)	১৫
বিংশ শতাব্দীর মুসলিম জাগরণে আল্লামা ইকবালের অবদান	১৮
আল্লামা ইকবালের খুদীতত্ত্ব ও পরমজ্ঞানের রহস্য	৪৭
আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (র.) এর জন্ম ও বংশ পরিচয়	৬৫
মুসলিম চিন্তা ও জাগরণের মহাকবি আল্লামা ইকবাল (র.)	৬৯
মুসলিম বিশ্বে সৌভাগ্যের সূর্যোদয়	১৩৪
ইকবালের তাসাওউফ শিক্ষার পথিকৃৎ সাইয়েদ মীর হাসান	১৪০
টমাস আরনল্ড : ইকবালের অনন্য শিক্ষক	১৬৩
ইউরোপে ইকবালের শিক্ষা ও অধ্যাপনা জীবন	১৮৬
জার্মানী ও লন্ডনে ইকবালের আলোকিত জীবন	১৮৮
ইকবাল অনুরাগী পাশ্চাত্য মনীষী ও দার্শনিক ড. আর. এ নিকলসন	২১২
ইকবালের কাব্য-চর্চা ও স্বীকৃতি	২৪৬
রাজনীতির ময়দানে মহাকবি আল্লামা ইকবাল	২৫২
বিদেশ ভ্রমণ ও বিশ্ব জ্ঞানের সন্ধানী ইকবাল	২৬২
আল্লামা ইকবালের যুগান্তকারী দর্শনতত্ত্ব	২৬৫
ইকবালের সুফিভাব ও দর্শনতত্ত্ব	২৯৮
বাংলাদেশে ইকবাল চর্চা	৩৩২
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	৩৩৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পটভূমি

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি যুগে যুগে কালে কালে মানব কল্যাণ সাধনে নবী-রাসূল, অলী-আবদাল, গাউস-কুতুব তথা সংস্কারক প্রেরণ করেছেন। নবুয়তের পরিসমাপ্তি হলেও বেলায়েতি মিশন তথা যুগ সংস্কারকের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সকল দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি। যিনি আইয়্যামে জাহেলী যুগের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে আলোর পথে, সত্য ও কল্যাণের পথে, আল্লাহর পথে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূতরূপে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যার পদাঙ্ক অনুসরণে আবু বকর, ওমর, ওসমান ও হযরত আলী (রা.)-এর মত মহান সাহাবাগণ বিশ্ব ইতিহাসে উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁর সকল সাহাবা ও প্রেমিকগণ বিশ্ব মানবতার মুক্তি, কল্যাণ ও সত্যের পথে একনিষ্ঠ সেবকরূপে নজিরবিহীন দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইতিহাসে তার বিরল স্বাক্ষর রয়েছে। বিশ্বনবীর অনুসারী তাবঈ, তাব্ তাবঈ, আইয়্যামে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, মুফাস্‌সিরীনসহ অসংখ্য মহামনীষীর আগমন ও কর্মধারায় বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও বিকাশের চরম শিখরে উপনীত হয়েছেন। যারা নিরলসভাবে মুসলিম জাতির খেদমতে নিজেদের সদা-সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন। তেমনি উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত সুফিকবি ও দার্শনিক, আশেকে রাসুল ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (র.) ছিলেন ঘুমন্ত ও পতিত মুসলিম জাতির জাগরণ ও বিকাশের অবিসংবাদিত অগ্রসৈনিক।

ড. আল্লামা ইকবাল (র.) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট কলেজ লাহোর থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে ইউরোপ চলে যান এবং ট্রিনিটি কলেজ ক্যামব্রীজে ভর্তি হন। তিন বছর নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানের মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের লিংকন ইনস্টিটিউট থেকে বার-এট-ল ডিগ্রি লাভ করেন। লন্ডনে থাকা অবস্থায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লেকচার দিতেন। লন্ডনে শিক্ষা গ্রহণ শেষে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লামা ইকবাল

www.pathagar.com

ইউরোপ অবস্থানকালে তাদের চিন্তাধারা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দৈনন্দিন জীবনে উন্নতি এবং তাদের নিজ তাহযীব ও তামাদ্দুনের মূল্যায়নকে অতি নিকট থেকে দেখার সুযোগ লাভ করেন। তিনি ইউরোপবাসীর জ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞানে অগ্রগতি, স্বাধীনতার চেতনা, কর্মপদ্ধতি ও দেশপ্রেম দ্বারা খুব প্রভাবিত হন। অবশেষে তিনি তাঁর জন্মস্থানে ফিরে আসেন। ফিরে এসে মুসলমানদের মধ্যে অসলতা, কর্মোহীনতা, দাসত্ব মনোভাব, অর্থনৈতিক মন্দা, জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি অনীহা ইত্যাদি দেখে খুবই মর্মাহত হন। তিনি আরো দেখতে পান মুসলমানরা আমলীভাবে উদাসীন হওয়া সত্ত্বেও শুধু ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহর প্রিয় কওম ও মনোনীত জাতি হওয়ার ভুল ধারণার পড়ে আছে। মুসলমানরা একত্ববাদে বিশ্বসী হওয়ায় নিজেদেরকে তো নিজেরা ইসলামের প্রেমিক মনে করছে; কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা বিশ্বনবীর অনুপম আদর্শ, প্রেম, কুরআনী শিক্ষা, উসওয়ায়ে রাসুল এবং শাশ্বত শান্তির ইসলাম থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে। অধিকন্তু তারা আল্লাহর উপর দীন-দুনিয়ার সকল প্রকার নাজ ও নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করে। এ কথাই ইকবালের কবিতা শিকওয়ার মূল উৎস। শুধু ভারতবর্ষ নয় বরং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলমানরাও রাজনৈতিক পশ্চাদপদতা, অর্থনৈতিক দৈন্যতা এবং গোলামী মনোভাবের ছোবলে আটকে পড়েছিল। কেউ কেউ এর কবল থেকে বেরিয়ে এলেও বিশ্বনবীর অনুপম আদর্শ, প্রেম ও সার্বজনীন ও শান্তির ইসলাম থেকে দূরে থাকার দরুণ আজ মুসলিম জাতি নিম্নস্তরে নিমজ্জিত। ইরান, ইরাক, তুর্কী, মিশর এবং আফ্রিকাতেও তাদের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না।

এমনিভাবে তারাবলুস এবং বলকান এর যুদ্ধের বিপর্যয় ও মুসলমানদের অধঃপতনের অনুভূতিকে আরো বেশি কঠিন বানিয়েছিল। বিশ্বের মুসলমান বিশেষভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানের শোচনীয় অবস্থা এবং গোলামী ও পরাধীনতা আল্লামা ইকবালকে প্রসিদ্ধ কবিতা 'শিকওয়া ও জওয়াবে শিক্ওয়া' লেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। ড. আল্লামা ইকবাল (র.) মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে বর্তমানে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণসূহ এবং অতীতকে এই দুই কবিতায় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

'শিক্ওয়া ও জওয়াবে শিক্ওয়া' পড়ে একদিকে আমাদের অতীত উন্নতির ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অপর দিকে আমাদের বর্তমান অধঃপতনের কারণও সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

আল্লামা ইকবালের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমরা আমাদের আলোকিত অতীতকে স্মরণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সু-সজ্জিত করতে পারি। আল্লামা

www.pathagar.com

ইকবাল (র.) ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে ভারতবর্ষে এসে এক বছরে মুসলমানদের অবস্থা দেখে যে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন সে বিষয়ে এক বছর পর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্‌ওয়া লিখেন।

আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম লাহোর এর এক জলসায় (যা রেওয়াজের ইসলামি কলেজ হোস্টেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।) আল্লামা ইকবাল তাঁর শিক্‌ওয়া বিশেষ লাহানে পড়ে শুনান। এতে শ্রুতামন্ডলী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ইকবালের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন। তিনি যখন কবিতা আবৃত্তি করছিলেন তখন শ্রুতামন্ডলী তাকে ফুলের সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো এ সভায় তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব নূর মুহাম্মদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্রের অসাধারণ বাক্যপ্রতিভা দেখে একদিকে যেমন আবেগাপ্লুত হয়ে আনন্দাশ্রু ঝরান তেমনিভাবে তাঁর কবিতায় মুসলিম অধঃপতনের পঙ্ক্তি শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন।

শিকওয়া উর্দু সাহিত্যে অতি উঁচু স্থান দখল করে আছে। এরপূর্বে 'শিকওয়ায়ে হিন্দ' নামে 'সাদিয়ে হিন্দ' মাওলানা আলতাপ হোছাইন হালী (র.) তাঁর বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ 'মুসাদ্দেসে হালী' এর মধ্যে মুসলমানদের সোনালী যুগ ও তার অধঃপতনের আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতায় শুধুই নিরাশা ও অসহায়ত্বতা বিরাজমান ছিল। তিনি মুসলমানদের কোনো আশার বাণী শোনাতে পারেননি। কেননা মাওলানা হালী (র.) মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতন থেকে নিরাশ হয়ে পড়েন যে, মুসলমান বুঝি আর কখনো এই অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি তাঁর এক কবিতায় (যার শিরোনাম ছিল মুসলমানদের অধঃপতন) পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে, 'এখন আর মুসলমানদের উন্নতির আশা করা যায় না।'

এর বিপরীতে আল্লামা ইকবাল (র.) শিক্‌ওয়া লিখে মুসলমানদের আলোকিত অতীত, বর্তমান অধঃপতন ও তাঁর কারণ এবং বাস্তব উন্নতির পথ বাতলে দিয়েছেন। মুসলমানদের এই বলে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, তোমরা তো সেই জাতি যারা অতীতে কখনো ব্যর্থ হওনি। এখনও অলসতা ছেড়ে দিয়ে আমলী জীবন গঠন করলে, উন্নতি ও অগ্রগতির পথে চললে অবশ্যই আবার সেই সোনালী যুগ ও খোদার কৃপা ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম এর অনুষ্ঠানে 'শিক্‌ওয়া' পড়ার পর গোটা মুসলিম বিশ্বে এর চর্চা শুরু হয়। কিন্তু এর সাথে সাথে আকাবিরে ওলামায়ে উম্মতের কতেক আলেম আল্লামা ইকবালের সুফি মন ও মেজাজ বুঝতে না পেরে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আল্লমা ইকবালকে দোষারূপ করা শুরু করলেন। কেননা একজন মুসলমান ইসলামী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী আল্লাহর প্রতি এ ধরনের শিকায়েত ও অভিযোগ করতে পারে না।

www.pathagar.com

কিন্তু ইকবাল ছিলেন একজন সুফিকবি ও দার্শনিক। তাঁর সুফি মন ও মেজাজে আল্লাহর প্রতি অভিমান জেগে ওঠে। তাঁর প্রেমিক হৃদয় তাই প্রেমাস্পদকে অভিযোগের সুরে মনের সমস্ত খেদ প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু শরিয়তবাদী ওলামাদের একটি দল আল্লামা ইকবালের সেই সুফি মেজাজ উপলব্ধি ও বুঝতে না পেরে তাঁকে ফাসেক ও মুরতাদ এমনকি কাফের ফতোয়া আরোপ করে।

ইকবাল তা জানতে পেরে 'শিক্‌ওয়ার' মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার জন্য 'জওয়াবে শিক্‌ওয়া' কাব্যগ্রন্থটি লিখেন। তখন বিষয়টি উলামায়ে কেরামদের নিকট স্পষ্ট হলে তারা পূর্বের ফতোয়া তুলে নেন এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে ইকবালকে 'আল্লামা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই কবিতার মাধ্যমে আল্লামা ইকবাল মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেন যে, পিছুটান ছেড়ে দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হও এবং শির উন্নত করে দাঁড়াও। যা বাংলার মুসলিম জাগরণের আরেক অগ্রদূত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কবিতায়ও চিরভাস্বর। যেমন 'বল বীর, বল, চির উন্নত মম শির।' কাজী নজরুল ইসলামও মুসলমানদের অতীত ইতিহাসকে সামনে এনে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিগন্তের সূচনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। অপরদিকে আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের সমকালীন বিষয় সম্পর্কে সবসময় সজাগ করতে থাকেন। মুসলমানদেরকে তাদের অতীত সোনালী যুগ স্মরণ করিয়ে দেন।

মুসলমানদের উত্থান-পতন ও অপদস্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান জীবন গড়ার প্রতি জোর আহ্বান জানান। প্রত্যেকটি কবিতার ছন্দে ছন্দে তিনি পাঠক ও শ্রোতাকে নিয়ে গেছেন সুদূর অতীতে, সেখানে দাঁড়িয়ে পাঠক উপলব্ধি করতে পারবে তার সঠিক অবস্থান। ফিরে পাবে চেতনা। জেগে উঠবে স্বকীয়তাবোধ। নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি?

ইকবালের কবিতায় মুসলমানরা উপকৃত হতে পারেন, পেয়ে যেতে পারেন তার কাঙ্ক্ষিত পথ। কেননা তিনি তার কবিতায় কখনও নিয়ে এসেছেন ঘটনার প্রেক্ষাপট, কখনও বা ফলাফল। আবার কখনো পরাজয়ের কারণ। মুসলমানদের উত্তরণের জন্য ইকবাল (র.) আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি বিশ্ব মুসলিমকে এক জাতি হিসেবে গণ্য করেছেন। মুসলমানদের গোলামী জীবন, দৈন্যদশা এবং তাদের উপর বিভিন্ন নির্যাতন তিনি মেনে নিতে পারেননি। এ নিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করেন আর এই অভিযোগকেই 'শিক্‌ওয়া' নামে

www.pathagar.com

নামকরণ করা হয়। 'শিকওয়া'র সমাধানের জন্য তিনি 'জওয়াবে শিকওয়া' নামেও একটি কবিতার বই রচনা করেন। 'জওয়াবে শিক্‌ওয়া' লিখেন ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। যা বলকান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লাহোরের মুচিদরওয়াজায় বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত কবিতা পাঠের আসরে পড়ে শুনিয়েছেন, যে কবিতা পাঠের আসরের আয়োজন করেন মাওলানা কবি জাফর আলী খান। উক্ত অনুষ্ঠানে 'জওয়াবে শিক্‌ওয়া' আবৃত্তির পর মুহূর্তের মধ্যেই এক লক্ষ কপি বিক্রয় হয়ে যায়। যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি বলকান যুদ্ধের মুজাহিদদের জন্য দান করে দেন।

তাঁর উভয় রচনা 'শিকওয়া' ৩১টি পঙ্‌ক্তি সম্বলিত এবং 'জাওয়াবে শিকওয়া' ৩৬ পঙ্‌ক্তির কাব্য। এছাড়াও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আল্লামা ইকবালের খুদিতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞান রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অনেক ভাবনা-চিন্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এ গ্রন্থটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি প্রথমেই মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবং বিশ্বনবী আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দরবারে আদব ও তাযিমের সাথে 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ (সা.)'-এর প্রতি অসংখ্য-অগণিত হারে দরূদ ও সালাম পেশ করছি। 'আলহামদুলিল্লাহ' সেই মহান রাব্বুল আলামীন, যার অনুগ্রহ ও কৃপায় এ কাজ সম্ভবপর হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে যিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন সারাটি জীবন। যার খেদমতে উপমহাদেশের মুসলিম মনন ও চিন্তাজগতে খুদিতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞানের অমীয় ফল্গুধারা নবচেতনার সূচনা করেছে। প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ধারায় যিনি মুসলিম জাতিকে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সিক্ত হয়েছিলেন। তিনি আর কেউ নন উর্দু সাহিত্যের চিরভাস্বর কবি ড. আল্লামা ইকবাল (র.)। তাঁর অসংখ্য লেখায় তিনি মুসলিম জাতিকে অলসতা ঝেড়ে কর্মমুখি হতে যেমন আহ্বান করেছেন তেমনি খুদিতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে ব্যাপক তত্ত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বিশ্বনবীর আদর্শ, প্রেম ও সুফিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত জীবন গড়তে মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহ্বান করেছেন। মুসলমান জাতিকে অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যত পানে অগ্রসর হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, দীনমুখি হতে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর খুদিতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞানের রহস্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও জ্ঞান না থাকায় বা সুফি মন ও মেজাজ বুঝতে না পারায় তথাকথিত আলেম সমাজের একটি অংশ ড. আল্লামা ইকবালকে কাফের উপাধীতে ভূষিত করে। কিন্তু এতে আল্লামা ইকবাল দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শিক্‌ওয়া ও জওয়াবে শিক্‌ওয়া নামক কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তার

www.pathagar.com

কঠোর জবাব প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে তা আল্লামা ইকবালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মে স্থান পায়। এ গ্রন্থে সুফিকবি ও দার্শনিক ইকবালের শ্রেষ্ঠ রচনা শিক্‌ওয়া ও জওয়াবে শিক্‌ওয়া এবং খুদিতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে ভক্ত-পাঠকগণ আল্লামা ইকবালের দর্শনতত্ত্ব ও স্রষ্টাজ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে জানতে সক্ষম হব বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

লেখক

www.pathagar.com

মুসলিম চিন্তা ও জাগরণের মহাকবি আল্লামা ইকবাল (র.)

ঘুমন্ত ও দিকভ্রান্ত মুসলিম জাতিকে এগিয়ে চলার প্রেরণাদায়ী ও ঈমানী চেতনায় শাণিত করার মহাসৈনিক ড. আল্লামা ইকবাল (র.)। উপমহাদেশ তথা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর রেনেসাঁর দিকপাল হিসেবে খ্যাত শতাব্দীর চিন্তাজগতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা ইকবালের অবদান মুসলিম জাতিকে আজীবন ঋণী করে রাখবে। এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও সুফিতত্ত্বের মহান সাধক পুরুষ হিসেবে সমাদৃত। উম্মতে মুহাম্মদীর একনিষ্ঠ সেবক ও আশেকে রাসুল মাশুকে এলাহীর অনুগ্রহধন্য এই মহান কবি ও সংস্কারকের জীবন ও বাণী থেকে শক্তি সঞ্চয় করে মুসলিম জাতি অতীত ঐতিহ্য, বর্তমান করণীয় ও ভবিষ্যতের আলোকিত জীবন গড়তে অনুপ্রাণিত হতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। সেই মহান প্রত্যাশা নিয়েই আমরা আল্লামা ইকবালের জীবন, দর্শন ও ঐশীজ্ঞানের সংকলনধর্মী আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থের অবতারণা করেছি।

মুসলিম জাতি তাদের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্কটময় অবস্থার মোকাবেলা করে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা সকলের। মুসলিম জাগরণের মহাকবি ড. আল্লামা ইকবাল জীবন, দর্শন ও ঐশীজ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে বেশ কয়েকটি পুস্তকে খন্ড খন্ড আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি মূলত সেসব রচনার সংকলন ও ব্যাখ্যার আলোকে রচিত। উৎসাহী ও আগ্রহী পাঠকগণ এ গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লামা ইকবাল ও তাঁর দর্শনতত্ত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে বলে আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

মহাকবি আল্লামা ইকবাল (র.) এ উপমহাদেশে এক অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কবি, দার্শনিক, সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁর অবদান চিরকালই অবিস্মরণীয়। এ অঞ্চলে তিনি প্রধানত পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে পরিচিত হলেও আজ বিশ্বের সর্বত্র তাঁর প্রতিভার ও অবদানের স্বীকৃতি মুখরিত হচ্ছে। ইসলামী জীবন দর্শন, বিশ্বনবীর আদর্শ ও প্রত্যয়ের মধ্যে বিভিন্নকালে বিভিন্নভাবে নানা মতবাদ প্রবেশ করে প্রকৃত ইসলাম থেকে মুসলমান জাতিকে

www.pathagar.com

দূরে সরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিস্পেষিত করেছিল স্বার্থান্বেষী চক্র। আল্লামা ইকবাল যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক মুসলমান জাতিকে প্রকৃত ইসলামের সেবক হয়ে বিশ্বনবীর অনুসরণীয় পথে চলার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ইমাম গাজ্জালীর অনুরূপ। তবে ইসলামের ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন–তাও অভিনব দার্শনিক মতবাদে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশ্ব জগতে তাঁকে একটি শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছে। এ বিশ্বচরাচরের সর্বত্র তিনি গতিশীল জীবনের সন্ধান পেয়েছেন এবং আল্লাহ্‌কেও তিনি চরম এক সৃষ্টিশীল সত্তা বলে লাভ করেছেন। তাঁর অবদানের অপর শ্রেষ্ঠতম বিষয় হচ্ছে 'খুদীতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞান রহস্য' যা তাঁকে মুসলিম চিন্তাজগতে উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। মানব সাধারণকে তিনি আল্লাহর চরম ও পরমতত্ত্বের সন্ধান দিয়ে বিশ্বনবীর আদর্শ ও মহব্বতকে বিকাশের ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ্ব মুসলিম জাতির পশ্চাৎপদ মানসিকতা, অধঃপতনের বিষয় এবং নানা দলমতের কারণে নিজেদের ক্ষতিকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আল্লামা ইকবাল কুরআন ও বিশ্বনবীর আদর্শকে সঠিকভাবে গ্রহণ করার জন্য এ জাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান করেছেন।

মুসলিম জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নবজাগরণের লক্ষ্যে আল্লামা ইকবাল নানা পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর সকল মতবাদই কাব্য ও দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি সুফিতত্ত্বের মাধ্যমে ইসলামের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ও পরমজ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেছেন। তাঁর এসব ধারণা মুসলিম জাতিকে জাগতিক, আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হওয়ার প্রেরণা দান করতে সক্ষম হয়েছে। কর্মবাদ ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণাদানে আল্লামা ইকবাল সম্পূর্ণ অভিনব ও যুগোপযোগী ধারণার অবতারণা করেছেন। মুসলিম দুনিয়া এ সকল অবদানের জন্য তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী হয়ে রইল।

এ কথা সত্য যে, দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোতে কিংবা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশনা বিভাগে আল্লামা ইকবালের রচনাবলি ও তাঁর উপর রচিত সহায়ক গ্রন্থ এখন দুস্প্রাপ্য। পূর্বে যা ছাপা হয়েছিল এখন সে গ্রন্থের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই ইকবাল চর্চা ও গবেষণা কষ্টসাধ্য হলেও আমি বহু কষ্টে তাঁর সকল গ্রন্থের মূল কপি সংগ্রহ করতে পেরেছি। যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে ইকবাল চর্চা ও গবেষণার পথ সুপ্রশস্ত হবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। আমি ইকবালকে সঠিকভাবে ও পরিপূর্ণতার সাথে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। সুধী ভক্ত পাঠকগণ এ গ্রন্থ পাঠের দ্বারা

www.pathagar.com

সকলেই আত্মিক নৈতিক আধ্যাত্মিক ও ঈমানী চেতনায় শাণিত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভে অনুপ্রাণিত হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বনবীর আদর্শে অনুসরণীয় জীবন গড়তে উদ্বুদ্ধ হবে বলে আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব প্রজ্ঞাতত্ত্ব খুদীতত্ত্ব ও ঐশী রহস্য সম্বন্ধে জানতে বুঝতে উপলব্ধি করতে বাংলাদেশের পাঠকের আগ্রহ সীমাহীন। এ গ্রন্থখানি তাদের সে চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর মুসলিম জাগরণে আল্লামা ইকবালের অবদান

বিংশ শতাব্দীর ইসলামী রেনেসাঁর মহান দিকপাল ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (র.)। বিশ্ব ইতিহাসের এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বিশ্বনবীর আদর্শ, কুরআনের শিক্ষা, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, ঈমানী দৃঢ়তা, মুসলিম মনন ও চেতনার জাগরণে আল্লামা ইকবালের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তিনি একাধারে যুগশ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক ও সুফিতত্ত্বের মহান প্রেমিকপুরুষ হিসেবে সমাদৃত।

মুসলিম মিল্লাতের পরাধীনতার এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে এই মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাতে তখন মহাসঙ্কটকাল চলছিল। উপমহাদেশ তথা এশিয়া-আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই ছিলো পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নিজেদের মতভেদ ও অনৈক্যের ফলে তাগূতী শক্তির ষড়যন্ত্রে স্বাধীনচেতা এই জাতির ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে। ভোগ-বিলাসিতা ও দায়িত্বহীনতার দরুণ নেতৃত্বের আসন থেকে তারা দূরে ছিটকে পড়ে, শুরু হয় দুর্বিষহ গ্লানিময় জীবন।

আল্লামা ইকবাল প্রেরণার দ্যুতি ছড়িয়ে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে রেনেসাঁর প্রতি গভীরভাবে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছেন। উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি বিশ্ব মুসলিম জাতির চিন্তা ও কর্মের মহান নির্দেশক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর মহান কাব্য সাধনা ও ক্ষুরধার জ্বালাময়ী রচনা তাঁকে বিশ্ববিশ্রুত কালজয়ী মুসলিম দার্শনিক, মহাকবি ও বিশ্বনবীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ মহান ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। তাঁর অমর কাব্য সম্ভার, খুদীতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞানের রহস্য তাঁকে বিশ্বজনীন স্বীকৃত ও দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছে। জ্ঞানী-গুণী ও সুধীমহলে তিনি সার্বজনীনভাবে সমাদৃত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। জ্ঞান সাধনায় তিনি যেমন ছিলেন অতল ডুবুরী, তাঁর কলমও ছিল তেমনি ক্ষুরধার। পাণ্ডিত্য যেমন তাঁর শীর্ষস্থানীয়, বাণীও তেমনি মহামূল্যবান–সার্বজনীন মূল্যবোধের নীতি নির্ধারক।

তিনি নিছক একজন মহৎ কবি নন, বরং একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, প্রতিথযশা চিন্তানায়ক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর বহুমুখি প্রতিভা স্বদেশ ও

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদানের দ্বারা তাঁকে চির শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের মুকুট পড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে তাঁরা বাণী ও কাব্য চিরদিন আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

ছাত্র জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে কবির 'তারানা-ই মিল্লী' আবৃত্তি শুনে তাঁর প্রতি মুসলিম জাতির গভীর অনুরাগ জাগে। অনেকেই তাঁর সঙ্গীতের মর্মার্থ না বুঝলেও সুরের মূর্চ্ছনায় বিমোহিত হয়ে আত্মবিভোল হতেন। তাঁর অবিস্মরণীয় কাব্য-শক্তি ও যোগ্যতা আমাদেরকে নতুন চেতনাবোধে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁর রচনাবলি সাধারণ জনসমাজের সামনে সঠিকভাবে ও ব্যাপক পরিসরে উপস্থাপিত হয়নি কারণ এখনো আল্লামা ইকবালকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও প্রচার প্রসারের সুযোগ তৈরি হয়নি। তিনি এখনো শিক্ষিত মুসলিম সমাজেরই নিকট সুপরিচিত অর্থাৎ যারা মাদরাসার উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত তারাই আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে জানেন। তবে তাদের ভেতরও সবাই সঠিকভাবে ইকবালকে জানেন না। আশা করি আমার লেখনি ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লামা ইকবাল ও তাঁর কাব্যসম্ভারের দ্যুতি উচ্চতর পরিসর অতিক্রম করে সাধারণ জনসমাজের নিকট পৌঁছে যাবে। এ গ্রন্থ প্রকাশের পর আমরা 'আল্লামা ইকবালের রচনাসমগ্র' বিশেষ করে কাব্যসম্ভার ও মুসলিম চিন্তার উত্তরণে 'ইকবালের আধ্যাত্মিক সুফিতাত্ত্বিক ও দার্শনিক চেতনার রহস্য অন্বেষণ' নামে এক মহামূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। যা 'সালমা বুক ডিপো' থেকে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ গ্রন্থটি বিশাল পরিসরে সাজানো হয়েছে কারণ এতে আল্লামা ইকবালের সমস্ত রচনার ব্যাখ্যা, তত্ত্বালোচনা, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চেতনার উন্মেষ, আল্লাহতত্ত্ব, প্রেমবাদ, ভক্তিবাদ, মরমীতত্ত্ব ও বিশ্বনবীর আদর্শের অনুসরণীয় দিক-নির্দেশনা, অনুগত প্রেমিকের আত্মসমর্পনের রহস্য ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আমার মাদরাসার ছাত্র জীবনে শিক্ষকের নিকট সর্বপ্রথম আল্লামা ইকবালের সুফি কাব্যের মূর্চ্ছনায় আকৃষ্ট হই। তারপর থেকে ইকবাল (র.) সম্পর্কে আমার ব্যাপক আগ্রহ জন্মে এবং দীর্ঘ ১৫ বৎসর যাবৎ আল্লামা ইকবালের সমস্ত গ্রন্থসমূহ সংগ্রহের উদ্যোগ হাতে নিই। ইকবাল দর্শন, কাব্যসম্ভার ও নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত এই মহান কবির লেখনিগুলো একে একে অধ্যয়ন শুরু করি। তারপর সেগুলোর আলোকে অত্যন্ত সহজ সরল ব্যাখ্যা, প্রাণবন্ত চেতনাসমৃদ্ধ রচনার সাহায্যে মুসলিম জাতিকে তাঁর দিক-নির্দেশনা, ঈমানী দৃঢ়তা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জাগরণ, আত্মসমৃদ্ধি, দার্শনিক ও তাত্ত্বিক বোধশক্তির দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য ও মহানবীর আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির সন্ধান বিষয়ে আত্মনিয়োগ করি। তার ফলশ্রুতিতে আজকের এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ।

www.pathagar.com

আল্লমা ইকবালের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ ও তত্ত্বমূলক রচনা ইংরেজিসহ নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপসহ মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় আমাদের দেশে ইকবাল চর্চার দৈন্যের জন্য মর্মাহত হই। বিশেষ করে আরবী শিক্ষিত মহল ছাড়া অন্যান্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের ইকবাল প্রতিভা সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই। আর থাকলেও সঠিক ধারণার অভাব। হতে পারে উর্দু ভাষা ও পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে বাঙ্গালী জাতি তাঁর প্রতি আগ্রহহীন। কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই বাঙ্গালী জাতির প্রতি পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর শাসন, শোষণ, নিপীড়ন-নির্যাতন, বৈষম্য ও একাত্তরের বর্বর হত্যাযজ্ঞ যেন মন থেকে মুছে যেতে চায়না। আর তাই বলেই তো আমরা আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করতে পেরেছি। বলা বাহুল্য পাকিস্তান কায়েম না হলে আজ বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হতো না। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবাল যে পাকিস্তান কায়েম করতে চেয়েছিলেন মুহাম্মদ আলী জিন্না ইকবালের সেই আদর্শিক পাকিস্তান কায়েম করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি ইকবালের আদর্শ থেকে সরে গিয়ে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন তার সেই অনেকটা ভুল ভ্রান্তিমূলক পাকিস্তান আজ খন্ড হয়ে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যর্থতায়, শাসন, শোষণ নির্যাতন-নিপীড়ন ও বৈষম্যের কারণে যে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে তাতে আমরা গর্বিত স্বাধীন জাতি। কিন্তু তাই বলে মুসলিম জীবন বিধান আল-কুরআন ও নবীর আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত হইনি। অথচ যারা পকিস্তান ছিল বলে ইসলাম ছিল এই শ্লোগানে অখন্ড পাকিস্তান রক্ষায় বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিল কিংবা বাংলাদেশ হলে ইসলাম থাকবে না বলে ভ্রান্ত ধারণায় নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধীতা করেছিল তারা আজকের পাকিস্তানের দিকে তাকালেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আজকের বাংলাদেশ কোথায় আর তথাকথিত মুসলিম রক্ষক পাকিস্তান কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বাংলাদেশে কী ইসলাম নেই? এখনো এদেশের মতো ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের কোথাও নেই। এটা যাচাই করার জন্য তারাই যথেষ্ট যারা সৌদি কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোয় গিয়েছেন। আর যদি জেনে-শুনে অস্বীকার করেন তাহলে বলার কিছু নেই। হোক না উর্দু ভাষার কবি, একজন বিশ্বপ্রসিদ্ধ মুসলিম জাগরণের মহাকবি হিসেবে আল্লামা ইকবাল পুরো মুসলিম জাতির কবি। জ্ঞান ও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এটাই হওয়া স্বাভাবিক। কোনো কালোত্তীর্ণ ও কালজয়ী কবি নির্দিষ্ট জাতির ও রাষ্ট্রের কবি নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের কবি। তাই আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাতির চিন্তানায়ক হিসেবে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের কবি। যেমন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম পুরো মুসলিম জাহানের

www.pathagar.com

ইসলামী চেতনা ও বিশ্বনবীর আদর্শ ও প্রেমের জাগরণের কবি। এটাই মুসলমানের নীতি ও আদর্শ হওয়া উচিত। যা বিশ্বনবী (সা.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা সে নীতি ও আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছি। আল্লামা ইকবাল তাঁর কাব্য ও রচনার মাঝে সে শিক্ষাই দিতে চেষ্টা করেছেন।

অপর দিকে আল্লাহর প্রশংসা ও বিশ্বনবীর প্রশংসায় রচিত কাজী নজরুল ইসলামের অসংখ্য কবিতা, ইসলামী গজল ও মুসলিম জাগরণে উদ্বুদ্ধ গদ্য সাহিত্য বিশ্ব মুসলিম জাতির অমূল্য সম্পদ রূপে গণ্য। কিন্তু আমরা নানা দল মতে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন আক্বিদার ফাঁদে পড়ে আজ দিকভ্রান্ত। তাই বিশ্বনবীর সঠিক আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার দরুণ বিশ্ব মুসলিম জাতি এক হতে ব্যর্থ হয়েছে বার বার। এখন ভাবার সময় হয়েছে আমরা কিভাবে এক মন এক প্রাণ হতে পারি। হোক না ভিন্ন আক্বিদা কিন্তু কুরআন ও এক নবীর উম্মত হিসেবে বিশ্বের বৃহত্তর মুসলিম রক্ষার স্বার্থে আমরা একজোট হয়ে মিলে-মিশে না থাকলে কোনো দিন মুসলিম জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু প্রত্যেক আক্বিদায় বিশ্বাসী সম্প্রদায় বৃহত্তর মুসলিম জাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে যদি এভাবে স্বার্থান্বেষীর মতো নিজ নিজ স্বার্থকেই বড় মনে করে তবে এ জাতি আজীবন মাথা নত করে থাকবে। এবং ইহুদি-নাসারা-খৃস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের পদতলে মুসলিম জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার ও সমৃদ্ধিকে সমর্পণ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। মুসলিম জাতিকে আজীবন তাদের কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হবে। অতীব দুঃখের বিষয় আজ মুসলিম জাতি তাই করছে। আল্লামা ইকবাল তাঁর নানা কাব্যে অতীব দুঃখের সাথে সে কথাই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ 'শিক্ওয়া ও জবাবে শিক্ওয়া' মুসলিম জাতিকে মুক্তির চেতনায় শাণিত করার হাতিয়ার রূপে রচিত হয়েছে।

আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যাদের অনুবাদের সাথে মূল উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজি গ্রন্থের সমন্বয় সাধন করেছি আমি তাঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁরা হলেন সৈয়দ আব্দুল মান্নান অনূদিত আসরারে খুদী, আবুল ফরাহ্, মুহাম্মদ আব্দুল হক ফরীদি অনূদিত রুমুযে বেখুদী, মাওলানা তমীযুর রহমান অনূদিত শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া, মনীর উদ্দীন ইউসুফ অনূদিত বাঙ্গে দরার কাব্যানুবাদের সহায়তা গ্রহণ করেছি। তাঁদের কাছে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

মুসলিম জাতির উত্থান-পতনের যুগসন্ধিক্ষণে কুরআনের শিক্ষা ও বিশ্বনবীর আদর্শের ভূমিকা ছিল অনন্য। সাহাবা আজমাঈন, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুস্তাহেদীন ও বুজুর্গানে দীনের সঠিক শিক্ষা, আদর্শ, নৈতিক চেতনা, ঈমানী দৃঢ়তা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও আত্মিক সমৃদ্ধিতে মুসলিম জাতি অনন্য

www.pathagar.com

উচ্চতায় আসীন ছিলেন। মুসলমানদের সেই অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের আলোকে আল্লামা ইকবাল বর্তমান সঙ্কট কাটিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আহ্বান করেছেন। ড. আল্লামা ইকবাল খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ, নবীপ্রেম, শিক্ষা ও তাঁদের স্বর্ণযুগের অবসান থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের চরম অধঃপতন ও ন্যক্কারজনক গোলামীর পেছনের মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে এ সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি সেকাল আর একালের মধ্যে বিশ্বনবীর আদর্শ, প্রেম ও কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে মুসলিম জাতির দূরে সরিয়ে যাওয়ার দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উল্লেখ করে তা থেকে মুক্তিলাভের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি ঘোষণা করেন,

মগজে কুরআন, রূহে ঈমান, জানে দ্বীন
হাসতে হুব্বে রহমাতুল্লিল আলামীন ॥

অর্থ : কোরআনের সার, ঈমানের রূহ, দ্বীনের জান হয় প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়বস্তু তথা স্বীয় জানের চাইতেও যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.)-কে অধিক ভালবাসা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন, ঈমানদার বা মুসলমান হতে পারবে না।

১. হাদিসের ভাষায় হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) এরশাদ করেন,
'লা ইউ'মিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিঁও অলিদীহি ওয়া ওয়াদিহী ওয়ান্নাসি আজমাঈন।'
অর্থাৎ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ-ই পূর্ণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট স্বীয় সন্তান-সন্ততি, মাতাপিতা এবং সকল লোক হতে নিকট অধিক প্রিয় না হই।'

—১. বুখারি শরিফ, ১ম খণ্ড, হাদিস নং-১৪, 'ঈমান' অধ্যায়ের 'রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা ঈমানের অংশ' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ২. সুনানে নাসাঈ (নাসাঈ শরিফ), ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং-৫০১২, 'ঈমান ও এর বিধানাবলি' অধ্যায়ের 'আলামাতুল ঈমানি বা ঈমানের আলামত' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। উক্ত হাদিস গ্রন্থগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত।

২. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউই পূর্ণ মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত না আমি

www.pathagar.com

তার নিকট তার পরিবার-পরিজন এবং ধনসম্পদ এবং সকল লোক হতে অধিক প্রিয় হই।'

—সুনানে নাসাঈ (নাসাঈ শরিফ), ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং-৫০১৩, 'ঈমান ও এর বিধানাবলি' অধ্যায়ের 'আলামাতুল ঈমানি বা ঈমানের আলামত' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত।

পবিত্র কুরআনপাকে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায় যেন এ কথারই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, যাতে সুস্পষ্টভাবে ঈমানের সংজ্ঞা দেওয়া আছে, যেমন এরশাদ হচ্ছে—

আন্নাবিয়্যু আওলা বিলমু'মিনিনা মিন আনফুসিহিম ওয়া আযওয়া-জুহু উম্মাহা-তুহুম।

—সূরা আহযাব :আয়াত : ৬

অর্থাৎ 'নবী করিম (সা.) মুমিনদের নিকট তাঁদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় এবং তাঁর পত্নিগণ তাদের মাতা স্বরূপ।'

সুতরাং ঈমান হচ্ছে রাসুল মকবুল (সা.)। আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর উপর ঈমান আনাকে ঈমানের এবং তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-কে প্রাণাধিক ভালাবাসাকে আল্লাহর ভালবাসার প্রধান শর্ত করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনপাকে এরশাদ হচ্ছে,

মাঁই ইউত্বি'য়ির রাসুলা ফাক্বাদ আত্বা আল্লাহ

—সূরা: নিসা : ৮০

অর্থাৎ 'যে রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল।'

ঈমানের প্রথম স্তর হচ্ছেন রাসুলুল্লাহ (সা.) শেষ স্তর হচ্ছেন আল্লাহ। কারণ, 'আল্লাহ' সম্পর্কে কোনো মানুষের সম্যক কোনো জ্ঞান বা ধারণা নেই। প্রিয়নবী (সা.) সাক্ষ্য দিয়েছেন বলেই আমরা আল্লাহর সম্পর্কে জানতে বুঝতে এবং ধারণা করতে সক্ষম হচ্ছি। তিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর তৌহিদ বা একত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞাত আর আমরা তাঁর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জ্ঞাত হয়েছি।

অন্যত্র আল্লামা ইকবাল কুরআনের শিক্ষা থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে থাকার পরিণতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন:

মুসলমানী নিয়ে তারা মুখ্য ছিল ধরাতলে
আর তোমরা কুরআন ছেড়ে যাচ্ছ আজ রসাতলে।

www.pathagar.com

এখানে আমাদের পূর্ববর্তীদের কথা বলা হয়েছে। তারা কুরআনের শিক্ষা, বিশ্বনবীর আদর্শ ও মুসলমানী গুণাবলি নিয়ে দুনিয়ার বুকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল কিন্তু আজ আমরা সে শিক্ষা, আদর্শ ও গুণাবলি হারিয়ে একেবারে ব্যর্থতার রসাতলে নিমজ্জিত হয়েছি। তাই মুসলমানদের এই অধঃপতনের কথা ভেবে প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'শিকওয়া ও জবাবে শিকওয়ায়' আল্লামা ইকবাল এইসব নামধারী মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

শোর হে হো গেয়ি দুনিয়া মে মুসলিম নাবুদ।
হাম ইয়ে কেহ থে. হে কে. থা ভি কাহি মুসলিম মওযুদ?
ইয়ে উ মুসলিম হে, জিসে দেখকার শারমায়ে ইয়াহুদ।
ইউ তো সৈয়দ ভি হো, মির্জা ভি হো, আফগান ভি হো,
তুম সবি কুচ হো, বাঁতাও তো মুসলমান ভি হো?

ভাবার্থ : 'প্রচার হচ্ছে যে, সারা দুনিয়া মুসলমান ছেয়ে গেছে। কিন্তু আমি বলি, সত্যিকারার্থে এখানে মুসলমান বলে কেউ নেই। যারা নামধারী মুসলমান আছে তাদের (কাজ কারবার) দেখলে ইহুদীরাও লজ্জা পায়। সবাই তো (তোমরা) নিজেদেরকে সৈয়দ, মির্জা এবং আফগান বলে গর্ববোধ কর; কিন্তু আমাকে বলবে কি সত্যিকারার্থে তোমরা কতটুকু মুসলমান?'

আজকে মুসলমানের মনে হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, গর্ব ও দাম্ভিকতা যেন বাসা বেধে আছে। যে ইবাদত করে তার ইবাদতের গর্ব, যার সম্পদ আছে তার সম্পদের গর্ব, যার ক্ষমতা আছে তার ক্ষমতার গর্ব, যার প্রতিপত্তি আছে তার প্রতিপত্তির গর্ব ও অহঙ্কার যেন নিত্যদিনের ঘটনা। তাই গর্ব ও হিংসা সম্পর্কে মহানবী (সা.) সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মীতা ও মানব প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই তাঁর প্রচারিত ধর্মে হিংসার কোন স্থান নেই। হজরত আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে এক সরিষার দানার পরিমাণ অহংকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার বীজ পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও জান্নাহামে দাখিল হবে না।

—ইবনে মাজাহ, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং-৪১৭৩। এই হাদিস গ্রন্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত।

হাদিসে পাকে আরও ইরশাদ হচ্ছে– 'যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ গর্ব (অহংকার, বড়াই) আছে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না।'

—মুসলিম শরিফ

www.pathagar.com

মানুষের মৌলিক অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এবং তাদের জান-মাল-সম্পদের ওপর জোর-জবর দখল করে মানুষ হত্যা, হিংসা, বড়াই করে মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা বিশ্বনবী (সা.) ও কোরআনের শিক্ষার বিপরীত। যাদের অন্তরে এই মনোভাব আছে তারা কখনো জান্নাত পাবে না। ইসলাম যেখানে আমিত্ব বিনাসের শিক্ষা দিচ্ছে সেখানে সেই আমিত্ব বিনাশের চেষ্টা না করে আরো বেশি বেশি আমরা আমিত্বের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছি।

যেখানে আমিত্ব নেই সেখানে অংশীবাদীতাও নেই। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে আল্লাহ/মহাগুরু ব্যতীত অন্য কিছুর আলাদা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করে, প্রকৃত পক্ষে সেই আসল মুশরিক। যে তার নিজের ওজুদে আল্লাহ ব্যতীত কিছুই দেখে না তিনিই প্রকৃত তৌহিদধারী আত্মজ্ঞানী। আত্মজ্ঞানে জ্ঞানলব্ধ ব্যক্তি ছাড়া এ কথার রহস্য কেউ বুঝবে না। আর এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে আহলে বাইত অথবা আহলে বাইতের মনোনীত প্রতিনিধি অলীদের কাছে যেতে হবে। আমাদের অন্তরে রাসুল (সা.)-এর মহব্বত এবং আহলে বাইতের মহব্বত জারি না থাকলে আমরা সঠিক জ্ঞানের কাছে যেতে পারব না। তাই আহলে বাইতের প্রথম ইমাম হযরত আলী (রা.)-এর মহব্বত ও সন্তুষ্টিও আমাদের জন্য জরুরি।

আমাদের আত্মদর্শনের পথে 'হাক্কুল ইয়াক্বিন' একবার অন্তরে উদয় হলে আল্লাহকে কপালের চক্ষু দিয়েও সর্বত্র দেখা যায়। তখন আল—কোরআনের এই বাণীর সত্যতা উপলব্ধি হয়—

'ওয়া লিল্লাহিল (আল্লাহরই) মাশরিকূ (পূর্ব) ওয়াল মাগরিবু (পশ্চিম); ফাআইনামা (সুতরাং যেদিকেই) তুওয়াললূ (মুখ ফেরাও) ফাসামমা (সুতরাং সেখানেই) ওয়াজহু (চেহারা/মুখমন্ডল)-ল্লাহ (আল্লাহর); ইন্না-ল্লাহা ওয়াসিউন (সকলদিকেই অবস্থিত, সর্বব্যাপী, সকল দিকে বিস্তৃত, পরিব্যাপ্ত) আলীম (জ্ঞানী, সব কিছু জানেন)।'

অর্থ: 'এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং যেদিকেই মুখ ফেরাও সেখানেই আল্লাহর চেহারা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল দিকেই অবস্থিত, সবকিছু জানেন ।

—সুরা: বাকারা: আয়াত: ১১৫

খাঁটি বিশ্বাসী লোক তথা হাক্কুল ইয়াকিন যার হয়ে গেছে সে সর্বত্রই আল্লাহকে দেখতে পায়। এজন্য সৃষ্টির সকল কিছুকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সুতরাং সর্বজীবে প্রেমের বিস্তারই পূর্ণ তৌহিদ এবং আমানুদের ঈমান । অন্তরে প্রকৃত প্রেমের উদয় হলে জাতি-বর্ণ-ধর্ম সকলের প্রতি তথা বিশ্বপ্রেমের উদয় হবেই। একমাত্র তখনই মনে হবে ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। আল্লাহর নবীগণ এবং খাঁটি কামেলে ইনসান বা আউলিয়া-কেরামগণ বা খাঁটি মানুষ অন্যায়-

www.pathagar.com

অত্যাচার-অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কথা বললেও পাপীকে ঘৃণা করেন না। ভালবাসা ও অন্তরের আন্তরিক প্রেম দিয়ে তারা পাপীকে আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করেন এবং পথভ্রষ্টদের পথের দিশা প্রদান করেন। এভাবে তাদের হেদায়াত কর্মের মাধ্যমে যুগে যুগে কালে কালে আল্লাহর দ্বীন জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। আল্লাহর হেদায়াত কর্ম চিরবর্তমান অর্থাৎ তিনি এক নবীর শূন্যস্থান অন্য এক নবীর মাধ্যমে পূরণ করেন। তেমনি নবুয়ত পদ্ধতি খতম হয়ে যাবার পরও তাঁর হেদায়াতের পথ বন্ধ হয়নি। তিনি অলীদের মাধ্যমে হেদায়াতের কার্যক্রমকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রেখেছেন। এবং প্রতি একশত বৎসরান্তে একজন মুজাদ্দেদের আগমনে অলীদের আধ্যাত্মিক পরিষদের মাঝে সমন্বয় সাধন করে উত্তরোত্তর হেদায়াতের ঝান্ডাকে সমুন্নত রেখে চলেছেন। তাই নবীগণ যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের সন্তুষ্টি অপরদিকে অলীগণেরও তাই। তারা উভয়েই আমিত্বকে বর্জন করে আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত।

আল কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে—'হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখেরু ওয়াজ জাহিরু ওয়াল বাতিনু ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইয়িন আলিম।' অর্থ: 'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত (প্রকাশ্য), তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।' (সুরা হাদিদ, আয়াত-৩) অতএব আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া আর কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি ছাড়া আসলে আর কিছু নেই। তিনিই একমাত্র মহাসত্য। তিনি ওয়াহেদ (এক)। তিনিই আহাদ (একক) রূপে সমগ্র সৃষ্টিতে বিরাজিত এবং সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তিনি ছাড়া কোনো কিছুর আলাদা অস্তিত্ব কল্পনা করাই শিরক। অতএব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ তিনি ছাড়া কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি সর্বময় ও সর্বত্র বিরাজিত এটাই আসল তাওহিদ তত্ত্ব। অতএব তিনিই একমাত্র চিরসত্য। অতএব সহজ কথা যায় না সহজে বলা।

দূরের মানুষকে কাছে আনার জন্য ডাকাডাকি করতে হয়। কিন্তু কাছের মানুষকে শোরগোল করে ডাকলে লোকটি উল্টা বুঝবে। সুতরাং আল্লাহকে জেনে-চিনে তার নৈকট্য লাভ হলে, ডাকাডাকির কোনো প্রয়োজন থাকে না। তাসবিহ, উপাসনা, জপতপ, প্রশংসা ততক্ষণই প্রয়োজন যতক্ষণ তার পরিচয় ও নৈকট্য বোধ না জন্মায়। সুতরাং যার স্রষ্টার নৈকট্য লাভ হয়ে যায়, সে সব সময় অতি নিকটে স্রষ্টার প্রেম-রহস্য রাজ্যে বিরাজমান এবং মহাপ্রভু তার থেকে দূরে নয়। সুতরাং যে আল্লাহকে জেনেছে এবং চিনেছে সেই আল্লাহ প্রেমিক আল্লাহকে লাভ করার পর বোবা হতে বাধ্য। সত্যিকারের আরেফ বোবায় পরিণত হয়। কারণ সাধারণ মানুষ আল্লাহ প্রেমিকের গোপন রহস্য বুঝতে অক্ষম তাই তিনি সহজে প্রেমের রহস্য প্রকাশ করেন না।

আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (সা.) আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ এবং পরকালে মুক্তি লাভের জন্য যে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন তার নাম ইসলাম। কিন্তু আমরা

www.pathagar.com

শুধুমাত্র দুনিয়ার লোভে পড়ে পরকালের জিন্দেগীর কথা ভুলে গেছি। মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ঘোষণা করেন—

'তুরিদু জিনাতাল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়ালাতুতি মান আগফালনা কালবাহু আন জিকরিনা ওয়াত্তাবায়া হাওয়াহু ওয়া কানা আমরহু ফুরুতা।'

অর্থ: 'যারা পার্থিব সুখ-সৌন্দর্য কামনা করে, তাদের অনুসরণ করো না। তাদের অন্তর আমার স্মরণ হতে অমনোযোগী রয়েছে এবং সে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তার কার্যক্রম সীমা অতিক্রম করেছে।

—সুরা :কাহাফ: ৪/২৮

যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওয়াজ নসিহত ও ফতোয়া আরোপ করে ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যাখ্যা করে কাউকে কাফের, মুরতাদ বলে তাদের সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল বলেন,

দস্তুর তেরা উছওয়ায়ে শাব্বির নেহি হে,
বয়ান তেরা তাখরিব হে, তামির নেহি হে,
হার এক পে লাগা দেতাহে তু কুফুরকা ফতোয়া,
ইসলাম তেরে বাপকা জায়গীর নেহি হে।

ভাবার্থ : 'তোমরা যা বল! তা তো না বুঝেই বলে থাকো। তাই তোমরা যা বয়ান কর তা শুনতে সুন্দর লাগলেও তার কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। আর তোমরা সুযোগ পেলেই কুফুরির ফতোয়া আরোপ করতে দ্বিধা কর না। ইসলাম তো তোমাদের বাপ-দাদার সম্পদ নয় যে ফতোয়া দেওয়ার জন্য তা ভাড়া দেওয়া হয়েছে।'

সুতরাং মুসলমান হতে গেলে মানুষের উপর অর্পিত দায়িত্ব তথা হক্কুল্লাহ্ এবং হক্কুল এবাদ উভয় দায়িত্বই সুচারুপে পালন করার আমরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পবিত্র কোরআনে এ সমস্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। এ কর্তব্য ও দায়িত্বগুলো পবিত্র কুরআন থেকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সে মোতাবেক সমাজনীতি প্রয়োগ করতে হবে। যারা তা না করে কথায় কথায় কাউকে কুফুরির ফতোয়া দেয় আল্লামা ইকবাল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে উপরোক্ত কাব্য রচনা করেছেন।

কুরআন মুসলমানদের জীবনী-শক্তি এবং বিশ্বনবীর আদর্শ ও প্রেম হচ্ছে ঈমান। এ দুইয়ের বাস্তব অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানের পার্থিব ও পরকালীন সাফল্য, কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভরশীল। আজ মুসলমান সে আদর্শ ও শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে বস্তুবাদ-জড়বাদ-ভোগবাদের শিকার হয়ে অধঃপতনের চরম

www.pathagar.com

সীমায় পৌঁছে গেছে। তাই এ জাতি দুর্ভাগ্যবরণ করে সমাজের গলগ্রহে হয়ে পড়েছে। এ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে তাদেরকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে একমাত্র হেরার রৌশনী–আল-কুরআন ও বিশ্বনবীর আদর্শ। এই কোরআনেই রয়েছে সকল কিছুর সমাধান। তাই আল্লমা ইকবাল এই অধঃপতিত জাতিকে পথ-নির্দেশ করে বলেছেন,

হে মুসলিম! তোমরা যদি ভূতল মাঝে
বাঁচতে সবাই চাও
কুরআন ছাড়া মুক্তি বৃথা
এটা জেনে নাও।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হল সকল জাতির পথপ্রদর্শক। কুরআন জ্ঞানের সমুদ্র। কোরআনে আছে আল্লাহর অভিব্যক্তি, সাথে আহাদ জগতের হাজারও অভিব্যক্তি। এ মহাসমুদ্র হতে জ্ঞান তোলার ডুবুরী যারা, তারা আলোকিত মানুষ। ইকবাল সেই ডুবুরীদের থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে উৎসাহিত করেছেন। যারা কোরআনের ভক্ত তাদের দরজায় এই মহাগ্রন্থকে আরো সহজ করে তুলে ধরার জন্য আল্লমা ইকবালের প্রচেষ্টা ও আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস। দুরন্ত-দুঃসাহস নিয়ে হাতে কলম ধরেছি এবং সকল পাঠকের কাছে আল-কোরআনে নির্দেশিত একটি মারেফত জ্ঞানের সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। একটি সত্য ঘটনা যা হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতের মসনদে বসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছিল। আমরা চেষ্টা করেছি আল্লামা ইকবালের কাব্যরহস্য উদ্ধার করতে। এখানে তিনি কোরআনের তত্ত্বজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের ঈমান ও আধ্যাত্মিক শক্তির অবক্ষয়ের কথা বলেছেন। যারা কোরআনের সঠিক জ্ঞানের অনুসন্ধানী শুধুমাত্র তারাই আত্মোপলব্ধির দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারবেন।
মহান আল্লাহপাক কোরআনের সমস্ত সুরাগুলো মানুষের হেদায়াতের জন্য দান করেছেন। তাই পবিত্র কোরআনে যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ ইতিহাসের পাতা থেকে দেওয়া যেতে পারে—হযরত উমরের শাসনামলে একদিন হযরত আলী (রা.) এক ইহুদির বাগানে পানি সেচের কাজ করছিলেন। এমন সময় হযরত উমর তথায় উপস্থিত হয়ে হযরত আলীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'শীঘ্রই আসুন! অত্যন্ত কঠিন এক সমস্যা। এখনি সমাধান দরকার।'
এ সময়টি ছিল হযরত উমরের খেলাফতের প্রথম দিন অর্থাৎ তিনি খেলাফতের মসনদে আরোহনের সঙ্গে সঙ্গে এক বিচারের আর্জি নিয়ে দুজন মহিলা তাঁর দরবারে এসে হাজির হলেন।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা.) বললেন, ‘দেখুন আমার পক্ষে কাজ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু আমি চুক্তিবদ্ধ। আপনার যা বলার ওখান থেকেই বলুন, আর আমি এখান থেকে সমাধান দেব।’ হযরত ওমর (রা.) বললেন, ‘সমস্যাটি হলো, দুজন মহিলা একই রাত্রে একই ঘরে দু'টি সন্তান প্রসব করেছে। একটি কন্যা সন্তান অপরটি পুত্র সন্তান। কিন্তু দুজনেই দাবি করছে যে পুত্র সন্তান তার, কন্যা সন্তানের কথা কেউ স্বীকার করছে না; আবার কোনো সাক্ষী সবুতও নেই। তারা উভয়েই আমার নিকট বিচার প্রার্থী। মহা এক সমস্যা, এখন আমি কি করব, বলুন?’

এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) বললেন, ‘কেন! আপনি পবিত্র কুরআন পড়েননি?’ হযরত ওমর এতে একটু বিরক্ত হয়ে জওয়াব দিলেন, ‘আরে, এর সমাধান কোরআনে থাকবে কী করে? এ তো এখনকার সমস্যা!’

হযরত আলী বললেন, ‘পবিত্র কোরআনেই তো এর সমাধান আছে। কেন! আপনারা জানেন না আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ

আররীজ্বালু কাওয়ামুনা আলান নিছাই বিমা ফাদ্দালালাহু... ।

—সূরা : আন নিসা : আয়াত : ৩৪

অর্থাৎ ‘পুরুষ মেয়েদের চাইতেও শক্তিশালী, যেহেতু আল্লাহপাক তাদেরকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে অনুগৃহীত করেছেন।’

এরপর হযরত আলী (রা.) পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার সর্বশেষ আয়াত পাঠ করে শোনালেন,

‘ওয়া ইন কানু ইখ্‌ওয়াতার রিজ্বা-লাওঁ ওয়া নিসা– আন ফালিয্‌যাকারি মিছলু হাজ্জিল উনছাইনি ; ইউবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম আন তাদ্বিল্‌লূ ; ওয়াল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন ‘আলীম।’

অর্থ : ‘এবং যদি তার ভাই-বোন, পুরুষ ও নারীগণ থাকে, তবে পুরুষ দুই নারীর সমান পাবে। তোমরা পথভ্রান্ত হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ তোমাদের পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।’

—সুরা : নিসা : আয়াত : ১৭৬

‘হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি এ আয়াতের তত্ত্ব বুঝতে পারেননি। সম্পদে যেমন দুই নারীর সমান এক পুরুষের অর্থাৎ দ্বিগুণ অধিকার রয়েছে তেমনি মায়ের বুকের দুধেও পুত্র সন্তানের অধিকার কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ। আপনি উভয় মহিলার স্তন থেকে এক পাত্রে সমপরিমাণ দুধ নিয়ে ওজন করে দেখুন। যার দুধের ওজন বেশি হবে, পুত্র সন্তান তার।’

www.pathagar.com

অর্থাৎ যে নারী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে তার দুধ সমপরিমাণ হলেও যে নারী পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে তার দুধের ওজন তার দ্বিগুণ হবে।

এরপর হযরত উমর (রা.) এ নির্দেশ মত পুত্র সন্তানের প্রকৃত মাকে পেয়ে গেলন এবং খেলাফত মজলিসে ঘোষণা করলেন, 'লাওলা আলীয়্যুন লাহালা কাল উমর' অর্থাৎ হযরত আলী না থাকলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো।'

এ কথা ঘোষণার কারণ হলো খেলাফতে বসার প্রথম বিচারেই যদি হযরত উমর (রা.)-এর ভুল হয়ে যেতো তবে তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না।

এ ঘটনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সাহাবা কিরামের চাইতে আহলে বাইতের মর্যাদা বেশি। কারণ আহলে বাইত হলেন রাসুল (সা.)-এর গুপ্তজ্ঞানের ধারক এবং কোরআনের মারেফত জ্ঞানের সংরক্ষক। তাদের সিনায় সিনায় এ জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত আছে। তা না হলে হযরত উমর (রা.)-কে আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য হযরত আলীর কাছে সমাধানের জন্য যেতে হতো না।

এজন্য মওলা আলী প্রায় বলতেন 'পবিত্র কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য বিষয়ে আপনাদের যা কিছু জানার দরকার আমার থেকে জেনে নিন কারণ আল্লাহ ও রাসুল (সা.) আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তাতে আমি আপনাদের যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর এবং সমস্যার সমাধান দিতে পারব, ইনশাল্লাহ।'

বিশ্বনবী (সা.) হাদিস শরিফে এরশাদ করেন—

انا مدينة العلم وعلى بابها.(الحديث)

আনা মাদিনাতুল ইলম, ওয়া আলীউন বাবুহা'

অর্থাৎ আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরওয়াজা।

অর্থাৎ যদি কেউ আমার গুপ্ত সুপ্ত ব্যক্ত অব্যক্ত জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত হতে চায় সে যেন আলীর শরণাপন্ন হয়।

এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে আছেন, যিনি আল্লাহর ঘর কাবা শরিফের ভেতরে জন্মলাভ করেছেন, আবার তিনি আল্লাহর ঘরেই শত্রুর ঘায়ে আহত হয়ে শাহাদাত লাভ করেছেন, তাঁর নৈতিক গুণাবলি ছিল নবী করিম (সা.)-এর মতোই; নবুয়তির দায়িত্ব পাবার আগে নবীজি যেসব কিছু অপছন্দ করতেন আলীও (রা.) সেই সব বস্তু পরিহার করে চলতেন, তিনি এই বিশ্বের হাকিকত কিংবা রহস্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কী শত্রু, কী মিত্র সবাই একটি বিষয়ে বিশ্বাস করে যে, রাসুলে খোদা (সা.)-এর পর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি, ন্যায়বান

www.pathagar.com

এবং তাকওয়াবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন হজরত আলী (রা.), তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস যখন 'পণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আলীর জ্ঞানের সঙ্গে তোমার জ্ঞানের পরিমাপ কী রকম? উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস বলেছিলেন, বিশাল সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা বৃষ্টির পানির মতো,

উনিশে রমজান ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি দিন। চল্লিশ হিজরি, ১৯ রমজান তৎকালীন ইসলামি জাহানের রাজধানী কুফার জামে মসজিদে ফজরের নামাজের ইমাম ছিলেন নবীবংশের প্রথম ইমাম মওলা আলী (রা.)। ইমামতি করার সময় পেছন থেকে খারেজি সম্প্রদায়ের নেতা অভিসপ্ত আবদুর রহমান ইবনে মুলজান তার বিষমাখা তরবারি দিয়ে আঘাত হানে মওলা আলীর মাথায়। ফলে মসজিদে কুফা মাওলার রক্তে রঞ্জিত হয়। মওলার মুখ থেকে তখন একটি বাক্যই বের হয়ে আসে— 'কুজতু বিরাব্বিল ক্বাবা' অর্থাৎ 'কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি।' নামাজিরা নামাজ ছেড়ে মওলাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মালাউন ঘাতক ধরা পড়ল মুসল্লিদের হাতে। এ অবস্থায় মওলা আলী তিন দিন অসুস্থ থাকার পর ২১ রমজানে মাবুদ মওলার দিদারে (মিলনে) গমন করলেন।

মওলা আলী তুলনাবিহীন। তিনি এমনই মওলা, যার মধ্যে কোনো প্রকার গলিজ (ত্রুটি-বিচ্যুতি-অপবিত্রতা) নেই। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি পবিত্র বায়তুল হারামে (কাবাতে) জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং আল্লাহর ঘর বলে পরিচিত মসজিদে শাহাদতের পেয়ালা পান করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহতে যার আগমন এবং আল্লাহতেই যার প্রত্যাগমন। তিনি আমাদের পেয়ারা নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রাণ স্বরূপ। পেয়ারা নবী তার অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের সব কিছুই মওলা আলীকে দিয়েছেন। তাই মওলা আলী হলো বেলায়েতের মূল খনি। আসুন, মাওলায়ে মুত্তাকিয়ান ইমাম আলী (রা.)-এর ভালোবাসা নিজেদের অন্তরে স্থান দিই।

কেননা হজরত যিরর ইবনে হুবায়শ (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত আলী (রা.) বলেছেন, আমার নিকট উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অঙ্গীকার হচ্ছে— কেবল মুমিনই তোমাকে ভালোবাসবে আর মুনাফিকই তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।

—সুনানে নাসাঈ (নাসাঈ শরিফ), ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং-৫০১৭ ও ৫০২১। ৫০১৭ নং হাদিস 'ইমান ও এর বিধানাবলি' অধ্যায়ের 'আলামাতুল ইমানি বা ইমানের আলামত' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ৫০২১ নং হাদিস 'ইমান ও এর বিধানাবলি' অধ্যায়ের 'আলামাতুল মুনাফিকি বা মুনাফিকের আলামত' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 'হে আলী! ইমানদার কখনো তোমার শত্রু হবে না এবং মোনাফেক কখনো তোমাকে ভালোবাসবে না।'

আল কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে—'ইন্নামা আনতা মুনযিরু ওয়া লি-কুল্লি ক্বাউমিন হাদি।' অর্থ: 'নিশ্চয়ই আপনি সতর্ককারী এবং প্রত্যেক জাতির (সম্প্রদায়ের) জন্য একজন পথপ্রদর্শক রয়েছে।'

—সুরা: রাদ: আয়াত: ৭

এ আয়াতের ব্যাখ্যা অধিকাংশ তাফসিরকারক বর্ণনা করে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি হলাম সতর্ককারী আর আলী হচ্ছে পথ প্রদর্শক এবং ইয়া আলী তোমার দ্বারা পথের সন্ধানকারীরা সত্যপথ অবলম্বন করবে।'

হজরত আবু বারদা আসলামী বর্ণনা করেছেন, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অজু করার পর হযরত আলী (রা.)-কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সুরা রাদ-এর ৭ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলেন, নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, আমি হলাম সতর্ককারী আর আলীর বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, এই আলী হলো পথপ্রদর্শক।'

—সূত্র : তাফসিরে কাবীর, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭১, তাফসিরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫০২, তাফসিরে দুররে মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৫, তাফসিরে তাবারি, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১০৮।

মাওলা আলীর কাশ্‌ফ তথা দিব্যদৃষ্টি খোদার আরশে আজিম পর্যন্ত বিস্তৃত। সৃষ্টি জগতে রাসুল (সা.)-এর জ্ঞানের একমাত্র উত্তরাধীকার সংরক্ষিত ছিল মওলা আলীর (রা.)-এর মাধ্যমে। খোদার সুস্পষ্ট ঐশী নির্দেশে রাসুল (সা.) এ মহান জ্ঞানের গুরুদায়িত্ব মওলা আলীর হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি নবীর শরিয়ত ও বেলায়াতের ধারক ও বাহকরূপে যুগে যুগে আল্লাহর মনোনীত ও নির্বাচিত প্রেমিক পুরুষদের তরিকত পদ্ধতির মাধ্যমে হেদায়েতের আলো ছড়িয়ে দেন। সমস্ত অলী-আল্লাহগণ মওলা আলীর মাধ্যমে বেলায়াত গগণের আধ্যাত্মিক পরিষদের সাথে যুক্ত হয়ে খোদার নৈকট্যের সাক্ষ্য বহনকারী রূপে বান্দার সাথে খোদার সম্বন্ধ জুড়ে দেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি নৈকট্য ও মানব মুক্তির এ ব্যবস্থা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ ও বান্দার এ নৈকট্যের কথাই মাওলানা রুমি বেলায়াতের প্রতীক রূপে ব্যক্ত করেছেন। তাই রুমি মসনবির বয়েতে ব্যক্ত করেন—

মোৎলকাঁ আওয়াযে খোদ আয শাহবুয়াদ
গার্চে আয হল্কুমে আবদুল্লাহ বুয়াদ ॥

www.pathagar.com

(অলিগণের হৃদয়ন্তরের বাণী যা তাঁরা নিজ মুখে ব্যক্ত করেন) ঐ (বাণীর) আওয়ায সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং (বাদশাহগণের) বাদশাহ আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে হয়ে থাকে; যদিও তা বের হয় আল্লাহর বান্দার কণ্ঠনালী হতে।
অর্থাৎ অলিগণের কণ্ঠনালী হতে আল্লাহ তায়ালার বাণীই শুধু বের হয় না; বরং তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আল্লাহ তায়ালার পরিচালনায় পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই রুমি আরও বলছেন—

গুফত উরা মান যবান ও চশ্মে তু
মান হাওছ ও মান রেজা ও খশ্মে তু ॥

(যিনি আল্লাহর অলি হন) তাঁকে আল্লাহ তায়ালা বলে— 'আমি তোমার কণ্ঠনালী, আমি তোমার চোখ, আমি তোমার সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং আমিই তোমার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি।' মাওলানা রুমি আরও বলেন—

রৌকে বী ইয়াছমা ওবী ইউবছের তুদী
ছরতুয়ী চেজায়ে ছাহেব ছেত্তদী ॥

'যাও! (নিশ্চিন্ত থাক;) আমার দ্বারা শুনা, আমার দ্বারা দেখা পর্যায়ে তুমি পৌঁছেছ। তুমি আমার নিজস্ব; নিজস্ব কি? নিজ-ই হয়ে গিয়েছ।'
যেমন পবিত্র কোরআনের আয়াত—

'অমা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়ালা-কিন্নাল্লা-হা রামা।'
—সুরাঃ আনফালঃ ১৭

অর্থাৎ 'আপনি (হে রাসুল (সা.)) যা নিক্ষেপ করেছিলেন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন।'
উল্লেখিত যে মওলা আলী মুরতযা মুশকিল কুশা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারিম ফানা ফিল্লাহ বাকাবিল্লাহার মাকাম অতিক্রম করে আল্লাহর মহান জাতের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন—*আনাল কুরআনু নাতিকুন ওয়া হাজাল কুরআনু সাবিতুন*
অর্থাৎ 'আমিই হলাম সবাক কুরআন আর *ঐ* কাগুজে কুরআন হল নির্বাক কুরআন।'
নিজেকে আহলে বাইত তথা মওলা আলী ও হুসাইনী প্রেমের গোলাম ঘোষণাকারী প্রেমিকের মুর্শিদের শানে রচিত উক্তিই বলে দেয় তাদের ইশ্‌কের

www.pathagar.com

শক্তি কেমন ছিল। মাহবুবে এলাহি নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রধান খলিফা হযরত আমির খসরু (রা.) ইশ্‌কের উন্মত্ততায় ঘোষণা করেন—

১. সারমাদ্ দার্‌দী আজব শিকাস্তা কার্‌দী।
ঈমা বা ফেদায়ে চাশ্‌মে মাস্তে কার্‌দী ॥

এ কোন প্রচণ্ড হৃদয়ের বেদনায় কী অদ্ভুত রূপ আমার সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়েছ, কেবলই তুমি। আমার সব কিছু এমনকি বুদ্ধি-জ্ঞান আর প্রখরতার প্রতিভাগুলো, একদম অকেজো করে দিল কেবলই তোমার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন চোখ দুটো।

২. উমরে কে বায়াতো আহাদিস গুজাস্তে।
রাফতি ও নেসারে বুত্ পারাশ্‌তে কার্‌দী ॥

অনন্ত অনাদিকালের গোলাম হয়ে কাটিয়ে দেয়ার দয়া হতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না। কারণ, সবকিছু স্বেচ্ছায় হারিয়ে তুমি আমাকে তো কেবলই পীরপূজারক বানিয়ে দিলে ওগো মুর্শিদ।

মুর্শিদের আনুগত্যই রাসুলের আনুগত্য আর রাসুলের আনুগত্যই আল্লাহ্‌র আনুগত্য। মওলা আলীর বেলায়াতের ভাষ্য প্রত্যেক প্রেমিকের হৃদয়ের ভাষ্যে পরিণত হয়েছে। সুফি কবি হযরত খাজা আমির খসরুর নিম্নোক্ত কালামে পরিষ্কার দর্শনটি হয়ে ফুটে উঠেছে—

ঈদ গাহে মা গারিবা কুয়ে তো।
উমেরে ছাতে দিদে দিদাম কুয়ে তো ॥

অর্থাৎ এই গরিবের খুশির ঈদের মাঠটি হলো তোমারই গলিতে (সরু রাস্তা, চিকন পথ, উঠান, দুয়ার, আঙিনা)। তাই আমার অতি পরিচিত জীবনসাথীকে তাঁর আসল রূপে তোমারই গলিতে দেখলাম।

কাবা-এ-মান কেবলায়ে মান কুয়ে তো।
সেজদা গাহে মা আশেকারা আব্ কুয়ে তো ॥

অর্থাৎ আমারই কাবা, আমারই কেবলা তো একমাত্র তোমারই গলিতে। প্রেমিকদের সেজদার একমাত্র স্থানটি তো শুধুমাত্র তোমারই গলিতে।

www.pathagar.com

ছদ হাজারা ঈদ-ও কুরবা নাদকুনাম।
আয় হেলালে মা আব কুয়ে তো ॥

অর্থাৎ কতশত খুশির ঈদ আর কুরবানি তুচ্ছ হয়ে যায় যখন তোমারই গলিতে অবস্থান করি। তাই মারেফতের রহস্যের সদ্য উদিত চাঁদ দেখা পাবার স্থানটি তো তোমারই গলিতে।

দাস্তে কুশা জানিবে বেদম পীরে মা
আব রিনদানে হিম্মতে মা কুয়ে তো ॥

অর্থাৎ তোমারই হাতের সোহাগ-মাখা স্পর্শ, ওগো আমার পীর, আমার অন্ধত্ব দূর করে দেয়। আর জীবনটা থেকেও মৃত্যুর ছোঁয়ায় রহস্যের আলোতে শিহরিত হয়, ক্ষণে ক্ষণে অজানা জিজ্ঞাসায় কেঁপে ওঠে। যিনি পা হতে মাথা পর্যন্ত নূরে নূরময়, সেই তুমিই তো আমার পীর। তোমারই নূরের সাহসী ধারা অর্জন করতে পেরেছি বলে কেবল তোমারই গলিতে পড়ে থাকি।

ইয়া নিজাম উদ্দিন মাহবুবে খোদা।
জুমলা মাহবুবা গোলামে কুয়ে তো ॥

ওগো নিজাম উদ্দিন, খোদার বন্ধু। কেবলই প্রেয়সী হয়ে আছ তাদের কাছে, যারা দাসত্বের শৃঙ্খল তোমারই গলিতে আপন ইচ্ছায় বরণ করে নিতে পেরেছে।
বন্ধুগণ! জান্নাতের বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে রূপকতার আশ্রয় নিয়েছেন কি-না জানি না। তবে জান্নাত বিষয়ে কোরআনে অনেক রকম আরাম-আয়াসের কথা বলা হয়েছে। আবার কোরআনে একজনের জন্য দুটো জান্নাত এমনকি চার চারটে জান্নাত পাবার কথাটি বলা হয়েছে। এখানে তাফসিরকারক পড়েন মহাফাপড়ে।
মহানবী (সা.) যখন সাহাবাদের বলেছিলেন যে, জান্নাত লম্বা এবং চওড়ায় আকাশ-জমিনে ব্যাপ্ত তখন এক সাহাবা প্রশ্ন করেছিলেন যে, তা হলে জাহান্নামের স্থানটি কোথায়? মহানবী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন এই বলে যে, রাত আসলে দিন কোথায় যায় এবং দিন আসলে রাত কোথায় যায়? এই কথায় কি আমরা এই বুঝতে চাইব না যে, যার জন্য জান্নাত তার জন্য সব কিছুই জান্নাত এবং যার জন্য জাহান্নাম তার জন্য সব কিছুই জাহান্নাম। আপন অস্তিত্বের প্রকাশ এবং বিকাশের উপরই জান্নাত-জাহান্নামটি নির্ভর করে। যিনি

www.pathagar.com

জান্নাতি তিনি সর্বাবস্থায় সর্বস্থানেই জান্নাতি এবং যিনি জাহান্নামি সে সর্বঅবস্থায় সর্বস্থানে জাহান্নামী।

বন্ধুগণ! আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে আমরা বিশ্বাস করি পবিত্র কুরআন শুধু বর্তমান এটমিক নিওক্লিয়াস যুগেরই নয় কেয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় বস্তুর সমাধান নিহিত রয়েছে, এটা আমাদের ঈমান। শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন থেকে সে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার যোগ্যতা দরকার। যেমন হযরত আলী (রা.) বের করেছিলেন। এ যোগ্যতা আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এ যোগ্যতা অর্জন করতে হয় আল্লাহ্ ও রাসুল (সা.)-এর সাথে 'সালাত'-এর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে। আল্লাহ্ বলেছেন 'জা লিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহে হুদাল লিল মুত্তাকীন' অর্থাৎ উহা ওই কিতাব যা শুধু মুত্তাকীনদের পথ প্রদর্শন করেন।' সুতরাং পবিত্র কুরআন থেকে হেদায়াত অর্জন করতে হলে মুত্তাকী হওয়া প্রথম শর্ত। 'তাকওয়া' শব্দ থেকে মুত্তাকী যার অর্থ সমস্ত কিছু থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকেই তদ্‌গত হয়ে থাকা। সুতরাং একমাত্র মুত্তাকীরাই পবিত্র কুরআন থেকে হেদায়তপ্রাপ্ত তথা পবিত্র কোরআনের প্রকৃত অনুসারী। তারাই পবিত্র কুরআন থেকে হেদায়েত নেবেন এবং তার যুগোপযোগী বিধান জনগণকে দান করবেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর গাউস, কুতুব, অলিআল্লাহরাই হচ্ছেন সত্যিকার অর্থে মুত্তাকী তথা প্রকৃত কোরআনের অনুসারী। পবিত্র কোরআনের যুগোপযোগী ফয়সালা পেতে হলে আহলে কুরআন অর্থাৎ অলিআল্লাহ, গাউস-কুতুব, পীর-ফকির, বুজুর্গগণের কাছে অবশ্যই যেতে হবে। অন্যথায়, শুধু আরবি বিদ্বানদের কাছে দৌড়ালে তিন কুড়ি তের ফেরকায় বিভক্ত হয়ে আত্মকলহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আর আল্লাহর অতীন্দ্রিয় অসীম জ্ঞানের মধ্যে যে তফাৎ তা আমরা পবিত্র কোরআনে হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনার মাধ্যমে জ্ঞাত হতে পারি। আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী এবং পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানের পণ্ডিত কখনও এক হতে পারে না। তাই পবিত্র কোরআনে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করার কথা বলা হয়েছে, সেই জ্ঞানীরা হলেন অলি আল্লাহগণ।

আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যতীত সাধারণ কোনো মানুষ, সে যত বড় শাস্ত্রীয় পণ্ডিতই হোক না কেন, তার সীমিত জ্ঞান সঠিক সমাধান দিতে ব্যর্থ। হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাই একাই একটি জাতি বলে পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে কারণ তাঁর সম্প্রদায়ের সকলে মিলিত হলেও ইব্রাহিমের (আ.)-এর সমতুল্য হবে না। আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী যারা তাঁদেরকে পবিত্র কোরআনে 'রাসেকুনা ফিল এলম' অর্থাৎ জ্ঞানের *উচ্চ শিখরে আরোহনকারী এবং*

www.pathagar.com

'সাবেকুন' অর্থাৎ অগ্রগামী বলা হয়েছে। তাই রাসেকুনা ফিল এলম ও সাবেকুন ব্যতীত অন্য কেহ উদ্ভূত সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান পবিত্র কুরআন থেকে দিতে অক্ষম। পবিত্র কুরআন হাদিস দুনিয়ার সর্বত্র একই বটে, তবে কুরআন ও হাদিস বুঝার ক্ষমতা সকলের এক নয়। পবিত্র কোরআনের সরাসরি শব্দগত অর্থ করা এক জিনিস আর পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াতের অন্তর্নিহিত জ্ঞানময় অর্থ বুঝা অন্য জিনিস। হযরত আলী (রা.) এরূপ কথা বলতেন বলে জাহেল লোকরা তাঁর সম্পর্কে বলত, 'উনি কোরআনের বাইরে কথা বলেন।' তার উত্তরে হযরত আলী (রা.) বলতেন, 'আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি পবিত্র কোরআনের বাইরে একটি কথাও বলি না। তবে আল্লাহপাক আমাকে যে বোধশক্তি দান করেছেন, অন্যকে তা দান করেননি' [মেশকাত]। হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেছেন 'পবিত্র কোরআনের এক একটি আয়াতের কম করে হলেও ষাট হাজার অর্থ আছে। হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে,

কোনো ব্যক্তি কামেল ফকীহ হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর জন্য সমস্ত কিছুর মহব্বত ত্যাগ না করে এবং পবিত্র কোরআনের ব্যাপক ও বহুল অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম না হয়।

আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি তথা 'রাসেকুনা ফিল এলম' ব্যক্তিদের সম্পর্কে মওলানা রুমি (রা.) বলেন—

বীনি আন্দর খোদ্ উলোমে আম্বিয়া
বে কিতাব ওয়া বে মাঈন ওয়া ওস্তাদ ॥

অর্থাৎ কোনো পুস্তক, কোনো সাহায্যকারী ও কোনো শিক্ষকের বিনা মাধ্যমে তুমি নিজের মধ্যে নবী (আ.)দের জ্ঞানের বিকাশ দেখতে পাবে। মওলানা আরো বলেন—

দানেমে আঁ সি তানাদ জাঁকে জান
নায় জে রাহে দফতর ও নায় আজ জবান ॥

অর্থ : এক আত্মা অপর আত্মা থেকে জ্ঞান লাভ করে, এ জ্ঞান কিতাব পড়ে বা কথা শুনে অর্জন করা যায় না।
নিজেকে দেখার জন্য (নিজেকে বুঝার জন্য) অথবা আত্মদর্শন লাভ করার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তার মাঝে এই পুস্তক যদি সামান্য সহায়ক হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে বিশ্বাস করি।

www.pathagar.com

এখানে আল্লামা ইকবাল কুরআনের শাশ্বত বাণীর আলোকে এই অধঃপতিত জাতির হৃত গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার আশ্বাস-বাণীর অভয় শুনিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকেই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের গভীর জ্ঞান লাভ করতে চাই। জানতে চাই তত্ত্ব জ্ঞান সম্পর্কে কিন্তু কোরআনের তত্ত্ব জ্ঞান সম্পর্কে জানা অত সহজ নয়। তারপরও তত্ত্ব জ্ঞানীদের সংস্পর্শে বা লেখা থেকেও আমাদেরকে গুঢ় রহস্য সন্ধান করতে হয়। তাই ইকবাল বলছেন,

দান করিতে প্রস্তুত আমি
কিন্তু কেহ প্রার্থী তো নেই
পথ দেখাবো বল কারে
মনযিলের পথিকে যে নাই!
শিক্ষা আমার সার্বজনীন
কিন্তু কেহ গ্রহীতা নাই,
আদম যাতে সৃষ্টি হল,
সেই উপাদান এখন যে নাই।
যোগ্য পেলে রাজার মত
সম্মানিত করি তারে,
তালাশ যারা করতে জানে–
নূতন জগত দিই তদেরে॥

উপরোক্ত কাব্যে আল্লামা ইকবাল বিশ্বনীর আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষার মাহত্ব সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এখানে মানব মুক্তি, কল্যাণ ও জীবন বিধানের যাবতীয় কিছুর সুবিন্যস্ত বর্ণনা রয়েছে। অথচ তা গ্রহণ করার মতো কেউ নেই। যে মনযিলে মকসুদের পথে তাদেরকে আলোকিত করবেন বলে ঘোষণা করেছেন, সে মনযিলের যোগ্য পথিকই তো এখন নেই। যে কুরআনিক সার্বজনীন শিক্ষা ও নবীর শাশ্বত আদর্শের মহান বস্তু দান করতে চান তার উপযুক্ত প্রার্থী তো আর নেই। যে গুণ বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যমণ্ডিত উপাদান নিয়ে বাবা হযরত আদম আলাইহিস সালামের আবির্ভাব সেই আদমের উত্তরসূরি আজ আছে কি? এমন যোগ্যতম বিশ্বনবীর আদর্শিক উত্তরসূরি পেলে ইকবাল তাদেরকে মাথার মুকুট বানিয়ে রাজার মতো সম্মান ও মর্যাদার আসনে বসিয়ে রাখতেন। আর যারা বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন ইকবাল তাদেরকে এমন এক নতুন জগতের সন্ধান দিতে চান যার সন্ধান পেতে তারা চিরন্তন শান্তি ও কল্যাণময় সিরাতুল মুস্তাকিমের বাসিন্দা হয়ে যাবেন।

www.pathagar.com

আর এমন পথের পথিকগণ হলেন প্রকৃত মু'মিন। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে সত্য-ন্যায়ের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ মু'মিনদেরকে হতাশামুক্ত জীবন ও বিজয় গৌরবের সুসংবাদ দিয়েছেন, যেমন ইরশাদ হয়েছে :

'ওয়ালা- তাহিনূ ওয়ালা- তাহ্যানূ ওয়া আন্তুমূল আ'লাওনা ইন কুন্তুম্ মু'মিনীন।'

অর্থাৎ 'তোমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না। যদি তোমরা মু'মিন হতে পারো, তাহলে তোমরাই বিজয়ী।'

—সুরা : আলে ইমরান : আয়াত : ১৩৯

আরো ইরশাদ হয়েছে :

'ওয়া লাক্বাদ কাতাব্না- ফিয্ যাবূরি মিম বা'দিয্ যিক্রি আন্নাল আর্দ্বা ইবাদিয়াছ্ ছালিহূন।'

অর্থাৎ 'আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মশীল (সালেহ) বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।'

—সুরা : আম্বিয়া : ১০৫

বন্ধুগণ! মহান আল্লাহর এই ঘোষণা অনুযায়ী বলা যায় বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে হলে সৎকর্মশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আরও যে গুণাবলি মুসলিমের একান্ত অপরিহার্য তা হলো সর্বাগ্রে প্রয়োজন জ্ঞান, যোগ্যতা সৃজনশীলতা এ সকল প্রতিভায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা একান্ত জরুরি। তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও অদম্য স্পৃহার সাথে বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মুসলিম মনন ও চেতনা শক্তির অগ্রনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লামা ইকবালের উদাত্ত আহ্বান। পবিত্র কুরআন মাজীদে এ ব্যাপারে আল্লাহপাকের নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে,

'ওয়া আল্ লাইসা লিল্ইন্সা-নি ইল্লা- মা-সা'আ।'

অর্থাৎ 'এবং মানুষের জন্য চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নেই। যা সে চেষ্টা করে।'

—সুরা : নাজম : আয়াত : ৩৯

আল্লামা ইকবাল আল-কুরআনের উপরোক্ত বাণীর প্রতিধ্বনি করে মুসলিম জাতিকে বার বার ঐক্যবদ্ধ ও কঠোর শ্রমের দ্বারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য নানা দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

www.pathagar.com

নেই সৃজনী প্রতিভা যার
মোদের কাছে সে কিছু নয়,
কাফির ও যিনদিক, তাহার
আর তো কিছু নাই পরিচয় ॥

পৃথিবীর সর্বত্রই মুসলিম জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি অনীহা লক্ষ্য করার মতো। এ জাতির ধমনীতে অলসতার বীজ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য শিকড় বিস্তার করে চলেছে অনবরত। তারা আজ শুধু ক্ষমতার লোভ, সম্পদের লালসা ও প্রতারণার জাল বিতার করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। তারা নবীর আদর্শ ভুলে মিথ্যা, অন্যায় ও প্রতারণাকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের অস্ত্র বানিয়েছে। মুসলমানী গুণ বৈশিষ্ট্য, কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ যে জাতির ধমনীতে চিরপ্রবহমান ছিল সে জাতি আজ দিকভ্রান্ত হয়ে ব্যর্থতা ও হতাশার গ্লানিতে নিমজ্জিত। আর তাই বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির অগ্রগতি ক্ষীণ হতে চলেছে। পক্ষান্তরে বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আগ্রাসনে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে তলিয়ে যাচ্ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতীত ঐহিত্য ও গৌরবের ইতিহাস যেন ক্রমেই পুস্তকের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, আগ্রহহীনতা ও ধর্মান্ধতা এর জন্য অনেকাংশেই দায়ী বলে আল্লামা ইকবাল তাঁর বহু কবিতায় তাদেরকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা ও ধর্মান্ধতাকে পরিহার করে বিশ্ব বিজয়ে আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান করেছেন।
মুসলমানদের অনগ্রসর মনোভাব, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি অনীহার সুযোগে আজ পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শনের সয়লাবে তারা বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থেকে ব্যর্থতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত হয়েছে।
মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসে ঘুণ ধরার কারণে তারা আজ নবীর আদর্শ, প্রেম-মহব্বত থেকে দূরে সরে গিয়ে ঈমানী শক্তি, আধ্যাত্মিক চেতনা ও নৈতিক অবক্ষয়ের চরম সীমায় উপনীত। আল্লামা ইকবাল পুনরায় সেই শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহ্বান করেছেন। চূড়ান্ত পতনের মুখোমুখি মুসলিম জাতির দুর্দশা দেখে ইকবাল মর্মবেদনায় জ্বালাময়ী ভাষায় গাইলেন,

কিয়া কাহা? বাহরে মুসলমাঁ হায় ফাকাত ওয়াদায়ে হুর!
শিক্‌ওয়া বেজা ভী কারে কোই তূ লাযেম হায় শুউর ॥

www.pathagar.com

আদল হায় ফাতেরে হাসতী কা আযল সে দসতূর
মুসলিম আইয়েঁ হুয়া কাফের তূ মেলে হুর ওয়া কসূর ॥

তোম মেঁ হুর্রঁ কা কোই চাহনে ওয়ালা হী নেহীঁ
জাল ওয়ায়ে তূর তূ মওজূদ হায়, মূসা হী নেহীঁ ॥

অর্থাৎ :

১. কে বলেছে যে, মুসলমানদের জন্য শুধু হুরের ওয়াদা, শেকায়েত সঠিক কিনা তোমাদের তো সে অনুভূতি নেই।

২. মহান স্রষ্টার ইনসাফ কখনো বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার অবকাশ নেই। মুসলিম তো আজ হুরের আশাবাদীও নয়, তো তারা কিসের হুর পাবে আর তাই কাফের মুশরিকরা মুসলমানের পথ চলে দুনিয়াতে নানা নেয়ামত পাচ্ছে।

৩. মুসলমানদের মাঝে কোনো ব্যক্তির হুর নেওয়ার আগ্রহ নেই। তুর পাহাড়ের জ্যোতি আজো আছে কিন্তু কোন মুসাই তো নেই।

অর্থাৎ তোমরা এই শেকায়েত করছ যে, মুসলমানের জন্য শুধু হুরের ওয়াদা কিন্তু কবি বলছেন বাস্তবে তোমাদের মধ্যে হুর নেওয়ার আগ্রহী কোন ব্যক্তিই নেই। যদি থাকতো অবশ্যই খোদার পথে চলতো। আর খোদা সম্পর্কে শেকায়েত করা ঠিক নয়। কেননা খোদা সর্বদা ইনসাফ করেন। কাফেররা দুনিয়ার নিয়ামত এজন্য পেয়েছে যে তারা ইসলামের মূলনীতি গ্রহণ করেছে। অথচ তোমরা মুসলমান সম্প্রদায় কাফেরদের গুণ-বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছ, তাই বাস্তবে তোমাদের মধ্যে কেউ হুর গ্রহণ করার আগ্রহী যোগ্য ব্যক্তিই নেই। আমি তো আজও রহমত নাজিল করার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু কেউ আমার করুণা ও কৃপা নেওয়ার উপযুক্ত নেই।

কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ বিচ্যুত হয়ে মুসলমান আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে তাগূতী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিশ্বনবীর অনুপম আদর্শ ও শিক্ষা থেকেও তারা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে ফলে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের অসীম লোভ-মোহ বিবেক-বুদ্ধি শূন্য করে ক্রমেই নিঃস্ব করে দিয়েছে। তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য বিজাতীয় নীতি, সংস্কৃতি ও বন্ধুত্বকে আপন বলে গ্রহণ করেছে কিন্তু এতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি উপস্থিত কিছু সুযোগ-সুবিধে দিলেও তাতে আত্মপ্রসাদ

www.pathagar.com

লাভের কিছু নেই। কারণ তারাও নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থ হাসিলের জন্য মুসলমানদের ব্যবহার করেছে। উপরন্তু এতে মুসলমানদের জন্য কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই ডেকে এনেছে। তাই আল্লামা ইকবাল দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘোষণা করেন :

কোন হায় তারিকে আইনে রাসূলে মুখতার?
মুসলেহাতে ওয়াকত কী হায় কিস কে আমল কা মি'য়ায় ॥

কিস কী আখঁ মেঁ সামায়া হায় শেয়ারে আগইয়ার?
হো গায়ী কিস কী নেগাহ তরযে সলফ সে বেযার ॥

কলব মেঁ সোয নেহীঁ, রূহ মেঁ ইহসাস নেহীঁ
কুছভী পয়গামে মুহাম্মদ কা তোমহেঁ পাস নেহীঁ ॥

অর্থাৎ :

১. আজ তোমাদের মাঝে কে মহানবী (সা.)-এর সঠিক তরিকা মেনে চলছে? তোমরা শুধু সময়মত স্বার্থসিদ্ধি করে নেয়া জান এবং এটাই তোমাদের মুছলেহাতের সময়।
২. আজ কাদের নয়নে শোভা পাচ্ছে অন্য জাতির অনুকরণ? আজ কারা আকাবিরের চালচলনকে ঘৃণার চোখে দেখে?
৩. আজ তোমাদের রূহে কোন অনুভূতি নেই এবং অন্তরে কোন জ্বালাও নেই। মুহাম্মদ আরবী (সা.)-এর পয়গামেরও তোমাদের কাছে কোন মর্যাদা নেই।

সহজ ব্যাখ্যা :

তোমরা ইসলামী বিধানের অস্বীকারকারী। তোমাদের ধর্ম শুধু স্বার্থ উদ্ধার করা। যে কাজে ফায়দা নজর আসে তাকে গ্রহণ কর। তোমরা কাফেরদের রুসুম ও প্রথার অনুকরণকে পছন্দ কর। আর নিজ আকাবিরের তরিকা সম্পর্কে অনাগ্রহী হও। না তোমাদের অন্তরে ইসলামের মুহাব্বত আছে, না আমাদের নবী (সা.)-এর বাণীর কোন মূল্য আছে?

ইমাম সাহেব মসজিদে পান
　　　নামায পড়ার অনুমতি,
মুর্খেরা ভাবে দীনেরা আযাদী
　　　এতেই বাগবাগ অতি ॥

www.pathagar.com

মুসলিম মিল্লাতের এ উগেকজনক অবক্ষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন আরও হৃদয়গ্রাহীভাবে নিম্নোক্ত কবিতায়,

বাহু তোদের শক্তিহীন আর
নাস্তিকতায় প্রাণ উতলা
নবীরও যে লজ্জা আসে
তোদেরে উম্মতী বলা ॥

এভাবে আল্লামা ইকবাল ঘুমন্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির আত্মসচেতনা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর উদাত্ত আহ্বানের ধ্বনি বিশ্বের মুক্তিকামী জনতার প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে।

ইনসানে কামিলের সুমহান আদর্শের মানদণ্ডে আল্লামা ইকবাল মানব-চরিত্র গঠনের স্থপতি ছিলেন। জাতিসত্তার আদর্শিক দিকটি বিশেষভাবে পুনর্গঠনে ছিলেন আপোষহীন। ইকবালের দৃষ্টিতে 'ইনসানে কামিলের' সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং তিনিই মানব মুক্তি ও কল্যাণের মহান দূত। তাঁর মহব্বত ও সুমহান আদর্শের অনুসরণই পারে আমাদের মুক্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে। নিম্নোক্ত কবিতা-পংক্তিগুলোতে তিনি ইনসানে কামিলের চরিত্র চিত্রণ করেছেন,

মু'মিনের হাত যেন আল্লাহ্‌র হাত
তিনি বিজয়ী, চারিত্রিক মাধুর্যতায় রয়েছে তাঁর সুখ্যাতি,
তিনি সাহসী, সুদক্ষ, নির্মাতা ও সৃষ্টিধর্মী,
সুরতে মানুষ হয়েও ফিরিশতা চরিত্রের অধিকারী।
মহান প্রভুর গুণে গুণান্বিত।
উভয় জগতের লালসা থেকে তাঁর হৃদয় মুক্ত
তাঁর সাধ আশা স্বল্প, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য সুউচ্চ।

সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানুষ আল্লাহর গুণের প্রতিচ্ছবি। আল্লাহর গুণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাই তাঁর হাত যেন আল্লাহরই হাত। আল্লাহর সিফাত মানুষের মধ্যে নিহিত আছে। তাই আল্লাহর গুণাবলি মানুষের নিকট অর্পিত হয়। সে জন্য আল্লাহর গুণে, আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত হবার জন্য পবিত্র কোরআনে বারবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—

ছিবগাতাল্লাহ অ মান আহছানু মিনাল্লাহি ছিবগাতাউ অ নাহ্নু লাহু আবিদুন।

—সুরা : বাকারা : আয়াত : ১৩৮

www.pathagar.com

অর্থ : আমরা আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত—আল্লাহর রং অপেক্ষা কার সৌন্দর্য উত্তম? আমরা তাঁরই ইবাদত করি। আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নামগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ইছমে আজম। এই ইছমে আজমের মাধ্যমে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। এই 'ইছমে আজম' যে কোন্‌টি তার সঠিক উত্তর দিতে আরবি বিদ্বানরা অক্ষম। তাই 'ইছমে আজম' শিখতে হয়, জানতে হয় আল্লাহ্র অলিদের কাছ থেকে। 'ইছমে আজম' কঠিন সাধনার ফল। 'ইছমে আজম' হলো আল্লাহ্‌পাকের আদি নাম—যে নামে সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র জিকির করে। এ নাম তারা চিল্লাচিল্লি করে স্মরণ করে না। মুমিন হতে গেলে এ নাম স্মরণ থেকে গাফেল থাকা চলবে না। আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনে হুকুম করেন—

ওয়াজ্‌কুর রাব্বাকা ফিনাফ্‌ছিকা তাদার রুঁয়াও ওয়া খীফাতাঁও ওয়া দুনাল জ্বাহরি মিনাল কাওলী বিল গুদুওয়্যি ওয়াল আছালি ওয়ালা তাকুম মিনাল গাফেলিন।

—সুরা : আরাফ : আয়াত : ২০৫

অর্থ: 'তোমার প্রতিপালক প্রভুর স্মরণ করো তোমার নিজের মধ্যে ভক্তি মহব্বত ও বিনত অবস্থায় এবং ভয়ের সহিত এবং বাহ্যিক কোনরকম শব্দ উচ্চারণ না করে— সকাল-সন্ধ্যায় এবং (এ জিকির থেকে) অলসদের (গাফেলদের) অন্তর্গত হয়ো না।'

আল্লামা ইকবাল অন্যত্র তিনি লিখেছেন :

'এই নায়েব- ইসনানে কামিল (পূর্ণ মানুষ) শুধুই আল্লাহ্র প্রকৃত খলিফা নন, বরং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ অথবা শ্রেষ্ঠ খুদীর অধিকারী। তিনি মানবতার চূড়ান্ত পরিণতি, তাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটে। তিনি এই দুনিয়ার সত্যিকার শাসক এবং তাঁর জ্ঞানের দুনিয়ায় আল্লাহ্র রাজ্য। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত, আদর্শ চরিত্রের অধিকারী, জ্ঞান-শক্তির অধিকারী এই ইনসানে কামিল বা পূর্ণ মানুষই আল্লাহ্র দুনিয়ায় আল্লাহ্র রাজত্ব কায়েম করার জন্য সচেষ্ট থাকেন।'

ইকবালের লেখনিতে দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্ত জাতির প্রাণে স্পন্দন জেগেছে। গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ জাতির ঘোর অমানিশা দূরীভূত করে ঊষার আলোকোজ্জ্বল পথের দিশা দিয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনের অসারতা ও ইসলামী দর্শনের কার্যকারিতা প্রমাণের মত দুরূহ কাজে আল্লামা ইকবাল সার্থক অবদান রেখেছেন। ইসলামের স্বর্ণযুগের আলোকে একটি সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন।

মানুষের পার্থিব জীবন বহু দুঃখ-কষ্টে ভরপুর। দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক ইত্যাদি আরো নানাবিধ কষ্টে মানুষ অহরহ আক্রান্ত। এসব কষ্ট

www.pathagar.com

থেকে উদ্ধার লাভের আশায় মানুষ অহরহ আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। কুরআনের শিক্ষা ও বিশ্বনবীর আদর্শ ভুলে যাবতীয় বস্তুগত আশ্রয়কে মানুষ মুক্তির উপায় বলে ভ্রম করে। মানুষকে এ ভ্রমে পতিত করার কাজ হচ্ছে শয়তানের। শয়তান কখনো স্বশরীরে এসে মানুষকে ধোঁকা দেয় না। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, মোহ-ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান মানুষের মনের অভ্যন্তরে ক্রিয়া করে থাকে। একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আশ্রয় ব্যতীত যাবতীয় বস্তুগত আশ্রয় বা নির্ভরশীলতা মানুষকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। মুখে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলেই আল্লাহর আশ্রয় লাভ করা যায় না। চিন্তা-চেতনা ও কর্মের মাধ্যমে গায়েরুল্লাহর প্রভাব মুক্ত হয়েই রাব্বুল আলামীনের নিকট আশ্রয় চাইতে হয়, তার জন্য পূর্বশর্ত হল 'আমি', 'আমার' তথা অহংবোধের পরিপূর্ণ সমর্পণ বা বিলোপ সাধন করা। এরূপ নফসের কোরবানীই হচ্ছে পবিত্র কোরআনের সার কথা। তাই আল্লাহপাক এরশাদ করেন—

ফাক্বতুলু আনফুসাকুম জালিকা খায়রুল লাকুম ইন্দা রিযিকুম।

—সুরা : বাকারাহ্, আয়াত : ৫৪

অর্থ : 'অতএব, তোমরা তোমাদের নফ্সের কতল কর, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক।'

আরো এরশাদ হচ্ছে—

ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা, অক্বাদ খাবা মান দাচ্ছা হা।

অর্থ : 'যে ব্যক্তি পার্থিব আবেগসমূহ হতে স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ করে কেবল সেই রক্ষা পায়, আর যে ব্যক্তি পার্থিব উত্তেজনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে জীবন হতে নিরাশ হয়।'

এ প্রসঙ্গে আরো এরশাদ হচ্ছে—

কুল ইন কা-না আ-বা উকুম অ-আবনা উকুম অ ইউখওয়ানুকুম অ আয্ওয়াজুকুম অ আশীরাতুকুম অ আমওয়ালুনিক তারাফতুমুহা অ তিজ্বারাতুন তাখশাউনা কাছা-দাহা অ মাছা কিনু তারদ্বাউনাহা আহাব্বা ইলাইকুম মিনাল্লাহি অরাছুলিহী অ জিহাদ্বীন ফী ছাবীলিহী ফাতারাব্বাছু হাত্তা ইয়া তিইয়াল্লাহু বি আমরিহী অল্লা-হু লা ইয়াহদিল ক্বাউমাল ফাছেক্বীন।

—সুরা শামম : আয়াত : ৯-১০

www.pathagar.com

অর্থ : 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল (সা.) এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের পিতা, সন্তান, ভ্রাতা, পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যা মন্দাপড়ার আশংকা কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস (এসব) অধিকতর প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ্র বিধান (গজব) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্ সত্যত্যাগীদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না।'

—সুরা তাওবা : ২৪

অল্পে তুষ্ট হওয়া মনের জন্য সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। মনের এ সন্তোষ অর্জন করতে হয় 'জেহাদে আকবর' তথা রিপুর বশীকরণ সাধনার দ্বারা। এ মানসিক জেহাদের মাধ্যমে মন বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছুটোছুটি ত্যাগ করে এস্তেকামত তথা মহাস্থির অবস্থা বা 'সিরাতুল মোস্তাকীমে' অবস্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই পবিত্র কোরআনের প্রধান দর্শন হচ্ছে আত্মশুদ্ধিকরণ। এ আত্মশুদ্ধি ব্যতীত ইহ্কালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন অসম্ভব।

ইসলামের যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত ভাষ্যের উপস্থাপনার প্রয়োজনে আল্লামা ইকবাল ইসলামের কালজয়ী জীবন-দর্শনের রূপরেখা শিল্পিত অবয়বে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য দর্শনের চাকচিক্য ম্লান হয়ে পড়ে। ইসলামের বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ নতুনভাবে তার বৈশিষ্ট্যের ঘোষণায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। ভাগ্যাহত জাতির জীবনে এক যুগান্তকারী নবজাগরণের সূচনা হয়।

বিংশ শতকের বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলিম মিল্লাতের জীবন-প্রবাহে যে উদ্দীপনা ও প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হয়েছে, তার গোড়ায় রয়েছে ইকবালের কাব্য-ঝংকার ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের আহ্বান। মৃত্যুঞ্জয়ী গান গেয়ে তিনি সমাজের স্তরে স্তরে যৌবনের জলতরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনের যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানদের এগিয়ে চলার অভয় বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর বাণীতে ছিল আশা-উদ্দীপনার দীপ্তি, সুরে তাঁর দীপকের ঝংকার এবং প্রাণে নবীর অসীম প্রেম।

রাসুল (সা.)-এর উসওয়ায়ে হাসনা-অনুপম আদর্শের অনুসরণের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া জেগেছ মুসলিম জাহানের সর্বত্র তথা সারা বিশ্বে। মানবতায় মূল্যবোধ সঞ্জীবিত হয়েছে তার মননশীল সাহিত্য সাধনায়, তাঁর চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বে জন্ম দিয়েছে এক বিপ্লবী নব জাগরণের। দীপ্ত চেতনায় জেগে ওঠেছে খায়রে উম্মত–সর্বশ্রেষ্ঠ কওমের মুক্তির পাগল সন্তানরা।

www.pathagar.com

আল্লামা ইকবালের খুদীতত্ত্ব ও পরমজ্ঞানের রহস্য

'খুদী'র জাগরণের আহ্বান ছিল ইকবাল কাব্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিপর্যস্ত মানবতার সংকট মুক্তির প্রয়াসে তাঁর কাব্য দর্শনে রয়েছে উন্নততর জীবন বোধের সন্ধান। তিনি মুসলিম জাতির কাছে তাঁর হৃদয়ের আকুতি নিবেদন করেছেন জ্ঞান প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির সীমাহীন চৈতন্যের সাথে। ঘোষণা করেছেন নবচেতনা ও প্রেরণাদায়ী মহান বারতা :

'খুদী'র জোরেই মুসলমানের
          ঘটতে পারে পূর্ণ বিকাশ ॥
'খুদী'ই যদি যায় হারিয়ে
          তাহলে সে অন্যেরই দাস ॥

আজকের বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য আমরা ইকবালের কাছে চিরঋণী। বিশ্ব মুসলিম সংহতি, পুনর্জাগরণের এবং নব উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টিতে তাঁর কবিতার ভূমিকা অপরিসীম। আসন্ন নবজাগরণ ও তাওহীদের উত্থান তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিকে অবলোকন করে ঘোষণা করেছেন :

উষার আলোয় রাঙলো আকাশ
          তিমির কুহেলী রজনী যায়,
এবার চমনে তাওহীদি গান
          ঝংকৃত হবে ভোরের বায় ॥

ঘোর অমানিশার অন্ধকার বিদূরিত করে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত মুসলিম মিল্লাতের নবচেতনার অগ্রসৈনিক আল্লামা ইকবাল। তাঁর মতো যুগে যুগে অনেক প্রথিতযশা মনীষী ও বিপ্লবী সংস্কারকের আবির্ভাবে মুসলিম জাতি সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনবোধের সন্ধান পেয়েছে। বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষার উদ্দেশ্য তাঁরা সহজ সরলভাবে ব্যক্ত করে পতিত ও আশাহত মুসলমানদের

www.pathagar.com

আশার বাণী শুনিয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁরা অধঃপতিত জাতিকে সত্য-ন্যায়ের পথে আহ্বান করেছেন। কিন্তু বাধ সেধেছিল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি। তারা এসব মনীষীর উপর চালিয়েছিল অত্যাচারের স্টীম-রোলার- অকথ্য নির্যাতন ও অপবাদের প্রচারণা। তবুও তাঁদের মিশন সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। আল্লামা ইকবালও তাঁর সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের নবজাগরণের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন :

বুলবুলির কুহুতানে হয়তো
          হৃদয় আবার দীর্ণ হবে,
নিদ্রাতুর অলস পথিক
          জাগবে আবার ঘন্টারবে ॥
ওফাদারীর অনুরাগে
          প্রাণটি আবার উঠবে জেগে,
পূর্ব-সুরা পান করতে
          মনটি আবার ব্যস্ত হবে ॥
আজম দেশী পাত্র হলেও
          সুরা আমার আরব দেশী,
গান যদিও হিন্দী আমার
          সুরটি সেই হেজায দেশী ॥

আজকের বিশ্বের প্রায় সোয়া দেড় শ' কোটি মুসলমান তাওহীদের জীবনবাদে উদ্দীপ্ত। আল্লামা ইকবাল এই জাগরণের ধারাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি উম্মতে মুহাম্মদীর চরম বিপর্যয়কালের জন্য আলোর পথের দিশা দিয়ে গেছেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর এই অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তিনি যুগ-যুগ ধরে তাওহীদি জনতার হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। জাতিও তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবে।

আল্লামা ইকবাল (র.) উপমহাদেশের এক কৃতিসন্তান। ইকবালের আবির্ভাব মুসলিম জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাঁর আগমন মুসলিম জাতিকে সমৃদ্ধ ও সম্মানিত করেছে। বিভাগ-পূর্ব ভারতে তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধান। বিশ শতকের ইসলামী নবজাগরণের তিনি সিপাহ্সালার এবং কাব্য ও দর্শনের জগতে ছিলেন পূর্বসূরীদের চিন্তাধারার সার্থক রূপকার। বিশ্বনবীর অনুসরণীয় আদর্শ ও ইসলামের শাশ্বত সার্বজনীন জীবন বিধান জাতির কাছে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি যে সুনিপুণ ও দক্ষ শিল্পীর

www.pathagar.com

পরিচয় দিয়েছেন, তা ছিলো যুগের দাবী ও অতীতের প্রেরণা সঞ্জাত। তিনি নিজেই বলেছেন :

সামনে রাখতা হোঁ উস্ দওরে নশাত আফযা কো মাঁয়
দেখতো হোঁ দওশ কি আয়নে মেঁ ফরদা কো মাঁয় ॥

অর্থাৎ বিশ্বজোড়া খ্যাতি ভরা অতীত আমার সামনে রাখি
গতকালের আসিতে মোর নতুন দিনের স্বপ্ন দেখি ॥

উপরোক্ত কাব্যে আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য, খ্যাতি মসৃদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এই উপমহাদেশেই যেসমস্ত সুফিয়ায়ে কিরাম ও পীর-ফকির-দরবেশ-বুজুর্গদের আগমন ও তাঁদের আদর্শিক ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিনি তাঁদের কথা বলেছেন। তাই ইকবালের জীবন ও কর্ম আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে উপমহাদেশের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রেক্ষাপট এবং মুসলিম উম্মাহ্র পথ পরিক্রমার উপর আলোকপাত করা অপরিহার্য বলে মনে করছি। আল্লামা ইকবালের খুদীতত্ত্ব ও পরমজ্ঞানের রহস্যের মাধে যে আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সার্বজনীন শিক্ষার সমন্বয় ঘটেছে তা বিশ্বজনীন আদর্শ, শান্তি, কল্যাণ, ভ্রাতৃত্ব ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্তের প্রতীক বিশ্বনবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ ও কুরআনের সুমহান শিক্ষা। অন্যভাবে বলা যায় কুরআনই হলো বিশ্বনবীর জীবন চরিত। কেননা উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রা.) কর্তৃক এক হাদিস মারফত জানা যায় যে বিশ্বনবীর জীবন চরিতই হলো আল-কুরআন।

বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষার বিস্তার যাদের জীবনে সবচাইতে বেশি ঘটেছিল তাঁরা হলেন সাহাবা আজমাঈন, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের সুফিয়ায়ে কিরামগণ। মূলত তাদের আবির্ভাবের কারণেই ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিজয় সূচিত হয়েছে। সুফি-দরবেশ, পীর-ফকির-বুজুর্গদের দ্বারাই এ অঞ্চলে ইসলাম বিস্তার ও প্রসার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে বলা যায় ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয় অভিযান আরম্ভ হয় হিজরী ছয় শতকের শেষ ও খ্রিষ্টীয় তের শতকের শুরুতে ৫৮৯ হি. মোতাবেক ১৩০১ইং সনে। কিন্তু ইসলামের বঙ্গবিজয় আরম্ভ হয় এর বহু পূর্বেই। প্রাগ ইসলামিক যুগ হতে আরব বণিকগণ চীন যাওয়ার পথে যে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করতেন ও পণ্য বিনিময় করতেন তা

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক সত্য, আর দক্ষিণ পূর্ব চীনে আরব বণিক বা আরব মুবাল্লিগগণ কর্তৃক ইসলাম প্রচার আরম্ভ হয় হিজরী প্রথম শতকের মধ্যেই।

আরব সাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী ভারত উপমহাদেশ ও পশ্চিম উপ-কূলবর্তী আরব দেশের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সম্পর্ক বিদ্যমান। আরব বণিকরা বাণিজ্য-সূত্রে ভারতবর্ষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ঈসায়ী সপ্তম শতকে মহানবী (সা.)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে যে অনুপম বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তার তরঙ্গাভিঘাত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। অল্পকালের মধ্যেই আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের আলোকচ্ছটা ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছে।

খেলাফায়ে রাশেদার যুগে আরব বণিকরা ভারতবর্ষে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন। ৬২৬ খৃস্টাব্দে একটি আরব জাহাজ একদল বণিক-মুবাল্লিগ নিয়ে ওমান উপসাগর থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূল তানাহ্-এ এসে পৌঁছে। বণিক-মুবাল্লিগরা পার্শ্ববর্তী এলাকা মালাবার ও সিন্ধুতে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের সহযোগিতায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বেশ কয়েকজন সাহাবাও এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন। কথিত আছে– হযরত আদম (আ.) বেহেশত থেকে বহিস্কৃত হলে তাঁকে ভারতবর্ষের সিংহলে রাখা হয়। বর্তমানে তা শ্রীলঙ্কার বাবা আদম পাহাড় নামে খ্যাত। সেখানে তাঁর পদচিহ্ন দর্শন লাভের জন্য সুদূর আরব দেশ থেকে কৌতূহলী মুসলমানরা সিংহলে আসতেন। আর এভাবে আরবীয়দের সাথে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতা লাভ করে।

ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় এ সময়ে কালিকটের হিন্দু রাজা 'জামোরিন' জনসাধারণকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করেন। কয়েক দশকের মধ্যে ভারতবাসী ইসলামের শাশ্বত আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণ কলেমা তাওহীদের ছায়াতলে সমবেত হতে শুরু করে। এসব নব বায়'আতপ্রাপ্ত মুসলিমরা নাবিকের চাকরি গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ড. এ.এম. হুসাইন লিখেন : মালাবারের শেষ হিন্দুরাজা চেরামান পেরুমল স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। মালাবারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।' ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, কয়েক দশকের মধ্যেই মালাবারে ১১ টি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ সময় ইরান, আফগানিস্তান ও ইরাক থেকেও বহু সুফি সাধক ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করে। মূলত তাদের হাত ধরেই এ উপমহাদেশের সর্বত্র দ্রুত ইসলাম প্রচার ও বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ কারণেই ভারতবর্ষকে সুফি-দরবেশ ও পীর-আউলিয়াগণের পুণ্যভূমি বলা হয়ে থাকে। কারণ মূলত তাদের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। তাদের হাত ধরে ইসলামের এই ব্যাপক প্রসারের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে টমাস আরনল্ড লিখেছেন :

www.pathagar.com

ইসলামের সুমহান আদর্শ ও বিশ্বনবীর উদার নীতি, ইসলাম প্রচারক সুফি-সাধকদের সহজ-সরল জীবন যাপন পদ্ধতি, নির্যাতিত জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং সুফি দরবেশদের মানব-প্রীতি ও সেবা ব্রত বর্ণ প্রথায় জর্জরিত ভারতীয়দেরকে ইসলামের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

অবশ্য আরব বণিকগণের মধ্যে সুফি ও বহু দরবেশ ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে সিলেট পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। সিলেট বিজয়ের পূর্বে গৌড় গোবিন্দের রাজ্যে যে মুসলমান (বোরহানুদ্দীন) বাস করত তা সম্ভবত তাদেরই প্রচেষ্টার ফল। পরবর্তী যুগে এ প্রচার সম্প্রসারিত হয় সারা বাংলায় এবং পাকিস্তানসহ ভারতের নানা অঞ্চলে তা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। মোটকথা সমগ্র উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয় আরবের ইয়ামেন, ইরাকের বাগদাদ, বসরা, কুফা ও ইরানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা পীর আউলিয়া তথা সুফি দরবেশদের মাধ্যমে। কোনো রাজা-বাদশাহদের দ্বারা নয় বরং ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব এবং রাজা-বাদশাহদের জন্য মসনদ অধিকারের পথ পরিষ্কার করেছিলেন এ সকল পীর আউলিয়াগণই।

ঈসায়ী অষ্টম শতকের শুরুতে সর্বপ্রথম একটি সুসংবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর অভিযান উপমহাদেশে প্রেরিত হয়। এ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। তাঁর নেতৃত্বে সিন্ধু-বিজয়ের (৭১ খৃ.) পর সিন্ধু ও মুলতানে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম হীন চক্রান্তের শিকার হয়ে আকস্মিকভাবে অপসারিত হন এবং শাহাদত বরণ করেন। তবুও তাঁর সোয়া তিন বছরের শাসনামলে মুসলমানরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেন। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথও সুগম হয়।

সিন্ধু বিজয়ের আড়াই শত বছর পর তুর্কী মুসলমানরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা নেন। তুর্কী বংশোদ্ভূত গজনীর আমীরুল উমরা সবুক্তগীণ (৯৭৭-৯৯৭ খৃ.) ভারতবর্ষে পর পর দু'বার সমরাভিযান পরিচালনা করে হামদান ও পেশোয়ার পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে সমরাভিযানের নতুন পথ প্রদর্শক।

ঈসায়ী ১০০০-১০২৬ সালে সুলতান মাহমুদ তাঁর রাজত্বকালের ২৭ বছরে ১৭ বার ভারতবর্ষে অভিযান চালিয়েছিলেন। এতে ভারতবর্ষে মুসলিমদের আধিপত্যের বিস্তার ঘটে যদিও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এসব অভিযানের কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না, তবে সুফিদের ইসলাম প্রচারের পথ সুগম করার ক্ষেত্রে তাদের অভিযানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ সুফি-দরবেশগণই ছিলেন ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী। ঈসায়ী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে

www.pathagar.com

ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার কার্যে বহু সংখ্যক সুফি-দরবেশ, পীর-ফকির-বুজুর্গ অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি সনজারী (রা.), শেখ জামাল উদ্দীন তাবরিযী (রা.) ফরীদ উদ্দীন গঞ্জে শকর (রা.), নিজাম উদ্দীন (প্রকৃত নাম মুহাম্মদ) আউলিয়া (রা.), বাবা আদম শহীদ (রা.) ও বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে হযরত শাহজালাল (রা.) প্রমুখের নামে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় গজনী বংশের পতনের (৯৬২-১১৮৬ খৃ.) পর ঘোরী রাজবংশ (১১৮৬-১২০৬), মামলুক বংশ (১২০৬-১২৯০ খৃ.) খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০ খৃ.), তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খৃ.) সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১ খৃ.), লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খৃ.), ভারতবর্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এরপর দিল্লীর সালতানাতের পতন ঘটে। শুরু হয় মোগল শাসনামলের।

১৫২৬ খৃ. সম্রাট জহির উদ্দীন বাবর ইবরাহীম লোদীর সাথে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়ী হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটাই ছিল উপমহাদেশে মুসলমানদের সুদীর্ঘ শাসনামল। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের বিরাট প্রভাব বিস্তার হয়। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও স্থাপত্য শিল্পে তারা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।

মোগল বাদশাহ্ আকবর ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় সাধনের জন্য অভিনব প্রয়াস চালিয়েছেন। 'দীন-ই-ইলাহী' নামে তিনি এক নতুন তথাকথিত 'ধর্ম' পেশ করেছিলেন। এটা ছিল ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ। ইসলামী বুদ্ধিজীবি তথা আলিমরা আকবরের এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। দেশ বরণ্যে আলিম, সিংহ-পুরুষ শেখ আহমদ সরহিন্দী (রা.) এই ঘোর দুর্দিনে এ নব ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির কবল থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে তিনি জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের কারণে তিনি কারাবরণ ও অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেন। ইসলামী আদর্শ ও বিশ্বনবীর প্রচারিত অনুসরণীয় শাশ্বত সার্বজনীন মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বস্তুত এটা ছিল ভারতের ইতিহাসে প্রথম ইসলামী আন্দোলন।

শেখ আহমদ সরহিন্দী (রা.) রাজা-বাদশাহদের ইসলাম-বিরুদ্ধ কার্য-কলাপের কঠোর সমালোচনা করতেন। বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তাঁর এ অবদানের জন্য তিনি মুজাদ্দিদ-ই আলফেসানী বা দ্বিতীয় সহস্র বর্ষের সংস্কারক-এর মর্যাদা লাভ করেছেন।

www.pathagar.com

সম্রাট মহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পর ভারতবর্ষের শাসনকার্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ ও ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী। আলমগীর-জিন্দাপীর নামে খ্যাত ছিলেন। বিশ্ব-মুসলিম সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে তিনি উপমহাদেশের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। মক্কা, পারস্য, বুখারা, বলখ, আবিসিনিয়ার সুলতান এবং বসরা, ইয়েমেনের শাসনকর্তাদের কাছ থেকে কূটনৈতিক মিশন প্রেরণের আহ্বান জানান।

তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ তথা বিশ্বনবীর প্রচারিত নীতি আদর্শের বিরুদ্ধ শিক্ষা, শিরক ও মদ ব্যবসার মুলোৎপাটন করেন। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় রোধ করেন। তিনি রাসুলে করিম (সা.)-এর প্রতি কটুক্তির দায়ে হুসাইন মালিককে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে ইসলামী আইনের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'ফতোয়ায়ে আলমগিরী' রচিত হয়।

উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার মিশনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন পীর-আউলিয়া তথা সুফি সাধনগণ। তাঁদের হাত ধরে ইসলাম প্রচার, সংস্কার ও হেদায়েতের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে সুফিগণ প্রবেশ লাভ করে সেন রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালের অবসানের সাথে সাথে এবং ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর আগমনের পর (১২০১ খ্রি.) থেকে তুর্কী মুসলমান কর্তৃক বাংলাদেশ (তৎকালীন বঙ্গদেশ-ভারতের পশ্চিম বাংলা+বর্তমান বাংলাদেশ) জয় করার পর আরব, ইরান, ইরাক ও তুরস্ক থেকে দলে দলে মুসলমান পীর ফকির দরবেশ এদেশে আগমন করে এবং ইসলামের তৌহিদের বাণী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও শান্তির কথা প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের প্রচারিত বাণী ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণ ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে হিন্দু ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। ইতিপূর্বে রাজা বল্লাল সেন হিন্দু ধর্মকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করেন। নিম্ন শ্রেণির হিন্দুগণের জন্য পূজা-পার্বন ও বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ করা হয়। এক স্থানে বসে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুদের সাথে পানাহার এবং বিবাহ নিষিদ্ধ করে তাদেরকে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এসব বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত (কোন কোন স্থলে মজলুম) হিন্দুগণ ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তির আহ্বানে মুগ্ধ হয়ে স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। বাংলাদেশে (অবিভক্ত বাংলায়) ইসলামের পবিত্র বাণী বহন করে নিয়ে আসেন তৎকালীন সুফি ফকির পীর দরবেশগণ। এঁরা যেমনি ছিলেন শিক্ষিত আলিম, তেমনি ছিলেন আল্লাহ্তে সুফিপ্রাণ। এইসব সুফির ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল পুত পবিত্র ও মাধুর্যময় যে,

www.pathagar.com

অনেক বিধর্মীই এঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামের ইতিহাসে একটি কথাই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় যে, মুসলমানগণ রাজ্য জয়ের লোভে যুদ্ধ বিগ্রহ করেননি। বরং ইসলামী জীবনাদর্শ প্রচারকল্পে দলে দলে মুসলিম দিক হতে দিগন্তরে ছুটে গেছেন এবং বহু স্থলে যুদ্ধ বা কলহ ব্যতিরেকেই বিধর্মীগণ ইসলামকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ইসলামের বাণী এমনিভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তা আশ্চর্য আলাউদ্দীনের প্রদীপের যাদুর মতই কাজ করেছে। তাই ইসলাম প্রচার হয়েছে তলোয়ার নয়, উদারতায়, সহনশীলতায়, সাধুতায়, পবিত্র সুন্দর চারিত্রিক গুণে ও মধুর ব্যবহারে। এর উজ্জ্বল নিদর্শন এই বাংলায় আগত সুফিগণের নিরলস প্রচার এবং বাংলার গণমানসে তার সহৃদয় স্বীকৃতি।

> ১২০১ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাংলা জয় করেছিলেন, বলা বাহুল্য, এ ছিল রাজনৈতিক বিজয়মাত্র; কিন্তু বাংলাকে প্রকৃত পক্ষে জয় করেছিলেন বখতিয়ার খলজির পর এদেশে আগত সুফি দরবেশগণ এবং তাঁরাই এদেশে ইসলামের বুনিয়াদী পতাকার স্থাপয়িতা। তবে এর পূর্বেও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবসায় ও ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে-মুসলমানদের আগমন হয়েছিল। এ সময় কয়েকজন সুফি দরবেশও এদেশে আগমন করেছিলেন।

কালের প্রবাহে নিরন্তর গতিতে বয়ে চলেছে সেই সুদূর অতীতের বখতিয়ার খলজী হতে আজ অবধি; কিন্তু বাংলায় সুফিদের এই প্রয়াস, এই প্রভাব, এই ঝাণ্ডা আজো দেদীপ্যমান, আজো উজ্জ্বল। এদেশে এসেছে পাঠান, এসেছে মুঘল, এসেছে ইংরেজ, এসেছে পাকিস্তানী খান প্রভৃতি-সবই ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে অতীতের গর্ভে আজ বিলীন। একজন এসেছে, অন্যজন গিয়েছে। একজনের গর্বিত পদক্ষেপে আগমন, অন্যজনের অবনমিত মস্তকে বিদায়। এই বাংলার সুশ্যামল বুকের ওপর ঘটে গেছে কত উত্থান পতনের ইতিহাস, রয়েছে কত রক্তের বন্যা, ঘটেছে কত অস্ত্রের ঝনঝনানি। বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে কত না পরিবর্তনের পর থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাসের এই স্বাক্ষর বড়ই উজ্জ্বল এবং বিচিত্র। কিন্তু সুফিদের আগমনকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই বাংলায় এঁদের প্রভাব একইভাবে ফলগুধারার মত প্রবাহিত, আকাশের মত অবারিত এবং মৃত্তিকার মত সৃজনশীল ও উদার।
বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবতই ভাবপ্রবণ, আল্লাহ্‌ভীরু ও অতিন্দ্রীয় শক্তিতে বিশ্বাসী। ফলে সুফিতত্ত্বের মৌলিক গুণ ধর্মের সঙ্গে এ দেশের মানুষের মানস-লোকের রয়েছে এক আশ্চর্য মিল। সেজন্যেই মরমী বাণী ও সংগীত এদেশের

www.pathagar.com

আপামর মানুষকে করে তোলে পাগল ও দেওয়ানা। পীর ফকীরের নামে, সুফি দরবেশের জন্য আজো তাই এদেশের জনতা জান কুরবান করতে রাজী। আজো তাই পীর দরবেশগণ হিদায়েতের বাণী প্রচার করে এ দেশের অগণিত মানুষকে দিচ্ছেন সিরাতুল মুস্তাকীমের নির্দেশ, সঠিক ও সত্য পথের সন্ধান। অবিভক্ত বাংলায় আল্লামা ইকবাল ও কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের লেখায় কবিতায় মুসলমানদের যে বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির কথা বলেছেন তা বিশ্বনবীর আদর্শ, কুরআনিক শিক্ষা ও সুফিদের প্রচারিত শাশ্বত সার্বজনীন জীবনাদর্শ। উপমহাদেশে সুফিদের ইসলাম প্রচার এবং বাংলায় তাদের আবির্ভাব এ ভূখন্ডকে অগণিত সুফি দরবেশ ও পীর ফকীরের পুণ্যভূমির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। সুফিরা বহুবিধ তরিকার মাধ্যমে নিজেরা যেমন করেছেন সাধনা, তেমনি পথ দেখিয়েছেন তাঁদের শিষ্য মুরীদদেরকে।

> বাংলাদেশে বহু সুফি তরিকার আবির্ভাব হয়েছে। তার মধ্যে চিশতিয়া, কাদিরিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, ওয়ায়েসিয়া, আহ্মাদিয়া, আদ্হামিয়া, নকশবন্দিয়া, খিজিরিয়া, কলন্দরিয়া ও তাবাকাদী বা মাদারিয়া প্রধান। এ ছাড়া হুসাইনী, রূহানিয়া ও শফ্ফারিয়া উপশাখাও বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে।

এদেশে প্রথম যে সুফি সাধক আগমন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন সুফি সম্রাট হযরত বায়েজিদ বুস্তামী (রা.)। তাঁর আগমনের সত্যতা সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান আছে। কারণ এ পর্যন্ত এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়নি যে, তিনি এদেশে সত্যসত্যই আগমন করেছিলেন। তবু তাঁর কিছু নিদর্শন চট্টগ্রামে বিদ্যমান রয়েছে। চট্টগ্রামে যে মাজারটি হযরত বায়েজিদ (রা.)-এর বলে কথিত আছে, বস্তুতঃ ওটা একটা ভুল ধারণা। তাঁর মাজার ইরানের অন্তর্গত বুস্তামে অবস্থিত। তিনি সেখানে ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি কাদিরীয়া তরিকার তাইফুরিয়া শাখার প্রবর্তক। বল্লাল সেনের সময় হযরত বাবা আদম শহীদ (রা.) সাত হাজার শিস্যসহ মক্কা থেকে বাংলায় আগমন করেন বলে কথিত আছে। তিনি এ সময় বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধে শহীদ হন। রামপালে তাঁর মাজার বিদ্যমান। এ সময়ের শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমি (রা.) নামে একজন সুফি ইসলাম প্রচার করতে আসেন এবং ময়মনসিংহের নেত্রকোনায় তাঁর ইন্তেকাল হয়। কারুর মতে তিনিই প্রথম এদেশের সুফি। হযরত শাহ্ সফীউদ্দীন (রা.) এ সময় নদীয়ায় কাদিরিয়া তরিকার প্রচার করেন। তিনি সেখানে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।
এদেশে আগমন করেছিলেন হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রা.)-এর প্রধান খলিফা হযরত শায়েখ ফরিদুদ্দীন মাস্উদ গঞ্জে শকর (রা.)। তিনি

www.pathagar.com

চিশতিয়া তরিকার শ্রেষ্ঠ পীর এবং জগৎবরেণ্য সুফি সাধক। তিনি হিদায়েত উপলক্ষে দিল্লী থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝির দিকে বাংলাদেশে আগমন করেন। তাঁর নাম অনুসারে ফরিদপুর জেলার নামকরণ হয়। ফরিদপুর শহরে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এখনো সে স্মৃতি বহন করে সেখানে একটি আস্তানা বিদ্যমান আছে। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হন। বলা বাহুল্য চট্টগ্রামের ফরিদাবাদ তাঁরই পুণ্য নামের স্মৃতি বহন করছে। চট্টগ্রামে তিনি কিছুদিন অবস্থান করার পর দিল্লীতে ফিরে যান। তিনি ১২০১ খ্রিস্টাব্দে পাকপত্তনে ইন্তেকাল করেন।

শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার (রা.) ছিলেন দামেশকের শায়েখ তওফিকের মুরীদ। পীরের আদেশে তিনি বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তিনি মাছের পিঠে আরোহণ করে এসেছিলেন বলে তাঁর নাম 'মাহী সওয়ার' হয়। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে তাঁর মাজার বিদ্যমান আছে।

হযরত মখদুম শাহ্ দওলাদ শহীদ (রা.) বাংলায় আসেন ১৩শ শতকের প্রথম দিকে। তিনি পাবনা জেলার শাহজাদপুরে আস্তানা করেন এবং বহু অনুচরসহ এখানেই এক হিন্দু রাজার সাথে যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর পীর ছিলেন হযরত শামসুদ্দীন তাব্রিজী, যিনি মাওলানা রুমি (রা.)-এরও পীর ছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে শাহজাদপুর নাম হয়েছে।

এ সময় শায়েখ জালালুদ্দীন তাব্রিজী (রা.) এদেশে আগমন করেন। তাঁর পীর হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ারদী (রা.)। তিনি ১৩শ শতকে এদেশে আসেন এবং পাণ্ডুয়ায় দেহত্যাগ করেন। অতঃপর এদেশে আগমন করেন বরণীয় সাধকশ্রেষ্ঠ হযরত শাহ্ জালাল (রা.)। তিনি চতুর্দশ (মতান্তরে পঞ্চদশ) শতকে বাংলাদেশের সিলেট (তখন আসামের অন্তর্গত ছিল) শহরে আগমন করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল শায়েখ জালালুদ্দীন মুজর্রদ (রা.) (চিরকুমার)। তিনি তুর্কীস্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পীর ছিলেন হযরত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রা.)। তিনি পিতার এজাযতক্রমে বাংলায় আগমন করেন এবং সিলেটে রাজা গৌর গোবিন্দকে নানা অলৌকিক কেরামতির সাহায্যে পরাজিত করে সেখানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি ৩১৩ জন সঙ্গীসহ এদেশে আগমন করেছিলেন এবং সফরকালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬০-এ উন্নীত হয়। এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন উঁচুস্তরের অলিয়ে কামিল। ইব্নে বতুতার মতে, 'সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা পর্যন্ত তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।' হযরত শাহ্ জালাল (রা.) খলিফাদিগকে কয়েক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন স্থানে পাঠান। তন্মধ্যে ত্রিপুরা জেলায় পাঠান সৈয়দ জাফর, সৈয়দ আব্দুল গফুর, সৈয়দ ইবরাহীম, সৈয়দ ইসমাঈল, সৈয়দ ইসহাক, সৈয়দ মৌলভী রওশন আলী, সৈয়দ গোলাম মুর্তজা, শাহ্ জামাল, শাহ্ কামাল,

www.pathagar.com

সৈয়দ শাহ্ আকরাম আলী ও শাহ্ আম্বিয়াকে এবং ঢাকায় প্রেরণ করেন মাওলানা হাফিজ আহমদ শাহ্ হাফীযুল্লা, শাহ্ মুহাম্মদ দাইম, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ, শাহ্ রওশান আলী, শাহ্ আহমদুল্লাহ্ প্রমুখকে। এতদ্ব্যতীত নোয়াখালীতে নানা শাহ, হারুন শাহ, ইনায়ত কমরবক্তা, মাহবুব শাহ, মিয়া সাহিব বোগদাদী, সৈয়দ আহমদ ওরফে 'কল্লা শহীদ' প্রমুখকে ইসলাম প্রচার কার্যে প্রেরণ করেন। এ ছাড়াও কাছাড়, রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হযরত শাহ্ জালালের খলিফাগণ ইসলাম প্রচার করেন। ২৪ পরগণার পীর সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোরাচাঁদ তাঁর খলিফা ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে সুন্দরবন এলাকায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন। কথিত আছে যে, হযরত শাহ জালাল (রা.) বিখ্যাত পীর ও জগতবরেণ্য তাপস হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রা.)-এর সাথেও সাক্ষাত করেছিলেন। ১৩৪৮/৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিলেট শহরে ইন্তেকাল করেন। সমগ্র বাংলাদেশ ও পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ তাঁর মাজার যেয়ারতে আসেন।

বাংলাদেশের অন্য একজন তাপস হলে হযরত শাহ্ মখদুম রুপোস (রা.)। ইনি হযরত গাউসুল আযম শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী (রা.)-এর আদেশে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি বহু লোককে হিদায়েত করে রাজশাহীতে খান্‌কা স্থাপন করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এঁর অন্য ভ্রাতা হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ্ নূরী (রা.) নোয়াখালীতে এই একই সময় আগমন করেন।

বাংলাদেশে অন্য একজন সুফি সাধক আগমন করেন, তিনি হলেন হযরত শাহ আলী বোগদাদী (রা.)। তিনি বাগদাদ শরীফ হতে ইসলাম প্রচারার্থে বঙ্গদেশে আগমন করেন (১৫৭৭ খ্রি.), ঢাকার মীরপুর ১-এ খান্‌কা স্থাপন করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কামিল অলি ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে তাঁর বহু ভক্ত ছিল। মীরপুর ১-এ তাঁর মাজার অবস্থিত।

এ সময়কার আর একজন বিখ্যাত সুফি দরবেশ হযরত খান জাহান আলী শাহ (রা.) এদেশে আগমন করেন। তিনি দক্ষিণ বঙ্গের বন ও দুর্গম অঞ্চলে, পশ্চিম বাংলার (ভারতে) বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। খুলনা জেলার বাগেরহাটে তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ বিদ্যমান। আর একজন প্রখ্যাত সুফি প্রবর হযরত শরফুদ্দীন চিশতি (রা.) হিন্দুস্থান হতে বাংলায় আগমন করেন। ইনি জালালী বিলায়েতসম্পন্ন কামিল অলি ছিলেন। তিনি ঢাকা শহর ও আশেপাশে অগণিত মানুষকে হিদায়েত করেন। তাঁর মাজার ঢাকার হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে অবস্থিত। যাকে সবাই হাইকোর্ট মাজার বলে জানে।

www.pathagar.com

হযরত শায়েখ আলাউদ্দীন হক (রা.) ছিলেন এ সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দরবেশ। তাঁর পীর ছিলেন হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রা.)-এর অন্যতম খলিফা হযরত শায়েখ সিরাজুদ্দীন ওরফে আখি সিরাজ (রা.) (মৃত্যু ১৩৫৭ খ্রি.)। তিনি ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর থেকে আলাই বাখালিদিয়া তরিকার সূচনা। তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত শায়েখ নূরুদ্দীন নুরুল হক কুতুবুল আলম (রা.) ছিলেন সে যুগের আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের অন্যতম। তিনি তাঁর পিতার নিকটেই মুরীদ ছিলেন এবং সিদ্ধি লাভ করে কুতুবুল আলম উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুয়াতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর থেকে নূরী তরিকার সূচনা।

শায়েখ আলাউল হকের মুরীদ ও খলিফা মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর শিমনানী (রা.) বাংলার অন্যতম সুফি সাধক। তিনি ঢাকার অদূরে মুয়াযযম পুরে ইন্তেকাল করেন।

সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর মুরীদ ও খলিফা মাওলানা কিরামত আলী (রা.) জৌনপুরীকে বঙ্গের হাদী বলা হয়। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এদেশে আগমন করেন এবং উত্তর বাংলা তথা সমগ্র বাংলায় ইসলামের হিদায়েত বাণী প্রচার করেন। তিনি সুফি হিসাবে যত না খ্যাতিমান তার চাইতে আলিম হিসাবে বেশি শ্রেষ্ঠ। তিনি কতিপয় পুস্তকও রচনা করেন। তিনি রংপুরে ইন্তেকাল করেন। রংপুর শহরে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত।

শায়েখ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামাহ (রা.) মধ্য বাংলায় তাঁর প্রচার কার্য চালান। তিনি বুখারার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সোনার গাঁয়ে আস্তানা স্থাপন করে মানুষকে হিদায়েত করতে শুরু করেন। তিনি ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি 'ইরশাদাত তালিবীন;, 'মা আদাল উল্‌মা আলী আযীকা' প্রভৃতি সুফিতত্ত্বমূলক পুস্তকের রচয়িতা। তিনি বিহারে ইন্তেকাল করেন।

এ সময়কার অন্য একজন সুফি দরবেশ হযরত সৈয়দ খায়েরুদ্দীন ওরফে শাহ সাদেক আলী চিশতী (রা.)। ইনি দিল্লী হতে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি মুরীদ ছিলেন দিল্লীর বিখ্যাত পীর ও তাপসপ্রবর হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন ফখরে জাহাঁ (রা.)-র। বাংলার বহু স্থানে তিনি বহু লোককে হিদায়েত করেন। তিনি আসাম ও বার্মা পর্যন্ত তাঁর হিদায়েত কার্য সম্প্রসারিত করেছিলেন। তিনি বার্মার রেঙ্গুনে ইন্তেকাল করেন। তিনি চিশতিয়া নিজামিয়া তরিকা অনুযায়ী মুরীদ করতেন এবং কিছু গজল ও দিওয়ান রচনা করে গেছেন।

হযরত শাহ মুয়াযম দানিশমন্দ শাহদৌলা পীর (রা.)-এর কিছু পূর্বে (পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম) এদেশে আসেন। এছাড়া শাহ ইসমাঈল গাজী (রা.)-এর নাম বিখ্যাত। তিনি মক্কা শরীফ হতে এদেশে প্রচার কার্য চালাতে আসেন। পঞ্চম শতাব্দীর হযরত শাহ পালোয়ান (রা.)-এর নামও বিখ্যাত। তিনি ফরিদপুর

www.pathagar.com

জেলার শেকাড়া গ্রামে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর তাঁর নির্দেশেই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা অবস্থায় অদ্যাবধি বিদ্যমান।

হযরত শাহ্ সাদেক আলীর (রা.) বাংলাদেশস্থ খলিফা হযরত শাহ মিসকীন আলী চিশতী (রা.) ছিলেন শহীদ তীতুমীরের সমসাময়িক এবং তীতুমীরের অন্যতম আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক। শাহ্ মিসকীন (রা.) ছিলেন এ যুগের তাপস শ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামিল এবং তীতুমীরের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ্বস্ত সহচর ও উপদেষ্টা। তিনি কলিকাতার কড়েয়াতে ইন্তেকাল করেন। তিনি একখানি 'দিওয়ান' রচনা করে গেছেন। সারা বাংলায় (উভয় বাংলা) তিনি হিদায়েত কার্য পরিচালনা করেন। তিনি চিশতিয়া তরিকার নিজামিয়া শাখার মধ্যে মিস্কীনিয়া উপশাখার প্রবর্তক।

সমসাময়িককালে মেদিনীপুরের হযরত শাহ্ সৈয়দ মুরশিদ আলী আলকাদিরী (রা.)-এর নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁর পিতা হযরত শাহ মেহের আলী (রা.)-ও একজন অলিয়ে কামিল ছিলেন। ইনিই প্রথম বাংলায় আগমন করেন এবং মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ বাগদাদের সুবিখ্যাত তাপস ও সুফিশ্রেষ্ঠ হযরত গাউসুল আযম শায়েখ আব্দুল কাদিরা জিলানী (রা.)-এর বংশধর। হযরত শাহ্ মুরশিদ (রা.) শ্রেষ্ঠ সুফি ও তাপস ছিলেন। তিনি বাংলায় (উভয় বাংলা) বহু লোককে হিদায়েত করেন এবং একখানি উচ্চস্বরের 'দিওয়ান' রচনা করেন। তিনি মেদিনীপুরে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

সমসাময়িককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফি-দরবেশ ছিলেন হযরত খাজা শাহ্ আব্দুর রশীদ চিশতি নিজামী (রা.)। ইনি কলকাতায় বেলেঘাটার সুবিখ্যাত পীর ও দরবেশ হযরত শাহ্ সৈয়দ সাফাতুল্লাহ কুতুবে আলম (রা.)-এর মুরীদ ও প্রধান খলিফা। তিনি সারা বাংলায় হাজার হাজার লোককে হিদায়েত করেন এবং তৌহিদের বাণী শোনান। তিনি 'জ্ঞান সিন্ধু' 'দেওয়ান রশীদ' ও 'অন্ধের চক্ষুদান' নামে তিনখানা উচ্চস্তরের সুফিতত্ত্বমূলক পুস্তক রচনা করেন। তিনি ১৩৪৭ (বাংলা) সালে ঢাকা জেলার ঝিট্কাতে ইন্তেকাল করেন।

এতদঞ্চলের অন্যতম সুফি ছিলেন হযরত শাহ আব্দুর রহীম (রা.)। ইনি ওয়ায়েসিয়া তরিকার একজন বিখ্যাত বুজুর্গান ও দরবেশ ছিলেন। তাঁর রচিত 'মসনবী' বাংলাদেশে সুবিখ্যাত। তিনি বিংশ শতকে ঢাকা জেলায় ডাকরখালীতে ইন্তেকাল করেন।

এইভাবেই দেখা যায় বাংলার এখানে সেখানে অসংখ্য সুফিয়ায়ে কিরাম ঘুমিয়ে রয়েছেন এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রভাব এখনও অযুত জনতার আলোক পথের সন্ধান দিচ্ছে। এদেশের জনগণের প্রাত্যহিক কাজকর্মে, চিন্তা-ভাবনায়, গানে-

www.pathagar.com

কবিতায়, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, ধর্মীয় বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক-সর্বদিক দিয়ে সুফি দরবেশদের শিক্ষা, অভিজ্ঞান ও স্বজ্ঞার প্রভাব বিদ্যমান। সারা বাংলা তথা এই উপমহাদেশ পীর-আউলিয়াগণের পুণ্যভূমি হিসেবে প্রসিদ্ধ। অপরদিকে বাংলাদেশ সুফিদের তীর্থস্থান।

বঙ্গবিজয়ের পূর্ব যুগের ইসলাম প্রচারক পীর-আউলিয়াগণের মধ্যে আমরা এ যাবৎ যাঁদের নাম জানতে পেরেছি তাঁদের শীর্ষস্থানে আছেন হযরত শায়খ আব্বাছ বিন হামজা (রা.) নিশাপুরী। তিনি ২৮৮ হিজরী মোতাবেক ৯০০ ইংরেজি ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন অর্থাৎ বঙ্গবিজয়ের তিনশত বছর পূর্বেই তিনি বাংলায় ইসলাম প্রচার করেছেন। অতঃপর আমরা এ যুগে যাঁদের পেয়েছি তাঁরা হলেন, ঢাকায় হযরত শায়খ বিন্ মোহাম্মদ ওরফে জাফারুল হাজজার (রা.) ইন্তেকাল ৩৪১ হিজরী মোবাবেক ৯৫২ ইং) ও হযরত শায়খ ইসমাইল বিন নজন্দ (রা.) নিশাপুরী (ইন্তেকাল ৩৬৬ হিজরী মোতাবেক ৯৭৫ ইং) এবং ভারতের মুর্শিদাবাদের হযরত শায়খ ইব্রাহীম তা'কী (রা.) (ইন্তেকাল ৫৬৫ হিজরী মোতাবেক ১১৬৯ ইং) আর বিজয় পরবর্তী যুগের প্রথম পাদে যাঁরা বাংলায় ইসলাম প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, ভারতের মালদহ গৌড়ের হযরত শাহ্ জালাল তাবরেজী (রা.) ইন্তেকাল ৬৪২ হিজরী মোতাবেক ১২৪৪ ইং, ঢাকা সোনার গাঁয়ের শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রা.) (ইন্তেকাল ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ ইং)। ভারতের মালদহ্ পাণ্ডুয়ার হযরত আখি সিরাজ ওসমান বাঙ্গালী (রা.) (ইন্তেকাল ৭৩০ হিজরী মোতাবেক ১৩২৯ ইং), তদীয় খলিফা হযরত আল্লামা আলাউল হক পাণ্ডুবী (রা.) (ইন্তেকাল ৮০০ হিজরী মোতাবেক ১৩৯৭ ইং) ও তদীয় পুত্র হযরত নূর কুতুবে আলম পাণ্ডুবী (রা.) (ইন্তেকাল ৮১৩ হিজরী মোতাবেক ১৪১০ ইং), বাংলাদেশে নোয়াখালীর হযরত সৈয়দ আহমদ তন্নুবী ওরফে মীরান শাহ্ (রা.)।

মুর্শিদাবাদের হযরত শায়খ শামছুদ্দীন মোহাম্মদ হাম্বলী (রা.) (ইন্তেকাল ৭১১ হিজরী মোতাবেক ১৩১১ ইং)। বাংলাদেশে সিলেটের হযরত শাহ্ জালাল মুজাররদ ইয়ামনী (রা.) (ইন্তেকাল ৮১৫ হিজরী মোতাবেক ১৪১২ ইং), চট্টগ্রামের হযরত শাহ্ বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী ওরফে বদর শাহ্ (রা.) (ইন্তেকাল ৮৪৪ হিজরী মোতাবেক ১৪৪০ ইং), খুলনার হযরত খান জাহান আলী (রা.) (ইন্তেকাল ৮৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৪৫৭ ইং) ও ঢাকায় মীরপুর ১ নং এলাকায় হযরত সৈয়দ শাহ্ আলী বাগদাদী (রা.) (ইন্তেকাল ৯১৩ হিজরী মোতাবেক ১৫০৭ ইং)।

ভারতের মালদহের হযরত শায়খ রাজা বিয়াবানীও (রা.) (ইন্তেকাল ৭৫৪ হিজরী মোতাবেক ১৩৫২ ইং) এঁদের প্রত্যেকের মাধ্যমেই বঙ্গদেশ তথা উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

www.pathagar.com

বর্তমান যুগের পীর আউলিয়াগণ তাঁদের উত্তরসূরিরূপে খেলাফত ভিত্তিক তরিকতের দিক-নির্দেশনা প্রদান ও ইসলামের হেদায়েত কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছেন। তাই তাঁদের প্রতিও আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, আনুগত্য ও মহব্বত রাখতে হবে। কেননা তাঁদের আনুগত্যই রাসুলের আনুগত্য এবং রাসুল (সা.)-এর আনুগত্যই মহান রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য।

যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে আমরা মুসলমান হয়েছি এবং বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনের মহান শিক্ষার আলোকে ইহলৌকিক মুক্তি ও পারলৌকিক কল্যাণের সন্ধান পেয়েছি, শেষ নবীর উম্মত হতে পেরেছি অবশ্যই তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ মুহব্বত ও ভালোবাসা থাকা উচিত। আল্লামা ইকবাল তাঁদের আদর্শিক পথে চলার জন্য বারবার তাগিদ দিয়েছেন।

এ আউলিয়াকুলের মধ্যে বহু আউলিয়া আছেন যাঁদের আঙ্গুলের ইশারায় সারা বাংলা এবং ভারত জুড়ে ইসলামের সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রা.) তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তিনি হিন্দের সুলতান নামে খ্যাত। এই সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নওয়াজ (রা.) ছিলেন সুফি জগতের বাদশা। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের অগ্র সেনানী, হেদায়াতের কাণ্ডারী, মুক্তির দিশারী, রূহানী জগতের সম্রাট গরীবে নওয়াজের পিতৃ প্রদত্ত নাম মঈনুদ্দীন, খাজা তাঁর লকব এবং চিশতি তাঁর তরিকতের নাম। তিনি ১১৪২ খ্রিস্টাব্দ বা ৫৩৬ হিজরী সনে সানযার নামক (ইরান) স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম ধনী বনিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ খাজা গিয়াসুদ্দীন (রা.) একজন মহান বুজুর্গ ও কামিল অলি ছিলেন। তিনি পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই আল-হাসানী ওয়াল-হুসাইনী সৈয়দ খান্দানভুক্ত। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি একটি ফলের বাগান ও একটি গমপেষা যাঁতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। একদিন তিনি বাগানে একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় বিখ্যাত মজ্জুব ফকির ইবরাহীম কানদুযী (রা.) সেখানে উপস্থিত হন। খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তি (রা.) অত্যন্ত আদবের সাথে তাঁকে বিশ্রাম স্থানে উপবেশন করতে দিয়ে কিছু আঙ্গুর ফল খেতে দেন। মজ্জুব ফকির ফল ভক্ষণ করে নিজের ঝুড়ি থেকে কিছু শস্যের ভূষি, মতান্তরে শুষ্ক খেজুর বের করে মুখের মধ্যে চিবিয়ে সেগুলো খাজা সাহেবের মুখে পুরে দিয়ে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তি (রা.)-এর অন্তরে এক দারুণ বিপ্লব শুরু হয়। এই খাদ্য গ্রহণের দ্বারাই তিনি বেলায়াতের গুপ্তজ্ঞানের সন্ধান লাভ করেন।

এরপর তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে সকল কিছু বিলিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় রাস্তায় বের হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি সমরকন্দ ও বোখারায়

www.pathagar.com

গিয়ে কুরআন, হাদিস, তাফসীর, ফিকাহ্ ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। এরপরে তিনি ইলমে মারিফাত অর্জন করার উদ্দেশ্যে বহির্গত হন। পথিমধ্যে তিনি নিশাপুরের অন্তর্গত 'হারুন' নামক এক শহরে উপস্থিত হন। এখানে বিখ্যাত তাপস ও অলি হযরত ওসমান হারুনী (রা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বায়য়াত গ্রহণ করেন ও মুরীদ হন। বিশ বছর ধরে পীরের খেদমতে থেকে তিনি ইলমে মারিফাতের গুপ্ত রহস্য লাভ করেন এবং পীরের নির্দেশক্রমে মক্কা শরিফে হজ্জব্রত পালন শেষে মদিনা মনোয়ারায় বিশ্বনবীর যেয়ারত সম্পন্ন করে বাগদাদে রওনা হন। পথিমধ্যে তিনি সানযার শহরে অবস্থানরত হযরত শায়েখ নজমুদ্দীন কোবরা (রা.)-এর সাথে দেখা করেন। অতঃপর বাগদাদে হযরত আলী ইউসুফ হামদানী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করার পর তাবরীজ রওনা হন এবং সেখানে হযরত আবু সাঈদ তাবরীজ (রা.) নামক এক বিখ্যাত তাপসের সাথে দেখা করেন। এরপর তিনি ইস্পাহানে শায়েখ মাহমুদ ইস্পাহানী নামক বিখ্যাত দরবেশের সাথে সাক্ষাত করেন। এখানে তাঁর প্রধান খলিফা হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতীয়ার কাকী (রা.) তাঁর কাছে বায়য়াত গ্রহণ করেন। এখান থেকে তিনি খোরাসান হয়ে সাতরাবাদে হযরত নাসির (রা.) নামক একজন অলির সঙ্গ লাভ করেন। তারপর হিরাট হয়ে সব্জওয়ার উপস্থিত হন। এখানকার শাসনকর্তা ইয়াদগার মুহাম্মদ ছিলেন বেদ্বীন বদস্বভাবসম্পন্ন লোক। তিনি খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (রা.)-এর চারিত্রিক দৃঢ়তা, মাধুর্য ও অনন্যসাধারণ কেরামত (অলৌকিক কার্যাদি) দর্শনে তাঁর কাছে মুরীদ হন এবং সবকিছু ত্যাগ করে মুরশিদের নির্দেশে হেসা নামক স্থানে গমন করেন এবং সেখানে মানুষকে হিদায়াত করতে থাকেন। সব্জওয়ার হতে তিনি বলখে এসে হযরত শায়েখ আহমদ খিজরিয়া (রা.) নামক একজন বিখ্যাত সুফি ও দরবেশের সাথে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। এ সময় বলখের বিখ্যাত দার্শনিক যিয়াউদ্দিন তাঁর কাছে মুরীদ হন এবং খিলাফত লাভ করেন। এরপরে তিনি (খাজা রা.) গজনী গমন করেন এবং সুবিখ্যাত অলিয়ে কামিল শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ গজনবী (রা.)-এর সাহচর্য লাভ করেন। এভাবে তিনি কয়েকশত অলি-আল্লাহর সাহচর্যে আসার সুযোগ লাভ করেছিলেন। এ সময়েই তিনি বাগদাদে অবস্থানকালে গাউসে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রা.)-এর সাহচর্যে আসেন। গাউসে পাক (রা.) খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তির বেলায়াত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উচ্চ দরজা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তৎপ্রচারিত 'কাদিরীয়া' তরকিার কলেমা শরিফের খাস তালিম তাঁকে প্রদান করেন। এ সময় তিনি ৫৭ দিন তাঁর সোহবতে থেকে গাউসিয়াতের উচ্চ মাকাম লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শায়খে আকবর হযরত ইবনুল আরাবী (রা.)-এর সাথেও সাক্ষাতে মিলিত হন এবং পরে তিনি প্রিয়নবী

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর রজদ্বা শরীফ যিয়ারতে গেলে সরাসরি তাঁর অলৌকিক নির্দেশে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পাক-ভারত-বাংলাদেশে ইবনে কাসিম প্রথম পদার্পণ করেন এবং তার সাথে যে সমস্ত সুফি দরবেশ, পীর-ফকির আগমন করেন, তাঁরা সিন্ধু, পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার প্রসার ও বিজয়ের ক্ষেত্রে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (রা.)-এর অবদান অনস্বীকার্য।

এছাড়া উপমহাদেশের সবত্রই হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। ঠিক এমনি সময় হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (রা.) চল্লিশজন দরবেশসহ দিল্লী উপস্থিত হন। দিল্লী ও আজমীর হিন্দু রাজত্বের কেন্দ্রস্থল হলেও খাজা আজমিরি (রা.)-এর আধ্যাত্মিক শক্তি, সুমধুর বাক্য ও বিনম্র ব্যবহারে হিন্দুগণও তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতে লাগলো। কিছুদিন পর তিনি তাঁর প্রিয় খলিফা ও সুবিখ্যাত অলি হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রা.)-কে দিল্লীতে হেদায়াত কার্যের জন্য রেখে আজমীরে রওনা হয়ে যান। এ সময় আজমীরের শাসনকর্তা ছিলেন পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীরাজ ছিলেন ঘোর মুসলিম-বিরোধী হিন্দু রাজা। কাজেই এখানেও খাজা গরীব নওয়াজ (রা.)-কে নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তিনি তাঁর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠেন এবং ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আসতে সবাইকে আহ্বান জানান। প্রকৃত প্রস্তাবে, খাজা আজমিরী (রা.) প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। খাজা আজমিরী (রা.) স্বপ্নে মুহাম্মদ ঘোরীকে হিন্দুস্তান আক্রমণ করার আদেশ দান করেন। বলা বাহুল্য, কয়েকবার পরাজিত হয়ে যে মুহাম্মদ ঘোরী কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করে পালিয়েছিলেন, তিনি এবারে সামান্য যুদ্ধের দ্বারাই জয়লাভ করলেন। পৃথ্বীরাজ সদলবলে নিহত হলেন। এভাবে হযরত খাজা (রা.)-এর দোয়া ও সাহায্যে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্রের পত্তন হলো। তিনি ৩৩ হিজরী বা ১২৩৬ খৃস্টাব্দের ৬ই রজব তারিখে এই দারে ফানী থেকে জান্নাতুল ফেরদৌসের পথে যাত্রা করেন। ইন্তেকালের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি নিজ হুজরার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন। কিন্তু বহুক্ষণ যাবত তাঁর কোন সাড়াশব্দ না পাওয়ায় যখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন দেখেন যে খাজা আজমিরী (রা.) আর ইহজগতে নেই। ইন্তেকালের পর তাঁর কপালে আপনা-আপনি সোনালী হরফে লেখা হয়ে গেছে—

'হাযা হাবীবুল্লাহি মাতা ফী হুববিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর দোস্ত আল্লাহরই মহব্বতে দেহত্যাগ করেছেন।' আজমীর শরিফে তাঁর মাজার সুবিখ্যাত তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। তিনি 'আনিসুল আরওয়াহ' ও 'দিওয়ান' নামে দু'খানি মহামূল্যবার পুস্তক

www.pathagar.com

রচনা করেন। তাঁর রচিত দিওয়ান গ্রন্থ 'দিওয়ানে মঈনুদ্দীন' কে সুফিরা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিক রহস্য বলে মনে করেন।

চিশ্‌তিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (রা.)। কাদরিয়া ও চিশ্‌তিয়া-এই উভয় তরিকারই উদ্ভব ঘটেছে হযরত আলী (রা.) থেকে। হযরত আবু বরক সিদ্দিক (রা.) থেকে নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার উদ্ভব হয়েছে। হযরত ওয়াইস আল-কারানী (রা.) থেকে ওয়ায়েসিয়া তরিকার উৎপত্তি ঘটেছে। কাদরিয়া তরিকার শাজরা অনুসারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে হযরত আলী (রা.) এবং তার পুত্র হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)-এর মাধ্যমে হযরত শেখ আবদুল কাদির জিলানী (রা.) খেলাফত প্রাপ্তির সপ্তদশ খলিফা। চিশ্‌তিয়া তরিকার শাজরা মোতাবেক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে হযরত আলী ও হযরত হাসান বসরী (রা.)-এর মাধ্যমে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (রা.) খেলাফত প্রাপ্তির সপ্তদশ খলিফা। পরবর্তী সময় মুসলিম বিশ্বের চার জন প্রখ্যাত তরিকতপন্থী ইমাম ও কুতুব থেকে চারটি প্রধান তরিকার সূচনা হয়েছে। যেমন— হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রা.) থেকে তরিকা-এ কাদরিয়া, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (রা.) থেকে তরিকা-এ চিশ্‌তিয়া, হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দী (রা.) থেকে তরিকা-এ নক্‌শবন্দিয়া এবং খাজা আহমদ সিরহিন্দ মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রা.) থেকে তরিকা-এ মুজাদ্দেদিয়ার উদ্ভব ঘটেছে। এসব তরিকাগুলো সম্পূর্ণরূপে শরিয়তসম্মত এবং শরিয়তের ওপরই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে কঠোর সাধনা, মোরাকাবা, মোশাহাদা ও রিয়াজতের মাধ্যমে ইলমে মারেফত ও হাকিকত হাসিলের দ্বারা বেলায়াত জ্ঞানের সন্ধান লাভের মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চিশ্‌তিয়া তরিকার ইমাম ও কুতুব হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (রা.) ১১৪২ খ্রিস্টাব্দ বা ৫৩৬ হিজরী সনে ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলা সান্‌জারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ খাজা গিয়াস উদ্‌-দীন পুত্রের ১৪ বছর বয়সেই ইহলোক গমন করেন। তিনি পিতৃ ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)-এর বংশজাত সৈয়দ এবং আওলাদে রাসুলের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (র.) এর জন্ম ও বংশ পরিচয়

ড. মুহাম্মদ ইকবাল (র.) উর্দু সাহিত্যের এক উজ্জ্বল রত্ন। সুফিকবি ও দার্শনিক। মুসলিম জাগরণের মহান অগ্রসৈনিক। এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টে ১৮৭৭ সনের ৯ নভেম্বর মোতাবেক ৩ জিলকদ ১২৯৪ হি. সনের শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিল কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। এক সময় তারা ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়। ইকবালের বাবার নাম নূর মুহাম্মদ। মায়ের নাম ইমাম বিবি। বড় ভাই আতা মুহাম্মদ। ইকবালের পিতা বেশি শিক্ষিত না হলেও ধার্মিকতায় ছিলেন অতুলনীয়। ছোট বেলা থেকেই ইকবাল তাঁর বাবার সাথে জামা'আতে নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। এবং সুফি জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বাবার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পান। তাঁর বাবা হালাল-হারামের প্রতি খুব বেশি নজর রাখতেন এবং সাধু জীবনের আদর্শ শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে ইকবালকে প্রেরণা যোগাতেন।

শিক্ষা জীবন

ইকবালের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয়েছে ঘরেই। কুরআন পড়তেন তিনি নিয়মিত। তাঁর কণ্ঠও ছিল খুব সুমধুর। আরবী, ফার্সি ও উর্দু শিক্ষা লাভ করেন মীর হাসানের স্কুলে। মীর হাসান ইকবালের জীবনে বেশ প্রভাব ফেলেন। তিনি ১৮৮৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্ক্যাচ মিশন স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮৮ সালে তিনি প্রাইমারী স্কুল পাস করেন এবং ১৮৯১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন। তারপর ১৮৯৩ সালে এস. এস. সি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ সালে স্ক্র্যাচ মিশন কলেজ থেকে এইচ. এস. সি. পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি বি. এ (ব্যাচেলার অফ আর্টস) পড়ার জন্য শিয়ালকোর্ট ছেড়ে লাহোরে চলে যান। লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে বি.এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। বিষয় নিলেন আরবী, ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শন।

১৮৯৭ সালে বি. এ পরীক্ষায় ২য় বিভাগ অর্জন করেন। দর্শন বিষয় নিয়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন গভর্নমেন্ট কলেজে এম.এ ক্লাসে ভর্তি হন।

www.pathagar.com

পাশাপাশি আদালতে উপস্থিত হতে থাকেন। আইন পেশা তাঁর মাথায় বারবার নাড়া দিতে থাকে। তবু দর্শন পড়ার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন। ফলে আইন বিষয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন।

১৮৯৮ সালে তিনি প্রফেসর আর্নল্ড-এর সংস্পর্শে আসেন। প্রফেসর দর্শনের শিক্ষক ছিলেন। প্রফেসর তাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব বিষয়ে জ্ঞান দিতে থাকেন। তাঁরই উৎসাহে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপে যাবার চিন্তা করেন। তাঁর মাথায় আইন নিয়ে পড়ার আগ্রহ তখন আরো জোরালো হয়। ইতোমধ্যে তিনি ১৮৯৯ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এম.এ পাস করেন। এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে মেডেল প্রাপ্ত হন।

কর্মজীবন

এম.এ. পাস করার পরপরই অস্থায়ীভাবে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ওরিয়েন্টাল কলেজে শিক্ষকতার দায়িত্ব লাভ করেন। সেখানে তিনি আরবী, ইতিহাস ও অর্থনীতি পড়াতেন। এ সময়ে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সদস্য হন এবং তাতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৯০১ সালে ইকবাল ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে ৬ মাসের ছুটি নিয়ে গভর্নমেন্ট কলেজ লাহারে ইংরেজির সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন সাহিত্য আসর, বিভিন্ন কবিতা রচনা ও পড়া শুরু করেন। ফলে তাঁর কবি খ্যাতি চারদিকে ছড়াতে থাকে।

১৯০৫ সালে গভর্নমেন্ট কলেজ লাহোর থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে তিনি ইউরোপে চলে যান এবং ট্রিনিটি কলেজ ক্যামব্রীজে ভর্তি হন। ১৯০৭ সালে জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর থিসিসের বিষয়বস্তুর ইংরেজি শিরোনাম হলো–'The Development of Metaphysics in Persia- A Contribution to the History of Muslim Philosophy.'

তিনি ১৯০৮ সালে লন্ডনের লিংকন ইনস্টিটিউট থেকে বার-এট-ল ডিগ্রি অর্জন করেন। লন্ডন থাকা অবস্থায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লেকচার দিতেন।

সাহিত্য চর্চা

ইকবাল লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর বাবার বন্ধু সায়্যিদ মীর হাসান গৃহশিক্ষক হিসেবে তাকে পড়াতেন। মীর হাসান আরবী, ফার্সি, উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষায় হাজারও কবিতা মুখস্থ করেছিলেন। সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। উপযুক্ত ছাত্র পেয়ে তাকে ভালোভাবে পড়াতে থাকেন। শিখাতে থাকেন সাহিত্যের কলাকৌশল। এস.এস. সি. পরীক্ষার পূর্বেই ইকবাল কবিতা লিখতেন। এস.এস.সি পরীক্ষার পর বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠানো শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে দিল্লির 'মাহনামায়ে যবান'-এ তাঁর গজল প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

১৮৯৪ সালেই তাঁর লেখা সংশোধনের জন্য নবাব মির্যা খান দাগের কাছে কবিতা পাঠাতে থাকেন। তিনি আনন্দের সাথে তাঁর কবিতা সংশোধন করে দিতেন।

ইকবাল দেশপ্রেমের উপর কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতা 'হিমালয়', 'নয়া শিওয়ালা', 'তারানায়ে হিন্দ', 'ছদায়ে দরদ', 'হিন্দুস্তানী বাচ্চো কা কাওমী গীত' ইত্যাদি তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতার পরিচয় বহন করে।

তিনি ইউরোপে যাবার পর ৩ বছরে ২৪টি নজমও লিখেন। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁর মন-মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে যায়। এক পর্যায়ে কবিতা লেখা বন্ধ করে দেন। বন্ধুপ্রতিম স্যার আবদুল কাদীর এতে বাঁধা দিলেন এবং কবিতা রচনার জন্য তাগিদ দিলেন। শেষ পর্যন্ত আবার কলম ধরেন। এখন তাঁর কবিতার বিষয়ে স্থান করে নেয় মুসলমানদের অগ্রগতি, ঐক্য, উন্নতি ও অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের প্রেরণাদায়ী নবচেতনা।

ইকবাল ইউরোপকে কাছে থেকে দেখেন। তাদের আচরণ ও মানসিকতা থেকে উপলব্ধি করেন মুসলমান হিসেবে তাঁর কী করণীয়। ইকবাল এক চিঠিতে লিখেন, ইউরোপের আবহাওয়া আমাকে মুসলমান হিসেবে জাগিয়ে তুলেছে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও রচনা

১৯০৯ সালে ড. আল্লামা ইকবাল (র.) গভর্নমেন্ট কলেজে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে আবার নিয়োগ পান। পাশাপাশি আইন বিষয়ক জার্নালের যুগ্ম সম্পাদক হন। ১৯১০ সালে তাকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ফেলো নির্ধারণ করা হয়। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি আইন পেশা শুরু করেন। পাশাপাশি চলে তাঁর কাব্য চর্চা। ১৯১১ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে তিনি যোগ দেন। এ সময় তিনি 'শিক্ওয়া' কাব্যগ্রন্থ লিখে ব্যাপক সমালোচিত হলে বিশ্ব মুসলিম-এর চাপে ১৯১৩ সালে 'শিক্ওয়ার' উত্তরে তিনি 'জওয়াবে শিক্ওয়া' লিখেন এবং সমালোচকদের কঠোর জবাব দেন।

আল্লামা ইকবালের ঐশীজ্ঞান ও স্রষ্টাতত্ত্বমূলক রচনা সুফিজগতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ রহস্যের সন্ধানে তিনি দক্ষ ডুবুরীরূপে গুপ্তজ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি ১৯১৪ সালে ফার্সি ভাষায় লিখিত 'আসরারে খুদী' বা 'খুদী রহস্য' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ বছর তাঁর মা ও তাঁর মেয়ে মারা যায়। মায়ের শোকে তিনি এ কবিতা লিখেন। এরপর ১৯১৮ সালে ইকবালের 'রুমুযে বেখুদী' গ্রন্থ প্রকাশ হয়। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর অনেক তত্ত্বমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯১৯ সালে নিতি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের যৌথ সভায় যোগ দান করেন। তখন থেকে রাজনীতির সাথে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে তিনি পরামর্শকের ভূমিকাই পালন করেছেন বেশি। ১৯২৩ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক

www.pathagar.com

ইকবালকে 'স্যার' উপাধি দেয়া হয়। ১৯২৪ সালে তাঁর ১ম উর্দু কাব্যগ্রন্থ 'বাঙ্গে দারা' বা 'যুদ্ধ ডঙ্কা' প্রকাশিত হয়।

১৯২৬ সালে পাঞ্জাব আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তিনি জয়ী হন। ১৯৩০ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ বৈঠকে সভাপতির ভাষণে ইকবাল ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান আল্লামা ইকবালের আদর্শিক পাকিস্তান নয়। যদিও পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে ইকবালের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩১ সালে ইকবালের পিতা নূর মুহাম্মদের ইন্তেকাল হয়। ১৯৩২ সালে তাঁর ছেলে জাবিদকে উপলক্ষ্য করে লেখা ফার্সি কাব্যগ্রন্থ 'জাবিদ নামা' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্ট নাদের শাহ্ আফগানীর আহ্বানে আফগানিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য আল্লামা ইকবাল তাঁর সঙ্গী হিসেবে হযরত আল্লামা সুলাইমান নাদবীসহ্ কাবুলে গমন করেন। তিনি ১৯৩৪ সালে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভাপতি মনোনীত হন। এরপর ১৯৩৫ সালে তাঁর উর্দু কাব্যগ্রন্থ 'বালে জিবরীল' প্রকাশিত হয়। এ সময় তাঁর প্রথম স্ত্রী মনিরা বেগমের ইন্তেকাল হলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। স্ত্রীর ইন্তিকালের পর ১৯৩৬ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক 'ডি-লিট' ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

১৯৩৭ সালে পুনরায় অসুস্থতায় তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। এ বছর ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে 'লি-লিট' ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

আল্লামা ইকবাল (র.) রাজনৈতিকভাবে মুসলিম লীগ করতেন। তবে রাজনৈতিকদের মত মাঠ পর্যায়ে সফর করতেন না। তাঁর প্রদত্ত ১৯৩০ সালের মৌখিক পাকিস্তান প্রস্তাব-ই ১৯৪০ সালে এসে লাহোর প্রস্তাব আকারে চূড়ান্ত ভাবে মুসলমানদের আলাদা ভূমি প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়।

তিনি প্রতিদিন সকালে ফজরের নামাযের পর উচ্চ আওয়াজে কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করতেন এবং তাহাজ্জুদ পড়তেন। তিনি সুফিতত্ত্বে দীক্ষিত একজন আশেকে রাসুল ছিলেন। তাঁকে বিশ্ব কবি, মানবতার কবি বলা হয়। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার খারাপ দিক ও নগ্নতা বর্জন করে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। এবং সর্বদাই মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে গেছেন।

১৯৩৮ সালে ২১ এপ্রিল সকাল ৫টায় বিশ্ব মুসলিমের এ দরদী বন্ধু, উর্দু সাহিত্যের চিরভাস্বর কবি আল্লামা ইকবাল (র.) আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। লাহোরে বাদশাহী মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরই ফার্সি ও উর্দু ভাষায় লিখিত 'আরমুগানে হেজায' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

মুসলিম চিন্তা ও জাগরণের মহাকবি আল্লামা ইকবাল (র.)

ঘুমন্ত ও দিকভ্রান্ত মুসলিম জাতিকে এগিয়ে চলার প্রেরণাদায়ী ও ঈমানী চেতনায় শাণিত করার মহাসৈনিক ড. আল্লামা ইকবাল (র.)। উপমহাদেশ তথা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর রেনেসাঁর দিকপাল হিসেবে খ্যাত শতাব্দীর চিন্তাজগতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা ইকবালের অবদান মুসলিম জাতিকে আজীবন ঋণী করে রাখবে। এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও সুফিতত্ত্বের মহান সাধক পুরুষ হিসেবে সমাদৃত। উম্মতে মুহাম্মদীর একনিষ্ঠ সেবক ও আশেকে রাসুল মাশুকে এলাহীর অনুগ্রহধন্য এই মহান কবি ও সংস্কারকের জীবন ও বাণী থেকে শক্তি সঞ্চয় করে মুসলিম জাতি অতীত ঐতিহ্য, বর্তমান করণীয় ও ভবিষ্যতের আলোকিত জীবন গড়তে অনুপ্রাণিত হতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। সেই মহান প্রত্যাশা নিয়েই আমরা আল্লামা ইকবালের জীবন, দর্শন ও ঐশীজ্ঞানের সংকলনধর্মী আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থের অবতারণা করেছি।

মুসলিম জাতি তাদের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্কটময় অবস্থার মোকাবেলা করে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা সকলের। মুসলিম জাগরণের মহাকবি ড. আল্লামা ইকবাল জীবন, দর্শন ও ঐশীজ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে বেশ কয়েকটি পুস্তকে খন্ড খন্ড আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি মূলত সেসব রচনার সংকলন ও ব্যাখ্যার আলোকে রচিত। উৎসাহী ও আগ্রহী পাঠকগণ এ গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লামা ইকবাল ও তাঁর দর্শনতত্ত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে বলে আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

মহাকবি আল্লামা ইকবাল (র.) এ উপমহাদেশের এক অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কবি, দার্শনিক, সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁর অবদান চিরকালই অবিস্মরণীয়। এ অঞ্চলে তিনি প্রধানত পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে পরিচিত হলেও আজ বিশ্বের সর্বত্র তাঁর প্রতিভার ও অবদানের স্বীকৃতি মুখরিত হচ্ছে। ইসলামী জীবন দর্শন, বিশ্বনবীর আদর্শ ও প্রত্যয়ের মধ্যে বিভিন্নকালে বিভিন্নভাবে নানা মতবাদ প্রবেশ করে প্রকৃত ইসলাম থেকে মুসলমান জাতিকে

www.pathagar.com

দূরে সরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিস্পেষিত করেছিল স্বার্থান্বেষী চক্র। আল্লামা ইকবাল যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক মুসলমান জাতিকে প্রকৃত ইসলামের সেবক হয়ে বিশ্বনবীর অনুসরণীয় পথে চলার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ইমাম গাজ্জালীর অনুরূপ। তবে ইসলামের ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন–তাও অভিনব দার্শনিক মতবাদে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশ্ব জগতে তাঁকে একটি শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছে। এ বিশ্বচরাচরের সর্বত্র তিনি গতিশীল জীবনের সন্ধান পেয়েছেন এবং আল্লাহ্কেও তিনি চরম এক সৃষ্টিশীল সত্তা বলে লাভ করেছেন। তাঁর অবদানের অপর শ্রেষ্ঠতম বিষয় হচ্ছে 'খুদীতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞান রহস্য' যা তাঁকে মুসলিম চিন্তাজগতে উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। মানব সাধারণকে তিনি আল্লাহ্র চরম ও পরমতত্ত্বের সন্ধান দিয়ে বিশ্বনবীর আদর্শ ও মহব্বতকে বিকাশের ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ্ব মুসলিম জাতির পশ্চাৎপদ মানসিকতা, অধঃপতনের বিষয় এবং নানা দলমতের কারণে নিজেদের ক্ষতিকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আল্লামা ইকবাল কুরআন ও বিশ্বনবীর আদর্শকে সঠিকভাবে গ্রহণ করার জন্য এ জাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান করেছেন।

মুসলিম জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নবজাগরণের লক্ষ্যে আল্লামা ইকবাল নানা পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর সকল মতবাদই কাব্য ও দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি সুফিতত্ত্বের মাধ্যমে ইসলামের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ও পরমজ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেছেন। তাঁর এসব ধারণা মুসলিম জাতিকে জাগতিক, আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার দ্বারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে ধন্য হওয়ার প্রেরণা দান করতে সক্ষম হয়েছে। কর্মবাদ ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণাদানে আল্লামা ইকবাল সম্পূর্ণ অভিনব ও যুগোপযোগী ধারণার অবতারণা করেছেন। তবে তিনি সুফি কাব্য ও দর্শনে আল্লাহ্র প্রতি নিজ মনের অভিমানবশত যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তা মুসলিম বিশ্বকে অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে আলোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছিল।

আল্লাহ্র প্রতি ইকবালের অভিযোগ

ড. আল্লামা ইকবাল (র.) 'শিক্ওয়া' অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র প্রতি অভিযোগের সুরে নিজের মনের খেদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মনের খেদ হলো এক মুসলমানের নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ রেখে। আল্লাহ্র সমস্ত নেয়ামতের উত্তরাধীকারিত্ব লাভের দ্বারা যে মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ 'জগতের সেরা' হওয়ার গৌরব অর্জনের অধিকারী অথচ সেই মানুষই আবার তাঁর

www.pathagar.com

নেয়ামতের শ্রেষ্ঠ শোকরগুজারী করার পরও আল্লাহ্পাক কর্মনীতির চক্রে উন্নতির চাকাকে সচল রেখেছেন। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে বেহিসেবে দিতে পারতেন এর জন্য কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তো নিরপেক্ষ, তিনি সকল ধর্মের সকল জাতির সকল গোত্রের উন্নতি নিজ নিজ কর্মের উপর নির্ধারিত করে রেখেছেন। তাই কেউ যদি মুসলিম হয়ে বা শ্রেষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী হয়ে অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের কথা ভেবে কর্তব্যকর্ম ছেড়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে তবে আল্লাহ্ তার কোনো উন্নতি করবেন না। সে যতই আল্লাহ্র শোকরগুজারী বান্দা হোক না কেন তাঁকে পার্থিব উন্নতির জন্য অবশ্যই কাজ করতে হবে। আল্লাহ্র শোকরগুজারের ফল আল্লাহ্ দিবেন কিন্তু কর্মহীন অলসতার কোনো উন্নতির দায় তিনি কাঁধে নিবেন না। আজ সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হলো তারা অলস ও অকর্মণ্য জাতির তকমা কাঁধে নিয়ে কাজ না করে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বসে আছে। অথচ আল্লাহ্পাক অলস জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই আল্লামা ইকবাল বলছেন,

এক.

কিউ যিয়াঁ কার বনোঁ সূদে ফরামূশ রাঁহো?
ফিকরে ফরদা না করো, মাহবে গমে দোশ রাহোঁ ॥

নালে বুল বুল কে সুঁনো আওর হামাতন গূশ রাহোঁ?
হামনাওয়া! ম্যায়ঁ ভী কোঈ গুল হোঁ কেহ খামূশ রাঁহো ॥

জুরয়াত আমূয মেরী তাবে সখুন হায় মুঝ কো
শিক্‌ওয়া আল্লাহ সে, খাকম বদেহান হায় মুঝকো ॥

অর্থাৎ :

১. নিজ উন্নতি ছেড়ে ইচ্ছাকৃত ক্ষতির পথে আমি চলব কেন? ভবিষ্যতের চিন্তা ফিকির ছেড়ে দিয়ে অতীত ক্ষতির উপর আফসোস ও কান্নাকাটি করবো কেন?

২. আশ্চর্য হয়ে বুলবুলদের বিলাপ শুনব কেন? আমি তো আর ফুলের মত নই নীরব, চিন্তাহীন বসে থাকবো কেন?

৩. আমার কণ্ঠে অপার নির্ভীক শক্তি আছে, তাই মাটির মুখে খোদার শিক্‌ওয়া করছি, আমার মুখে ছাই পড়ুক।

www.pathagar.com

উপলব্ধি

নিজের উন্নতির জন্য কাজকর্ম ও কঠোর শ্রমের মনোভাব ত্যাগ করে বসে থাকলে চলবে না। আজ বিশ্বের সমস্ত জাতিগুলো কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করে উন্নতির চরম শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অথচ মুসলমানরা নিজেদের ভুলে উন্নয়নের সমস্ত অগ্রযাত্রা থেকে বঞ্চিত। এই দুঃখ ইকবালের কবি মনে বার বার দোলা দিয়ে যায় তাই তিনি প্রথমে বললেন, আমি কত কাল এভাবে নীরবে বসে আমার বরবাদীর (তামাশা) অবস্থা দেখতে থাকব আর কত কাল আমার ভবিষ্যত থেকে গাফেল থাকব? যেহেতু আমার বাকশক্তি আছে, তাহলে আমার পেরেশানীর দাস্তান (রিপোর্ট) খোদাকে শুনাব না কেন? আর কাজই বা করব না কেন? নিশ্চয় তিনি আমার অভিযোগ শুনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন।

দুই .

হায় বজা শেওয়ায়ে তাসলীম মেঁ মাশহুর হাঁয় হাম
কিস্‌সায়ে দরদ সূনাতে হ্যাঁয় কেহ্ মাজবূর হাঁয় হাম ॥

সাযে খামূশ হাঁয়, ফরইয়াদ সে মামূর হাঁয় হাম
নালা আতা হাঁয় আগার লব পে, তূ মাজুর হাঁয় হাম ॥

এ্যয় খোদা! শিক্‌ওয়ায়ে আরবারে ওফা ভী সুনলে
খোগরে হামদ সে খোড়াসা গিলাভী সুনলে ॥

অর্থাৎ :

১. পৃথিবীতে সভ্য, শিষ্ট, ভদ্র বলে আমরা (মুসলমান) যদিও পরিচিত কিন্তু সীমাহীন কষ্টের কারণে বাধ্য হয়ে দুঃখের কাহিনী শুনাচ্ছি।

২. যদি বীণা নীরব থাকে, তবুও কষ্ট ও বেদনার সুরে বুক স্ফীত হচ্ছে, তাই যদি তোমার দরবারে কিছু কষ্টের কাহিনী বর্ণনা করি, আমাকে অপারগ মনে করে ক্ষমা করে দিও।

৩. হে প্রভু! তোমার কমজোর বান্দা যারা সব সময় তোমার গুণ গেয়ে আসছে, আজ তাদের একটু (শিক্‌ওয়া) অভিযোগও শুনে নাও।

উপলব্ধি

হে প্রভু! এটা সত্য যে সর্ব অবস্থায় তোমার উপর সন্তুষ্টি থাকাই একজন মুসলমানের আদর্শ ছিল। কিন্তু আমার হৃদয়ে এতো কঠিন দুঃখ যা আমি

www.pathagar.com

বরদাস্ত করতে পারছি না, এজন্য তোমার দরবারে কষ্ট ও দুঃখের কাহিনি বর্ণনা করছি। তুমি আমাকে অপারগ মনে করে ক্ষমা করে দিও, আর তোমার এ অক্ষম আয়েজ বান্দা, যে সব সময় তোমার হামদ ও গুণ গায়; তো এখন তার থেকে কিছু শিকায়েত ও অভিযোগও শোন।

তিন .

থী যূ মাওযূদ আযল থী সে তেরী জাতে কাদীম
ফূল থা যীবে চমন পর না পারীশাঁ থী শামীম ॥

শরতে ইনসাফ হায় এ্যয় সাহেবে আলতাফে আমীম
বোয়ে গুল ফায়লতী কিস তরাহ জূ হোতী না নাসীম ॥

হাম কো জমইয়্যাতে খাতের ইয়ে পারীশানী থী
অরণা উম্মত তেরে মাহবুব (সা.) কী দেওয়ানী থী ॥

অর্থাৎ :

১. হে প্রভু তুমি তো রোযে আযল তথা অনাদিকাল হতে এই ত্রিভূবনে সর্বদাই আছ। কেউ যখন ফুলের সুবাস চিনত না; বরং তখন বাগানে ফুলও ছিল না।

২. ইনসাফের সাথে বলতে গেলে বলতে হবে যে ব্যাপক মেহেরবানীর আধার! ভোরের মৃদু সমীরণ না হলে মানুষ প্রকৃত ফুলের ঘ্রাণ ও সুবাসও পেতো না।

৩. এসবই করেছি তোমার সন্তুষ্টির জন্য, নতুবা তোমার মাহবুবের উম্মত কি পাগল ও দেওয়ানা ছিল?

উপলব্ধি

এটা সত্য যে তুমি অনাদি-অনন্ত কিন্তু এক সময় এ বিশ্বজগত বলতে কিছুই ছিল না। পৃথিবীতে মানুষের আগমন হয় নাই। গাছে গাছে ফুল-ফলের সৌরভ ছড়ায়নি। তখন তুমি মাউযুদ ছিলে কিন্তু তোমার স্রষ্টা সিফাত প্রকাশ পায় নাই। তুমি গুপ্ত ধনভাণ্ডারে বিরাজ করছিলে। এখন সৃষ্টিজগত অস্তিত্বে আসার পর দুনিয়াবাসীকে যদি মুসলমানরা তা না জানাতো তাহলে তোমার এ সিফাত এর ইলম দুনিয়ার মানুষ কীভাবে জানতো? মুসলমানরাই তো দুনিয়াবাসীকে

www.pathagar.com

তোমার নাম ও সিফাত এর ব্যাপারে অবহিত করেছে। আমরা পুরো বিশ্বে তোমার নাম উঁচু করেছি আর আমরা যা কিছু করেছি তা তোমার সন্তুষ্টি কামনায়ই করেছি, নতুবা তোমার মাহবুব (সা.)-এর উম্মত কি পাগল ও দেওয়ানা ছিল যে, অকারণে পুরো বিশ্বকে নিজেদের দুশমন বানাবে। কেননা তৌহিদে ইসলাম বাস্তবে পুরো বিশ্বের অন্যায়-অবিচার ও কুফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই নামান্তর। আত্মসমর্পণকারী বান্দার পবিত্র অন্তর ও শোকরগুজারীর কারণেই আজ তুমি বিশ্বের মহান প্রতিপালকের আসনে সমাসীন। তোমার প্রিয় মাহবুব নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ, প্রেম, মহব্বত হৃদয়ে লালন করেই তো আজ মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য যখন মুসলমান ইসলামের কেতন উড্ডয়ন করলো পুরো দুনিয়া মুসলমানের দুশমন হয়ে গেল। আজ মুসলমানরাই নিজেদের অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা, অন্ধত্ব ও কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নিমজ্জিত। এর থেকে উত্তরণ ঘটাতে চাইলে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনের যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে।

আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানকে আলোকিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সৃষ্টির প্রথম দিবস হতে প্রভাতের মৃদু সমীরণ প্রকাশের সাথে সাথে মুসলমানরাই আল্লাহর নামের মহিমা ও অপার করুণার গুনগান করে আসছে। একমাত্র খোদাই চিরস্থায়ী সত্তা বাকী সবকিছুই ধ্বংসশীল। আল্লাহ্ ব্যাপক রহমত ও করুণার আধার। যদি আত্মসমর্পণকারী মুসলমান না হতো তবে কে আছে আল্লাহ্র সিফাতের সর্বশ্রেষ্ঠ চর্চায় আত্মনিয়োজিত থাকে? অর্থাৎ মুসলমানরা আজ তোমার নামকে দুনিয়াতে প্রচার করতে গিয়ে যে পেরেশানীতে পড়তে হয়েছে কিন্তু এই পেরেশানী তোমার জন্যই ছিল।

চার.

হাম সে পহলে থা আজব তেরে জাঁহা কা মানযার
কাহী মাসজুদ থে পাতথর কাহী মাবূদ শাজার ৷৷

খোগরে পায়কারে মাহসূস থী ইনসাঁ কী নযর
মানতা ফের কোই আন দেখে খোদা কো কিঁউ কর ৷৷

তুঝ তো মালূম হায় নে তা থা কোই নাম তেরা?
কুওয়াতে বাযুয়ে মুসলিম নে কিয়া কাম তেরা ৷৷

www.pathagar.com

অর্থাৎ :

১. আমাদের পূর্বে পৃথিবীর দৃশ্য ছিল বড়ই আজব। কেউ করতো পাথর পূজা আর কেউ করতো বৃক্ষ পূজা।

২. মানুষের দৃষ্টি অনুভবযোগ্য বস্তুতে কেবল অভ্যস্ত ছিল। অদৃশ্য, আকার বিহীন খোদার কথা কে মানতো?

৩. এই ভূখন্ডে তোমার কেউ নামও নিত না যা তুমিও জান, মুসলমানের প্রত্যক্ষ শক্তি তোমার পক্ষে কাজ করেছে।

উপলব্ধি

এখন কবি তাঁর দাবির স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন। বলছেন, 'হে প্রভু! ইসলামের পূর্বে তোমার বান্দাদের অবস্থা এমন ছিল যে পাথর ও বৃক্ষকে খোদা মনে করত। মানুষ নিজ হাতে বানানো মূর্তিকে খোদারূপে পূজায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এজন্য তারা অদৃশ্য, নিরাকার তোমাকে না দেখতে পারায় মাবুদ ও খোদা বলে মেনে নেয়নি। তুমি ভাল ভাবে জান, আমাদের পূর্বে চীন থেকে মরক্কো পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তোমার নামও নিচ্ছিল না। মুসলমানেরা তাদের জানকে বিপদে ফেলে তোমার নামকে পৃথিবীতে উঁচু করেছে। বনী আদমকে তৌহিদ সম্পর্কে অবহিত করেছে। কিন্তু তারপরও তুমি মুসলমানদের থেকে উপর কঠোর পরীক্ষার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ। তোমার অপার করুণাধারা বর্ষণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধনসম্পদে মুসলমানদের কেন পরিপূর্ণ করে দিচ্ছ না? কেন বিশ্বব্যাপি মুসলমানদের বিজয় কেতন পূর্বের ন্যায় উড়াতে সাহায্য করছ না? নাকি মুসলমানরাই আজ নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অধঃপতনের শেষপর্যায়ে নেমে গেছে। তোমার অসীম দয়ার ভাণ্ডার থেকে কেন অবিরত ধারায় রহমত বর্ষিত হয় না। তাহলে কেন ফিলিস্তিন, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া, মিশর, পাকিস্তান, আলজিরিয়া, জর্ডান ও পৃথিবীর সর্বত্রই মুসলিম নিধনযজ্ঞের মহড়া বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অজুহাতকারীদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে তুমি তো সবকিছু জানো, দেখো তবুও কি তুমি নীরবে মুসলমানদের ধ্বংসের পরিণতি দেখে যাবে? তুমি আর কতো পরীক্ষা করবে? আমাদের এতো ধৈর্য নেই যে আমরা আজীবন নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবো? তুমি আমাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দাও। আমাদের ভুল ও অক্ষমতাকে ক্ষমা করে সক্ষম করে দাও। আমরা আর পরীক্ষা দিতে চাই না? সেই বাবা আদম (আ.) থেকে আমাদের পরীক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে। এবার তোমার রহমতের ছায়াতলে আমাদের ঠাঁই করে দাও।

www.pathagar.com

পাঁচ.

বস রাহে থে এহী সেলজুক ভী তুরানী ভী
আহ্‌লে চীন চী মে, ইরান মে সাসানী ভী ॥

ইসী মামূরে মে আবাদ থে ইউনান ভী
ইসী দুনিয়া মেঁ ইয়াহূদী ভী থে নাছরানী ভী ॥

পর'তেরে নাম পে তলওয়ার উঠায়ী কিসনে?
বাত জূ বিগড়ী হোই থী, ওহ্ বানায়ী কিসনে ॥

অর্থাৎ :

১. এই পৃথিবীতে আমরা ছাড়া আরো বহু জাতির আবাদ ছিল। তুরস্কে সালজুকি, তুরানী, ইরানে সাসানী ও চীনে চীনের অধিবাসীর আবাদ ছিল।

২. ইউরোপে গ্রীক জাতি, ইহুদী, খ্রিস্টান এছাড়াও বহু শত জতি বসবাস করতো।

৩. কিন্তু এ সকল জাতির মধ্যে কি কোন জাতি কখনও তোমার জন্য তলোয়ার ধরেছে? কেউ কি শিরিক, কুফরের ভুলে ভরা কথাকে সঠিক ও নির্ভুল করেছে?

উপলব্ধি

হে প্রভু! কে তোমার মহানুভবতার জয়গান গেয়ে তৌহিদের বাণী নিয়ে পূর্ব হতে পশ্চিম, উত্তর হতে দক্ষিণ সমগ্র পৃথিবীকে প্রশংসার ক্ষেত্র বানিয়েছে। এই মুসলিম! বিশ্বনবীর আদর্শের পথযাত্রীরা তোমার নামের নিশান উড়িয়েছে সর্বত্রই। আল্লামা ইকবাল বলেন, আমাদের পূর্বে পৃথিবীতে শত শত কওমের আবাদ ছিল। তুরস্কের প্রসিদ্ধ সালজুকী কওম, ইরানী, চীনা, ইহুদী, খৃস্টান, অগ্নিপূজক কিন্তু এদের মধ্যে কেউ তো তোমার নামকে উঁচু করার জন্য নিজ জানকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়নি; তোমার প্রিয় মাহবুব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর আদর্শ পথের অনুসারী মুসলমনেরাই তৌহিদকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছে। তোমার নামকে উচ্চতার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগানের জন্য নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদকে উৎসর্গ করেছে। তুমি সবকিছু জানো, দেখো। যখন হযরত মুসা (আ.)-এর উম্মতকে জিহাদ ও

www.pathagar.com

কিতাল করতে বলা হয়েছে তখন তারা উত্তর দিয়েছিলো এই বলে যা তুমি কুরআনে উল্লেখ করেছ, 'তুমি আর তোমার রব যুদ্ধে যাও আমরা এখানে বসে থাকলাম।' এভাবেই হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীরা তাদের নবীর সাথে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেনি। অথচ এর বিপরীতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবা কেরামগণ সর্বদাই রাসূলে আকরামের সাথী ছিলেন এবং তারা নবীর জন্য ও যুদ্ধের জন্য নিজেদের জান কুরবান করতে সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন যাতে আল্লাহর তৌহিদী দীনের বাণী সর্বত্রই ছড়িয়ে দেয়া যায়। বিশ্বনবীর মিশন এভাবেই সফল হয়েছে। তোমার দীনের প্রচার সর্বত্রই পৌঁছে গেছে।

টীকা ও শব্দার্থ

সালজুকি : তুরস্কের প্রসিদ্ধ এক গোত্রের বা বংশের নাম। (সালজুক-এর প্রতিষ্ঠাতা সালজুকের নামেই এ বংশের পরিচিতি।) এ বংশ দীর্ঘ দিন তুরস্কের রাজত্ব করে।

তুরানী : তুরস্কের বাসিন্দাদের উপাধী।

সাসানী : ইরান শাসনকরী প্রাচীন এক খান্দান।

মামূরে : বসতী, দুনিয়া।

নাছরানী : ঈসায়ী (খ্রিস্টান)।

ছয়.

থে হামেঁ এক তেরে মারেকাহ্ আরাউঁ মেঁ!
খুশকিউ মেঁ কভী লড়তে, কভী দরইয়াউ মেঁ ॥

দী আজানেঁ কভী ইউরোপে কে কলীসাউঁ মেঁ
কভী আফ্রিকা কে তাপতে হুয়ে সহরাউঁ মেঁ ॥

শানে আখুঁ মেঁ না জাচতী থী জাহান দারূঁ কী
কালেমা পড়হ্তে থে হাম ছাউঁ মেঁ তলওয়ারূঁ কী ॥

অর্থাৎ :

১. তোমার কালিমা উঁচু করার জন্য শুধু আমরা যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছি, আর আমরা যুদ্ধ করেছি কখনো পৃথিবীর জলে আর কখনো স্থলে।

২. আর আমরা কখনো আযান দিয়েছি ইউরোপের গির্জা ঘরে, আর কখনো আযান দিয়েছি আফ্রিকার তপ্ত মরুভূমিতে।

www.pathagar.com

৩. বিশ্বের রাজা মহারাজা কাউকে কখনো ভয় করিনি। আমরা কালিমা তৈয়্যেবা পাঠ করেছি তলোয়ার ছায়া তলে।

আত্মোপলব্ধি

হে প্রভু! শুধু মুসলমানরাই ছিল যারা তোমার মহিমা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুরো বিশ্বের সাথে লড়াই করেছিল। স্থলেও লড়াই করেছে, জলেও লড়াই করেছে। কখনো ইউরোপের সাথে লড়াই করেছে, আর কখনো আফ্রিকার সাথে যুদ্ধ করেছে। আমরা পৃথিবীর বড় বড় রাজা আর বাদশাহর সাথে যুদ্ধ করেছি এবং তাদেরকে পরাজিত করে তৌহিদের কেতন উড্ডীন করেছি। অল্প সময়ের মধ্যে ইরান ও রূমের মত মজবুত রাষ্ট্রকে ইসলামী হুকুমতের আয়ত্তে নিয়ে আসা হয়েছে।

সাত .

হাম জু জীতে থে, জঙ্গুঁ কী মসীবত কে লিয়ে
আওর মরতে থে তেরে নাম কী আজমত কে লিয়ে ॥

থী না কুছ তেগযনী আপনী হুকুমত কে লিয়ে?
সার বকক ফেরতে থে কিয়া দাহর মেঁ দৌলত কে লিয়ে ॥

কাওম আপনী জু যর ও মালে জাঁহা পর মরতী?
বুত ফুরূশী কে এওয়াজ বুত শেকনী কিঁউ করতী ॥

অর্থাৎ :

১. আমরা জীবিত থাকতাম তোমার পথে জিহাদ করার জন্য, আর আমরা মরতাম তোমার কালিমা উঁচু করার জন্য।

২. আমরা কখনো হুকুমত ও মাল-দৌলতের জন্য জিহাদ করিনি। আমাদের প্রাণ নিয়ে যে খেলা ছিল যুদ্ধের ময়দানে তা কি ধন দৌলতের লোভে ছিল?

৩. মুসলিম বীর মুজাহিদ যদি সম্পদ লাভের আশায় নিজের জানকে উৎসর্গ করতো, তাহলে মূর্তির ব্যবসা না করে মূর্তি ভাঙ্গার কাজ করত কেন?

সহজ ব্যাখ্যা

আমরা মুসলিম জাতি যদি এই পৃথিবীতে যদি জীবিত থাকি তবে তোমার রাস্তায় জিহাদ করার জন্য, আর মরতে রাজি থাকি তাও এই দুনিয়াতে তোমার নামের

www.pathagar.com

ঝান্ডা উঁচু করার জন্য। আমরা কখনো মাল ও দৌলত অথবা হুকুমতের জন্য জিহাদ করিনি। আমরা তোমার আনুগত্য ও রাসুলের আনুগত্য করার জন্য এবং তোমার প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য এসব করেছি। যদি মুসলমান মাল ও দৌলতের আশা করতো তাহলে মূর্তি ভাঙ্গার স্থলে, তারা মূর্তি ব্যবসায়ী হতে পারতো। আর তা দুনিয়ার জন্য কতটা নিরাপদ ছিল তুমি তো ভালো করেই জানো। ইতিহাস সাক্ষী মাহমুদ গজনবী (র.) মূর্তি ভেঙ্গেছেন, মূর্তি বিক্রি করেননি। অর্থ লোভীরা সর্বদা মূর্তির ব্যবসা করেছে, আর মুজাহিদরা মূর্তি ধ্বংস করেছে। এসব শুধুমাত্র তোমার তৌহিদের বাণীকে সর্বত্রই প্রচার করার জন্য।

টীকা :

মাহমুদ গজনবী (র.) : তিনি ভারত বিজয়ের পর মূর্তি পূজারীদেরকে বলেছিলেন, 'আমি ইতিহাসে মূর্তি ব্যাপারী হতে চাই না।' তিনি এ কথা বলেছিলেন যখন পূজারীরা ভারতের সোমনাথ মন্দির না ভাঙ্গার উপর বড় অংকের অর্থ দেওয়ার কথা বলেছিল।

আট.

টল না সেকতে থে, আগার জঙ্গ মেঁ আড় জাতে থে
পাউঁ শেরূঁ কে ভী ময়দাঁ সে উখাড় জাতে থে ॥

তুঝ সে সারকাশ হুয়া কোই তু বিগাড় জাতে থে
তেগ কিয়া চীজ হায়? হাম তোপ সে লড় জাতে থে ॥

নকশ তাঁরহীদ কা হার দিল পে বঠায়া হামনে
যেরে খানজার ভী ইয়ে পয়গাম সুনায়া হামনে ॥

অর্থাৎ :

১. আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অটল হয়ে থাকতাম কেউ আমাদের নড়াতে পারতো না, আর তখন সিংহদলও ভীত হয়ে পালাতে বাধ্য হতো।

২. তোমার থেকে কেহ মুখ ফিরালে অর্থাৎ অবাধ্য হলে আমরা (মুসলিম) সবাই মিলে কিভাবে তাদের দমন করেছি। তরবারী কি জিনিস, আমরা তো কামানের গোলাকেও কখনো ভয় করিনি।

৩. আমরা মানুষের হৃদয়ে তৌহিদের চিত্র এঁকে দিয়েছি, খঞ্জরের (তরবারী) নীচে দাঁড়িয়ে থেকেও নির্ভয়ে তৌহিদের বাণী শুনিয়েছি।

www.pathagar.com

সরল ব্যাখ্যা :

আমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে মাথায় কাফন বেঁধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তাম তখন পৃথিবীর এমন কোন শক্তি ছিল না যে আমাদেরকে পরাজিত করবে অথবা প্রভাবিত করবে। ইতিহাস সাক্ষী, মুতার যুদ্ধে শুধু তিন হাজার সাহাবী (রা.) এক লক্ষ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছেন। আমরা ঐ সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে থাকতাম যারা তোমার একত্ববাদ অস্বীকার করতো। তোপের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা তৌহিদের বাণী বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছি। আমাদের সমস্ত সৈর্য-বীর্য, ত্যাগ ও প্রেমের পেছনে তোমার প্রিয় মাহবুব নবীর আদর্শের বাস্তবায়ন রয়েছে। আমরা বিশ্বনবীর আদর্শ ও প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমার তৌহিদের বাণী কুরআনের নির্দেশিত পথে নিজেদের পরিচালিত করার জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছি। আমরা তোমার দীন কায়েমের পথে বিশ্বনবীর উম্মত হিসেবে সফল হয়েছি। বিশ্বনবী আমাদের মত উম্মত বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীনদের পেয়ে আরও বেশি সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হয়েছেন। যদিও তোমার মাহবুব নবী নিজ গুণে ও কর্মে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তবুও আমরা উম্মত হিসেবেও তাঁর উপযুক্ত অনুসরণকারী হতে পেরেছি বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

নয়.

তুহী কাহদে কে উখাড়া দরে খায়বার কিসনে?
শহরে কায়সার কা জুথা, উস কো কিয়া সার কিসনে ॥

তোড়ে মাখলুকে খোদা ওয়ান্দো কে পায়কার কিসনে?
কাট কর রাখ দিয়ে কুফফার কে লশকর কিসনে ॥

কিসনে ঠান্ডা কিয়া আতেশ কাদায়ে ইরাঁ কো?
কিসনে ফের যিন্দা কিয়া তাযকেরায়ে ইয়াযদাঁ কো ॥

অর্থাৎ :

১. তুমিই বল কে উপড়ে ফেলেছিল খায়বরের দরজা? আর কায়সারের শহর ধ্বংস করেছিল কে?

২. মানুষের হাতের তৈরি মিথ্যা খোদার মূর্তিগুলো কে ভেঙ্গে ছিল? কাফেরদের সৈন্যকে বরবাদ ও ধ্বংস কে করেছিল?

www.pathagar.com

৩. শত বৎসর ধরে প্রজ্বলিত ইরানের অগ্নিকুন্ডকে নির্বাপিত করেছে কে? আল্লাহর স্মরণকে পুনরায় জীবিত করেছে কে?

সরল ব্যাখ্যা :

হে মহান প্রভু! তুমি তো সবই জানো, মুসলমানদের কৃতিত্বের খবর তোমার চেয়ে কে বেশি জানবে? যারা ইহুদীদের সুরক্ষিত দুর্গকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তোমার মনোনীত দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবন বাজি রেখেছিল, একের পর এক বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে গিয়েছিল, খায়বরের কামুছ দুর্গের বিশাল ফটক উপড়ে ফেলেছিল তারা মুসলমানই ছিল। হযরত আলীর বীরত্বে সেদিন খায়বর ভূমি তোমার তৌহিদের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। মূর্তি পূজারীর মন্দিরের এক একটি ইট তারা ধ্বংস করে ফেলেছে এবং দুশমনের সৈন্যদের তারা পরাভূত করেছে। ইরানের শত বৎসরের অগ্নিকুন্ড নিভিয়ে দিয়েছে এবং তোমার নামকে উঁচু করেছে। এই মুসলমানরাই তোমার নামের মহিমাকে সর্বত্রই ছড়িয়ে দিয়েছে।

ঘটনাপ্রবাহ : খায়বরে হযরত আলী (রা.)-এর বীরত্ব

ইহুদিগণ মদিনা হতে বহিষ্কার হয়ে ২০০ মাইল দূরে খায়বর নামক স্থানে বিশাল দুর্গ স্থাপন করেন। তারা জঙ্গলে কেল্লা নির্মাণ করে লোকজন সংগ্রহ করতে থাকে এবং মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য নানা প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচুর অর্থদানে এবং খয়বর অঞ্চলের অর্ধেক ফসল প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে প্রতিবেশী গোত্রকে ঐ অঙ্গীকারবদ্ধ করেন। তারা মদিনার অদূরে জুকারাদ নামক চারণভূমি হতে একজন মুসলমান রাখালকে বধ করে তার স্ত্রী ও নবীর পশুগুলিকে লুটপাট করে নিয়ে যায়। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রবীণ ভক্ত কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়া নামক সাহাবীকে পাঠিয়ে শান্তিচুক্তির আহ্বান জানায়। কিন্তু মদিনার মুনাফেক দলের প্ররোচনায় শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহুদিগণের চক্রান্তের বিষয় নিশ্চিত হলে দক্ষ নবী অনতি বিলম্বে ১৪০০ পদাতিক ও ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং সেবা শুশ্রূষার জন্য ২০ জন ধাত্রী নার্স নবীর সঙ্গে নিয়ে খায়বর অভিমুখে যাত্রা করেন। নবীর স্ত্রী উম্মে ছালমাও খয়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। খাদ্য-খাবার ছিল মাত্র ছাতু। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মুসলিম বাহিনী শোকাতুর সাহাবাগণ শতাধিক অগ্নিকুণ্ড জ্বালালেন। নবী প্রবর সন্ধির প্রস্তাব দিলে ইহুদিরা তা প্রত্যাখ্যান করল। তখন তিনি যুদ্ধের আদেশ প্রদান করেন। মুসলিম বীর নায়েম যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। অনন্তর মুসলিম বাহিনী বীর বিক্রমে জেহাদ শুরু করলে কয়েকটা দুর্গ দখল করা হয়। কিন্তু কামুস দুর্গ হস্তগত অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইহুদি বীর যোদ্ধা

www.pathagar.com

মারহাবের আঘাতে মুসলিম বীর আমের ইবনে আকু ইন্তেকাল করেন। কামুস দুর্গ আক্রমণে প্রথম দিন হযরত আবু বকর (রা.) দায়িত্ব পেয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় দিনে হযরত ওমর (রা.) সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু দুই দিনে তারা মরণপণ যুদ্ধ করেও দুর্গের পতন ঘটাতে ব্যর্থ হন। তৃতীয় দিবসে ইসলামের জয় পতাকা প্রদান করা হয় শেরে খোদা মাওলা আলীর হস্তে। হযরত আলী (রা.) বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে কামুস দুর্গ জয় করেন। তিনি তাঁর হায়দারী হাঁকে কামুস দুর্গের বিশাল লৌহকপাট ভেঙ্গে যুদ্ধের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আলীর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রাসুলুল্লাহ (রা.) তাকে আসাদুল্লাহ বা 'খোদার সিংহ' খেতাবে ভূষিত করেন এবং নবীর তরবারি জুলফিকার বীর আলীকে প্রদান করা হয়। দুষমনদের তীর, বর্শা, বল্লম ও অন্যসব আক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য মাওলা আলী (রা.) কামুস দুর্গের একটা বিশাল পাল্লা ব্যবহার করেছিলেন। দুর্ধর্ষ বীর মারহাব নিহত হলে দ্বিতীয় বীর মল্ল যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু জুবায়ের নামক মুসলিম সেনা তাকে যমের হাতে অর্পণ করেন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে খায়বার যুদ্ধে ৯৩ জন ইহুদি এবং ১৫ জন মুসলমান মহাযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ ইহুদিদেরকে সম্পূর্ণ খতম না করে শান্তিচুক্তি স্থাপন করেন। এই যুদ্ধে প্রচুর মালে গণিমত ও ইহুদি রমণী বন্দি হয়। তন্মধ্যে ইহুদি নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা এবং ইহুদি দলের তরুণ সর্দার কানানার বিধবা স্ত্রী সাফিয়া ছিলেন অন্যতম। যুদ্ধ বন্দিনী হিসেবে সাফিয়া হযরত দাহিয়া কালবীর সন্নিকটে অর্পিত হন। সাফিয়ার দাসী জীবন ছিল অবমাননাকর। তাই রাসুলুল্লাহ (রা.) তাকে স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করেন। কামুস দুর্গ হতে ইহুদিগণের ১০০টা বর্ম ৪০০ তরবারি ১০০ বর্শা ৫০০ ধনুক ও বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী মালে গণিমত হিসেবে প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধ জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন মাওলা আলী (রা.)। এ জয় মুসলমানদের জন্য পরবর্তী সময়ে ইসলামের ভিত্তিকে দৃঢ় ও মজবুত করতে সাহায্য করে।

দশ.

কোন সী কাওম ফাকাত তেরী তলবগার হুয়ী?
আওর তেরে লিয়ে যহমত কাশে পয়কার হুয়ী ॥

কিস কী শমশীর জাহাঁগীর জাহাঁনদার হুয়ী?
কিস কী তাকবীর সে দুনইয়া তেরী বেদার হুয়ী ॥

কিস কি হায়বাত সে ছনম সাহমে হুয়ে রাহতে থে?
মুঁহ কে বাল গিরকে হু আল্লাহু আহাদ কাহতে থে ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ :

১. এই পৃথিবীতে কোন্ জাতি কেবল তোমায় চেয়েছে? এবং তোমার জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে?

২. এই দুনিয়াতে কাদের তরবারি সারা দুনিয়া দখল করে তা ধরে রেখেছিল? কাদের নারায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে পুরো জাহান জেগে উঠল?

৩. কাদের ভয়ে মূর্তিগুলো থর থর করে কাঁপছিল? আর সেজদায় পড়ে 'হু আল্লাহু আহাদ' বলতে ছিল?

টীকা :
'হু আল্লাহু আহাদ' : পবিত্র কুরআনের প্রসিদ্ধ সুরা ইখলাসের প্রথম আয়াত। যার অর্থ : আল্লাহ অখন্ড, একক কিন্তু প্রচলিত অর্থে 'এক বা অদ্বিতীয়' বলে যে অনুবাদ করা হয়েছে তা এর প্রকৃত অর্থ নয় কারণ আরবীতে 'এক' এর অনুবাদ হলো 'ওয়াহেদ' আর 'আহাদ' এর অর্থ হলো অখন্ড বা একক। এটা পবিত্র কুরআনের ১১২ নং সুরা। ইখলাস অর্থ মুক্ত, খালাস, মোহমুক্ত বা ভেজালমুক্ত বুঝায়।
এই সুরায় ৪টি আয়াত নাযিল হয়েছে। একটি আয়াতেও ইখলাস শব্দটি উপস্থিত নাই। এখানে আল্লাহর গুণকীর্তন প্রকাশিত হয়েছে। সুরা ইখলাসের আয়াত দুটি খোঁজ করে আমরা পাই–

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾

(১) কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ (২) আল্লাহুছ সামাদ। এখানে কুল অর্থ বলো, হু অর্থ তিনি (যিনি পরমসত্তা), আহাদ অর্থ একক, অখন্ড এবং সামাদ অর্থ নিরপেক্ষ, স্বনির্ভর. মুক্ত, স্বাধীন।
আল্লাহ্ হইলেন 'আহাদ সত্তা' অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে একক সত্তা। আহাদসত্তার দুইরূপ : এক. পুরুষ, দুই. প্রকৃতি। পুরুষসত্তা যুদ্ধের প্রতীক। আর প্রকৃতি বা নারীসত্তা আপন অর্জিত সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া শান্তির প্রতীক হইয়া আছে। *Allah is An insparable whole Existance.* সর্বঅবস্থায় শুধু তিনিই আছেন।

www.pathagar.com

আয়াতের অর্থ

বলো, তিনিই আহাদ আল্লাহ অথবা আহাদ জগতের আল্লাহ (১) তিনিই সামাদ জগতের আল্লাহ অর্থাৎ সামাদ আল্লাহ। আল্লাহর প্রকাশিত রূপের মধ্যে আহাদ রূপ নিম্নমানের দুর্বল স্তর। বস্তু জগতের যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি অর্থাৎ গ্রহণ করি তাহা আহাদ জগৎ। এই আহাদ জগৎ যে আল্লাহ বস্তুর অভ্যন্তরে সুপ্ত আছেন তিনিই সে, যাকে উদ্ভাসিত করার জন্য এত সাধনা যুগ যুগ ভরে করে যাচ্ছে। এই আহাদ জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ সামাদ জগতে যায়। সেখানে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান থাকে না। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে স্পষ্ট উপস্থিত থেকেই আলাদা। যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারের রহস্য উদঘাটন করার দ্রষ্টা। বা লা-শারিক। এমন স্তরটিই ইখলাস।

সরল ব্যাখ্যা :

বলো তো মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন জাতি তোমাকে মুহাব্বত করে? যদি করতো তবে শুধুমাত্র তোমারই উপাসনা করতো। কোনো কাওম কি তোমার এবং তোমার রাসুলের ইজ্জতের জন্য নিজের রক্ত পানির মত প্রবাহিত করেছে? কোন্ জাতির তাকবীরের আওয়াজে পৃথিবীতে তাওহীদের আলো প্রজ্জলিত হয়েছে? তুমি তো সবই জানো?

মূর্তি পূজারীরা কোন্ জাতির ভয়ে কেঁপেছে? শুধু মুসলমান, এই মুসলমানরাই তোমার নামের মহিমাকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। আল্লামা ইকবাল তাঁর নিজ দৃষ্টিতে মুসলমানদের অতীত গৌরব ও বর্তমানের করণীয় বর্তব্য সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এগার.

আ-গায়া আঙ্গিনে লাড়াই মেঁ আগার ওয়াকতে নামায
কেবলা রো হোকে যমী বূস হুয়ী কাওমে হেজায ॥

একহী সফ মেঁ খাড়ে হো গ্যায়ে মাহমূদ ও আয়ায
না কোই বান্দা রাহা আওর না কোই বান্দা নেওয়ায ॥

বান্দা ও সাহেব ও মোহতাজ ও গনী এক হুয়ে
তেরী সরকার মে পৌছে তু সবহী এক হুয়ে ॥

অর্থাৎ :

১. লড়াইয়ের ময়দানেও যখন নামাজের সময় এসে যেতো আমরা মুসলমান কেবলামুখি হয়ে তোমার সেজদা করেছি।

www.pathagar.com

২. নামাযের সময় একই সারিতে দাঁড়িয়ে গেছে সুলতান মাহমুদ গযনবী (র.) ও তাঁর গোলাম আয়ায, মুনিব ও দাসের ভেদাভেদ থাকেনি।

৩. ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা সকলেই এক হয়ে যেতো। সকলেই এ হয়ে যেতো যখন তোমার দরবারে হাজির হতো।

সরল ব্যাখ্যা :

যুদ্ধের ময়দানে যখনই নামাযের সময় হয়েছে আমরা তোমার দরবারে কেবলামুখি হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গিয়েছি; ঐ সময়ও তোমাকে ভুলিনি। আর আমাদের বৈষম্যহীনতার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন, মালিক আর গোলাম একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেছি। যখন তোমার দরবারে হাজির হয়েছি সকলেই এক সমান হয়ে তোমার সেজদা করেছি। আমরা এমন নজির দেখিয়েছি তোমার প্রিয়বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। সুতরাং আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবেও তোমার কাছে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। তাই আমাদের ফরিয়াদ তোমার কাছে সবার আগে গ্রহণযোগ্য হওয়ার দাবী রাখে।

বার.

মাহফেলে কৌন ওয়া মাকাঁ মেঁ সাহর ওয়া শাম ফেরে
মায়ে তাওহীদ কো লেকার সিফাতে জাম ফেরে ॥

কোহ মেঁ দশত মেঁ লেকার তেরা পয়গাম ফেরে
আওর মালূম হায় তুঝকো কভী না কাম ফেরে ॥

দাশত তু দাশত হ্যাঁয়, দরইয়্যা ভী না ছোড়ে হাম নে!
বাহরে জুলুমাত মেঁ দোওড়া দিয়ে ঘোড়ে হামনে ॥

অর্থাৎ :

১. আমরা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা তোমার নামের প্রচার করেছি। এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত তৌহিদের পেয়ালা নিয়ে ঘুরেছি।

২. তৌহিদের দাওয়াত নিয়ে আমরা পাহাড়-পর্বত পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, ঘুরেছি, কিন্তু কখনো অকৃতকার্জ হয়ে ফিরে আসিনি কোথাও থেকে।

www.pathagar.com

৩. শুধু স্থলেই নয় বরং সাগরেও ঝাঁপিয়ে পড়েছি। অন্ধকার সাগরে আমরা ঘোড়া নামিয়ে দিয়েছি তবুও তোমার দীনের প্রচার থেকে, তোমার নবীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হইনি কখনও।

টীকা

সাগরেও মুসলমানরা বীরত্ব দেখিয়েছে

এ কথার দ্বারা আটলান্টিক মহাসাগর যা আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো, হযরত উকবা ইবনে নাফে জয় করার পর আটলান্টিক মহা সাগরে ঘোড়া নামিয়ে দিলেন এবং তিনি বললেন, 'হে প্রভু! আমার দুঃখ হয় যে, তোমার জমিন শেষ হয়ে গিয়েছে নতুবা আমি এভাবেই বিজয় অর্জনের জন্য সামনে অগ্রসর হতে থাকতাম।'

সরল ব্যাখ্যা

আমরা দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত তোমার নামের প্রচার করেছি। আমরা বিশ্ববাসীকে তোমার পয়গাম শুনিয়েছি। আর তুমি জানো, আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে কখনো ব্যর্থ হইনি। আমরা কোন জাতিকে ভয় পাইনি। স্থলে শুধু নয়; বরং আমরা সাগর অতিক্রম করেও তোমার পয়গাম পৌঁছিয়েছি। আমরা আরব থেকে বের হয়ে আফ্রিকার জঙ্গলেও ইসলামের পতাকা উড্ডয়ন করেছি।

তের.

সফহায়ে দাহর সেঁ বাতিল কো মিটায়া হাম নে
নওএ ইনসাঁ কো গোলামী সে ছোড়ায়া হাম নে ॥

তেরে কা'বাকো জাবীনুসে বসায়া হাম নে
তেরে কুরআন কো সীনুঁ মে লাগায়া হাম নে ॥

ফের ভী হাম সে ইয়ে গিলাহ হায় কে ওফাদার নেহী!
হাম ওফাদার নেহী, তুভী তু দিলদার নেহী ॥

অর্থাৎ

১. আমরা যুগের পাতা থেকে বাতিলকে দূর করেছি, মানব জাতিকে গোলামীর কবল থেকে মুক্ত করেছি।

www.pathagar.com

২. আমরা আবাদ করেছি বাইতুল্লাহকে। হেফাজত করেছি সেজদার দ্বারা, এবং বুকে ধারণ করেছি তোমার কুরআন।

৩. তারপরও তুমি নারাজ যে মুসলমানরা কৃতজ্ঞ নয়। আমরা যদি কৃতজ্ঞ না হই তবে তুমিও দিলদার নও।

সরল ব্যাখ্যা

আমরা পৃথিবী থেকে কুফরীকে দূর করেছি এবং বনি আদমকে প্রত্যেক প্রকার দাসত্ব থেকে আযাদ করেছি। আমরা তোমার কা'বাকে হেফাজত করেছি, তাকে আবাদ করেছি। যারা কাবার ভেতর ৩৬০ টি মূর্তি রেখে পূজা অর্চনা করছিল তাদের কবল থেকে কাবাকে মুক্ত করে তোমার পবিত্র নামের তসবিহকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমরা তোমার পবিত্র কুরআনকে সর্বদা বুকে রেখেছি। তারপরও তুমি আমাদের উপর নারাজ, আর তুমি আমাদের ব্যাপারে অভিযোগ করছ আমরা কৃতজ্ঞ নই। আমরা যদি কৃতজ্ঞ না হই তবে তুমিও দয়াবান নও।

চৌদ্দ.

উম্মাতেঁ আওর ভী হ্যাঁয়, উন মেঁ গুনাহ্‌গার ভী হ্যাঁয়
আজয ওয়ালে ভী হ্যাঁয়, মসতে মায়ে পোনদার ভী হ্যাঁয় ॥

উন মেঁ কাহেল ভী হ্যাঁয়, গাফেল ভী হ্যাঁয়, হুশইয়ার ভী হ্যাঁয়
সায়কড়ো হ্যাঁয়ে কে তেরে নাম সে বেযার ভী হ্যাঁয় ॥

রহমাতেঁ হ্যাঁয় তেরী আগইয়ারকে কাশানূঁ পর!
বারক গেরতী হায় তো বেচারে মুসলমানোঁ পর ॥

অর্থাৎ

১. এই ভূখণ্ডে আমরা ছাড়া আরো বহু উম্মত আছে। কেউ পাপী, কেউ অক্ষম আর কেহ নেহায়েত ভুল ধারণার শিকার হয়ে তোমাকে পাবার আশায় ভুল পথে অনুসন্ধান করছে। (তোমার অস্বীকারকারী)।

২. তাদের মধ্যে দুর্বল, অলস যেমনি রয়েছে, তেমনি রয়েছে হুশিয়ার ব্যক্তি। এর মধ্যে অনেকে আবার তোমার নাম নেওয়াকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে।

www.pathagar.com

৩. তারপরও তোমার রহম ও করম সব সময় তাদের উপর হয়, আর নিরীহ মুসলিম জাতির মাথার উপর যত মুছিবত পতিত হয়।

সরল ব্যাখ্যা

আমরা ছাড়া এই ধরাতে অন্য সম্প্রদায়ও বসবাস করছে। তাদের মধ্যে ভাল মন্দ উভয় রয়েছে, নেককারও আছে। আর বহু লোক তোমার নামও শুনতে রাজী নয় আবার উপাসনা করতেও রাজী নয়। তারপরও তুমি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার ও মেহেরবানী কর। তোমার নেয়ামতের ভাণ্ডার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছ। অথচ মজলুম মুসলমান তোমার সদয় দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। যদি তা না হত তবে সমস্ত সম্পদ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার মালিক কেন তাদেরকেই বানিয়েছ।

পনের.

বুত সনম খানূ হ্যাঁয় কাহতে হ্যাঁ, মুসলমাঁ গায়ে,
হায় খুশী উন কো কেহ কাবে কে নেগাহবান গায়ে ॥

মানযিলে দাহর সে উঁট কে হুদী খাঁ গায়ে
আপনী বগলূঁ মেঁ দাবায়ে হুয়ে কুরআন গায়ে ॥

খানদা যন কুফর হায়, ইহসাস তুঝে হায় কে নেহী?
আপনী তাওহীদ কা কুছ পাস তুঝে হায় কে নেহী ॥

অর্থাৎ

১. মূর্তি পূজারীরা মুসলমানের দুর্দশা দেখে হাসি ঠাট্টা করে বলে, মুসলিম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে এবং তারা এ ব্যাপারে খুশি যে, এখন কাবা ঘরের পাহারাদার জগত থেকে চলে গেল।

২. উটের গান গাওয়া উটের চালক দুনিয়া থেকে চলে গেল এবং কুরআনের অনুসারীরা বগলের নিচে কুরআন নিয়ে সরে দাঁড়ালো।

৩. কুফরী শক্তি হাসছে এবং বিদ্রূপ করছে, এতে তোমার কি অনুভূতি নেই? তোমার কি এতটুকুও ভাবনা নেই যে, কি দশা হবে তৌহীদের?

www.pathagar.com

সরল ব্যাখ্যা

আজ বিশ্বে মুসলমানদের দুর্দশা এমন যে, মূর্তি পূজারীরা খুশিতে বলছে অচিরেই মুসলমানরা ভূপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তাদের পর কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে না মক্কায় যাবে না মদিনায়। আর না পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি কুরআনের নাম নেওয়ার থাকবে। হে প্রভু! আজ কাফের আমাদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছে। এমনকি তোমার নিজ তৌহীদের স্থায়িত্বের কোন চিন্তা ফিকির নেই? তুমি কি কখনো এটা পছন্দ করবে যে কুফর ইসলামের উপর প্রাধান্য পাক। তা না হলে তুমিই মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দাও।

ষোল.

ইয়ে শেকায়েত নেহী, হ্যাঁয় উনকে খাযানে মামূর
নেহী মাহফিল মেঁ জেনহেঁ বাত ভী করনে কা শুউর ॥

কহর তূ ইয়ে হায় কে কাফের কো মিলে হুর ওয়া কসূর!
আওর বেচারে মুসলমাকো ফাকাত ওয়াদায়ে হুর ॥

আব ওহ আলতাফ নেহী হামপে এনায়াত নেহী
বাত কিয়া হায় কে পহলী সী মুদারাত নেহী ॥

অর্থাৎ

১. তাদের ধন ও দৌলত ভরপুর ভান্ডার দেখে আমরা দুঃখ করছি না, মাহফিলে গিয়ে যারা দুটি কথাও বলতে পারে না।

২. কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তারা পাচ্ছে হুর ও প্রাসাদ, আর নিরীহ মুসলমানদের ভাগ্যে শুধু হুরের ওয়াদা?

৩. তাই বলছি, এখন আর তোমার দয়া আমাদের প্রতি নেই। আর কি বলবো, বাস্তবেই আগের মত আমাদের উপর তোমার স্নেহের ছায়া আর নেই।

সরল ব্যাখ্যা

আমাদের এই অভিযোগ নয় যে, অমুসলিম এত ধনী কেন? আফসোস শুধু এটাই যে, তাদের সব নেয়ামত অর্জিত আছে। আর মুসলমানদেরকে শুধু এই

www.pathagar.com

ওয়াদা যে, মরার পর জান্নাতে হুর ও গেলমান পাবে। আর এখন তো এমন জামানা, পূর্বের ন্যায় আমাদের উপর তুমি মেহেরবানও না। পূর্বে আমরাই দুনিয়ার সকল নেয়ামতের মালিক ছিলাম, কিন্তু বর্তমানে আমরা নিঃস্ব।

সতের.

কিউঁ মুসলনমানুঁ মেঁ হায় দৌলাতে দুনইয়া নায়াব?
তেরী কুদরাত তূ হায় ওহ্ জেসকী না হদ হায় না হিসাব ॥

তূ জূ চাহে তূ উঠে সীনায়ে সহ্‌রা সে হাবাব
রহ্‌ম ও দাশত হো সিলী যাদায়ে মোজে সারাব ॥

তূ'নে আগইয়ার হায়, রুসওয়াই হায়, নাদারী হায়?
কিয়া তেরে নাম পে মরনে কা এওয়াজ খা-রী হায় ॥

অর্থাৎ

১. বর্তমানে মুসলমানের নিকট দুনিয়ার ধন দৌলত নেই কেন? অথচ আমরা জানি তোমার অনুগ্রহের কোন হিসাব নেই।

২. তুমি ইচ্ছা করলে প্রবাহিত করতে পার মরুভূমিতে পানির ঢেউ, শুষ্ক মরুভূমিতে মরীচিকার স্থানে তুমি করতে পার সাগর পারা।

৩. হে প্রভু! শুধু আমাদের ভাগ্যে কেন নিন্দা, ঠাট্টা ও অভাব? তোমার পথে চলতে গেলে কি তাদের এই পরিণতি?

সহজ ব্যাখ্যা

আজ মুসলমান সব জাতি থেকে গরীব এবং অসহায়। অথচ তুমি সর্বশক্তিমান আর তোমার খাজানায় তো কোন জিনিসের কমতি নেই। তুমি ইচ্ছা করলে মরুভূমিকে সাগরে পরিণত করতে পার। আজ আমরা অন্য জাতির ঠাট্টা বিদ্রূপ শুনছি! অসহায়, হে প্রভু! মুসলমান হওয়ার প্রতিদান কি এই যে, আমরা দুনিয়ার নজরে লাঞ্ছিত হবো?

আঠার.

বনী আগইয়ার কী আর চাহনে ওয়ালী দুনইয়া!
রাহ গায়ে আপনে লিয়ে এক খায়ালী দুনইয়া ॥

www.pathagar.com

হাম তূ রোখসত হুয়ে আওরূঁ নে সামভালী দুনইয়া!
ফেরনা কাহনা হুয়ী তাঁরহীদ সে খালী দুনইয়া ॥

হাম তূ জীতে হ্যাঁয় কে দুনইয়া মেঁ তেরা নাম রাহে?
কাহী মুমকেন হায় কে সাকী না রাহে, জাম রাহে ॥

অর্থাৎ

১. বিশ্বের ধন ও দৌলত আজ অন্য জাতির হাতে। মুসলমান খালি হাত; মুসলমানদের হাতে রয়েছে শুধু এক কাল্পনিক দুনিয়া।

২. আমরা তো বিদায় নিয়ে যাচ্ছি, কাফেররা দুনিয়াকে গ্রাস করে নিল। কিন্তু তারপর যেন বলতে না হয় যে, তৌহিদ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল।

৩. হে প্রভু! আমরা তো পৃথিবীতে এজন্য জীবিত থাকতে চাই যেন তোমার দীন জিন্দা থাকে। আর আমরা ধ্বংস হলে তোমার দীন কিভাবে বাকী থাকবে?

সহজ ব্যাখ্যা

হে প্রভু বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা এমন যে দুনিয়া এবং তার অর্থ কাফেরদের হাতে, মুসলমান শুধু কাল্পনিক দুনিয়াতে বসবাস করছে। তোমার জমিনে মুসলমানদের কোন হুকুমত নেই। হে খোদা, আমরা তো দুনিয়াতে এজন্য বসবাস করি যে, তোমার তৌহীদ জিন্দা থাকে এবং তোমার নাম বাকী থাকে। কিন্তু এটা তো অসম্ভব যে মুসলমান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তোমার নাম বাকী থাকবে।

মূলভাব

মহাকবি আল্লামা ইকবাল উপরোক্ত কথার দ্বারা এই ঘটনার দিকে ইশারা করেছেন যা বিশ্বনবীর জীবনে ঘটেছিল। যে ঘটনার দ্বারা বিশ্বনবী (সা.) বদর যুদ্ধে বলেছিলেন যে, ‘হে প্রভু! সাহাবীদের এই ক্ষুদ্র জামাত আজ যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত তোমার ইবাদত বন্দেগী কে করবে?’

উনিশ.

তেরী মাহফিল ভী গায়ী, চাহনে ওয়ালে ভী গায়ে!
শব কী আহেঁ ভী গায়েঁ, সুবহে কে নালে ভী গায়ে ॥

www.pathagar.com

দিল তুঝে দে ভী গায়ে, আপনা সেলালে ভী গায়ে
আকে বয়ঠে ভী না থে আওর নিকালে ভী গায়ে ॥

আয়ে উশশাক, গ্যায়ে ওয়া'দায়ে ফরদা লে কার
আব উনহেঁ ঢোনড চেরাগে রুখে যীবা লে কার ॥

অর্থাৎ

১. সর্বদা যারা তোমার ইবাদত করতো তারা তো আর নেই, রাতের অন্ধকারে শেষভাগে যারা কাঁদত তারা ও আর নেই।

২. তোমার প্রেমিক যারা ছিল তারা তো তাদের বিনিময় নিয়ে গেছে, সাথে সাথেই তারা আবার তাদের আসন শূন্য করে চলে গেল।

৩. সকল প্রেমিক চলে গেছে ফিরে আসার ওয়াদা করে, এখন তাদের তালাশ করো রূপের বাতি হাতে নিয়ে।

সহজ ব্যাখ্যা

হে প্রভু! আজ মুসলমানের এ করুণ অবস্থা, মুসলমান প্রত্যেক স্থানে লাঞ্ছিত, অপমাণিত। যারা তোমার নামের উপর প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতো ধীরে ধীরে তারা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তারা তোমাকে মুহাব্বত করেছে তার বদলাও তারা নিয়ে গেছে। তারা হাসি খুশি মনে বিদায় হয়ে গেছে। কিন্তু এখন এ ধরনের ব্যক্তি থেকে তোমার মাহফিল খালি হয়ে গেল।

বিশ.

দরদে লায়লা ভী ওহী, কায়েস কা পহলো ভী ওহী
নাজদ কে দাশত ওয়া জাবাল মেঁ রোম আহূভী ওহী ॥

ইশক কা দিল ভী ওহী হুসন কা জাদূভী ওহী
উম্মাতে আহমদে মুরসালভী ওহী তূ ভী ওহী ॥

ফের ইয়ে আযর দেগী গায়বে সবব কিয়া মানা?
আপনে শায়দাউঁ পে ইয়ে চশমে গজব কিয়া মানা ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ

১. মজনুর অন্তর সেরূপ আছে, লাইলির মুহাব্বতের কষ্টও তেমনই আছে, সেই নজদ দেশী হরিণীদের হৃদয় ভুলানো নৃত্যও সেরূপ আছে।

২. প্রেমের খেলায় মনের বেদন, রূপের যাদুও একইভাবে বহাল আছে, তুমিও যেই ছিলে এখনও তাই আছ, আর তোমার নবীর উম্মতও সেই আছে।

৩. তাঁরপরও নিজ আপনজনদেরকে কষ্ট দেওয়ার কি অর্থ?

সহজ ব্যাখ্যা

হে খোদা! ইসলামের গুণাবলি পূর্বের ন্যায় এখনও বহাল আছে, আর মুসলমানদের ইসলামের সাথে মুহাব্বতও বাকী আছে। কাবার হজ এবং যেয়ারতও চলছে। মুসলমানদের ঈমানী জযবাও এখন পর্যন্ত এভাবেই জিন্দা আছে। ইসলামের রূপ রেখাও পূর্বের মত বাকী আছে। আমরাও যা ছিলাম তাই আছি, আর তুমিও যেমন ছিলে তেমনই আছ। তারপরও মুসলমানদের এ অবস্থা কেন?

একুশ.

তুঝকো ছোড়া কে রাসুলে (সা.) আরবী কো ছোড়া?
বুত গরী পেশা কিয়া, বুত শেকনী কো ছোড়া ॥

ইশক কো, ইশক কী আশুফতাহ্ সারী কো ছোড়া?
রসমে সালমান ওয়া ওয়ায়েস করনী কো ছোড়া ॥

আগ তাকবীর কি সিনূঁ মেঁ দাবী রাখতে হ্যাঁয়?
যিন্দেগী মেসলে বেলালে হাবশী রাখতে হ্যাঁয় ॥

অর্থাৎ

১. হে প্রভু! তোমাকে ছাড়ার কারণে রাসুলে আরবীকে ছেড়ে দিয়েছি? মূর্তি ভাঙ্গা ছেড়ে দিয়ে মূর্তি পূজা করছি?

২. ইশকের পথ ছেড়ে দিয়ে প্রকৃত ইশকের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি? আমরা কি হযরত সালমান ফারসী (রা.) এবং হযরত ওয়ায়েস করনী (রা.)-এর অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছি?

www.pathagar.com

৩. আমাদের অন্তরে রয়েছে তাকবীরের আগুন, আমাদের স্পৃহা হলো হযরত বিলাল হাবশী (রা.)-এর মত জীবন যাপন।

সহজ ব্যাখ্যা

তাকবীরের অগ্নি আছে আমাদের। আমাদের কছুর কি? আমরা কি তোমাকে ভুলে গিয়েছি? তোমার রাসূলকে ছেড়ে দিয়েছি, হযরত সালমান ফারসী ও হযরত ওয়ায়েস করনী-এর তাকলীদ ছেড়ে দিয়েছি? বস্তুত আমরা তো এখনও তৌহিদের আগুন নিজ বুকে লুকিয়ে রেখেছি। হযরত বেলালের মত তোমার নামের উপর কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত আছি।

বাইশ.

ইশক কী খায়ের, ওহ পহলী সী আদাভী না সহী
যাদাহ পয়মায়ী তাসলীম ওয়া রেজা ভী না সহী ॥

মুজতারাব দিল সিফাতে কিবলা নুমা ভী না সহী
আওর পাবন্দিয়ে আইনে ওয়াফা ভী না সহী ॥

কভী হাম সে, কভী গায়রুঁ সে শানাসাই হায়!
বাত কাহনে কী নেহি, ত ভী তূ হারজায়ী হায় ॥

অর্থাৎ

১. পূর্বের ন্যায় প্রেমের লীলা কার্যকরী নেই, আমাদের মধ্যে পুরো কৃতজ্ঞতার রংও নেই।

২. পেরেশান হৃদয় যদিও দিগদর্শন যন্ত্রের গুণে গুনান্বিত নয়।

৩. তুমি কখনো আমাদের সাথে আবার কখনো অন্যের সাথে পরিচিত হও, আর কি বলব তুমিও যে সকলের মন যোগাতে চাও।

সহজ ব্যাখ্যা

একথা সত্য যে, আমরা ইশক, মুহাব্বতে আসলাফ ও আকাবিরের সমতুল্য নই, আর আমাদের মধ্যে তাসলীম ও রেজার ঐ গুণাবলিও নেই যা ঐ বুজুর্গদের মধ্যে পাওয়া যায়, আর আমরা ইসলামের পূর্ণ ওফাদার নই কিন্তু

www.pathagar.com

বে-আদবী মাফ করবেন, আপনি ছাড়া (তুমি আমাদের হয়েও আমাদের দেখো না) অন্য কেউ আমাদের দেখার নেই।

তেইশ.

সারে ফারাঁ পে কিয়া দীন কো কামেল তূনে
এক ইশারে মেঁ হাযারোঁ কেলিয়ে দিল তু নে ॥

আতশে আনদূয কিয়া ইশক কা হাসেল তূ নে
ফূঁক দী গরমীয়ে রুখসার সে হামফিল তূ নে ॥

আজ কেউঁ সীনে হামারে শারার আবাদ নেহী?
হাম ওহী সোখতা সামাঁ হ্যাঁয়, তুঝে ইয়াদ নেহী ॥

অর্থাৎ

১. মক্কার ফারান পর্বতের চূড়ায় যে ইসলামের প্রকাশ ঘটে সেই দীনকে তুমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছ। এক ইশারায় লক্ষ মানুষের হৃদয় কেড়ে নিয়েছ।

২. তুমিই দুনিয়াবাসীকে দান করেছ প্রেমের আগুন আর বিশ্বনবী (সা.) মানুষকে তোমার মুহাব্বত শিখিয়েছেন।

৩. কিন্তু আজ আমাদের হৃদয় সেই খোদা ও রাসুলের মুহাব্বত থেকে খালি কেন। আমরা আজ দুনিয়াতে সর্বহারা তুমি কি তা জানো না?

সহজ ব্যাখ্যা

বাস্তব কথা হলো ইসলামের আলো মক্কার ফারান পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু হয়েছে, আর তুমি সেই দীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছ। হাজার হাজার মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য দেখে নবী (সা.)-এর হাতে মুসলমান হয়েছেন। মুহাম্মদ আরবী (সা.) তাদের অন্তরে তোমার মুহাব্বতের বীজ বপন করেছেন, ঐ বুজুর্গরা এই আলোর দ্বারা জগতকে আলোকিত করে গেছেন। কিন্তু আমরাও তো সেই কামেল মুসলমানের সন্তান তারপরও আমাদের মধ্যে তাদের মতো ঈমানী স্পৃহা নেই কেন?

চব্বিশ.

ওয়াদিয়ে নজদ মেঁ ওহ শোরে সালাসেল না রাহা
কায়েস দেওয়ানায়ে নাজারায়ে মাহফিল না রাহা ॥

www.pathagar.com

হাওসালে ওহ না রাহে, হাম না রাহে দিল না রাহা
ঘর ইয়ে উজড়া হয়ে কে তূ রওনকে মাহফিল না রাহা ॥

আয় খোশ আঁ রোয কে আয়ী ওয়া বসদ নায আয়ী!
বে হেজাবানা সোয়ে মাহফেলে মা বায আয়ী ॥

অর্থাৎ

১. আজ নজদের মাঠে উট পালের ঘন্টার ধ্বনি নেই, আজ কায়েস ও মজনু তার প্রিয়া লায়লা ও শরারীর হাওদাখানি দেখতে ব্যস্ত নয়।

২. ঐ সাহস নেই, আমরা নেই, অন্তরও নেই যখন তুমি আমাদের মাহফিলে নেই এখন এ ঘর বিরাণ হয়ে গেছে।

৩. সুখের ঐ দিন কবে হবে যেদিন তুমি আমাদের মাঝে সেজে-গুঁজে আসবে।

সহজ ব্যাখ্যা

এখন মুসলমানের মধ্যে রাসুলের প্রেমের ঐ জযবা দেখা যাচ্ছে না, এখন মুসলমান ইসলামের উপর কুরবানও হচ্ছে না। এখন আর মুসলমানের সাথে পূর্বের ন্যায় মুহাব্বতও নেই। বাস্তব কথা হলো এখন আমাদের মধ্যে বড় হিম্মতও নেই। হে প্রভু! শেষ মুহূর্তেও যদি তুমি আমাদের উপর আবার মেহেরবানী করতে এবং আমাদের অসহায়ত্বের উপর ইহসান করে আমাদের মাহফিলে তাশরিফ আনতে। আমরা আবার তোমার প্রেমের ঝান্ডাকে সমুন্নত করার জন্য জীবন বিসর্জন দিতাম।

পঁচিশ.

বাদাহ কাশ গায়র হ্যাঁয় গুলশান মেঁ লবে জূ বয়ঠে
সুনতে হ্যাঁয় জাম বকফ নাগমায়ে কূ কূ বয়ঠে ॥

দাওর হাঙ্গামায়ে গুলযর সে এক সো বয়ঠে!
তেরে দেওয়ানে ভী হ্যাঁ মুনতাজের হো বয়ঠে ॥

আপনে পরওয়ানূঁ কো ফের জওকে খোদ আফরোযী দে
বরকে দেরীনা কো ফরমানে জিগর সোযী দে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ

১. আজ অন্যান্য জাতি সুখের উচ্চ আসনে বসে ফূর্তি করে শরাব পান করছে। আজ তাদের জীবন সার্থক, তারা বসে বসে সুখের গান শুনে (পাপিয়ার কুহু গান শ্রবণ করে)।

২. আজ তোমার পাগল মুসলমানরা মজলিস থেকে এক কোণায় সরে রয়েছে, শুধু তোমার আশায় বসে আছে।

৩. পতঙ্গের প্রাণে আবার আত্ম-বিসর্জনের শক্তি দান কর। আর পুরনো বিদ্যুতকে এমন হৃদয় জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দাও।

সহজ ব্যাখ্যা

হে প্রভু! আজ পৃথিবীতে অন্য সম্প্রদায় আরাম ও শান্তির সাথে জীবন কাটাচ্ছে। দুনিয়ার সব নেয়ামত ভোগ করছে। কিন্তু নিরীহ মুসলমান অভাবে অনটনে অসহায় অবস্থায় আছে। তোমার রহম ও করমের অপেক্ষায়। হে প্রভু! আমাদের উপর তোমার ফজল ও করম অবতীর্ণ কর, আর আমাদের অন্তর তোমার মুহাব্বতের আগুন দ্বারা আলোকিত কর।

ছাব্বিশ.

কাওমে আওয়ারা এনাঁ তার হায় ফের সোয়ে হেজায
লে উড়া বুলবুলে বেপর কো মাজাকে পরওয়াজ ॥

মুজতারাব বাগ কে হার গানচে মেঁ হায়বুয়ে নিয়ায
তূ জারা ছীড় তূ দে, তিশানায়ে মিজরাব হায় সায ॥

নাগমে বেতাব হ্যাঁয় তাঁরুঁ সে নেকালনে কে লিয়ে
তূরে মুজতর হায় উসী আগ মেঁ জলনে কে লিয়ে ॥

অর্থাৎ

১. আজ আবার বিপথগামী দল হেজাজের পথ ধরেছে ডানাহীন পাখিদের পাখা দিয়ে তুমি সাহায্য করো।

২. অস্থির বাগানের প্রতিটি ডালে ফুলের গন্ধ জড়িয়ে আছে। তুমি সামান্য নাড়া দিলেই তা ছড়িয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

৩. বীণার তানের সুরেরা বেজে উঠতে আজ উদগ্রীব হয়ে আছে। সেই প্রেমদাহে আবার জ্বলে যেতে তারা অস্থির।

সহজ ব্যাখ্যা

হে প্রভু! মুসলিম জাতি আজ নিজ ভুলের দরুন অনুতপ্ত, এখন আবার তোমার প্রতি ধাবিত হচ্ছে। যদিও জাতি এখন অসহায় অবস্থায় কিন্তু তাদের ভিতরে উন্নতি করার স্পৃহা বিদ্যমান। মুসলমানের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে নবী (সা.)-এর মুহাব্বত ভরা আছে। শুধু তোমার একজনের মেহেরবানী দেরী। মুসলমান আবার পুনরায় পৃথিবীর সকল জাতির উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে। মুসলমান আবার তোমার রাস্তায় আত্ম-বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত।

সাতাশ.

মুশকিলেঁ উম্মতে মরহুম কী আসাঁ কর দে
মূরে বে মায়াহ কো হামদূশে সোলায়মাঁ করা দে ॥

জিনসে নায়াবে মুহাব্বত কো ফের আরয করা দে
হিন্দ কে দায়র নাশীনূঁ কো মুসলমাঁ কর দে ॥

জুয়ে খূঁ মী চাকাদ আয হাসরাতে দেরী নায়ে মা!
মী তপদ নালা বা নাশতার কাদায়ে সীনায়ে মা ॥

অর্থাৎ

১. হে প্রভু অসহায় এই উম্মতকে বিপদ থেকে মুক্তি দান করো, কমজুর পিপিলিকাকে হযরত সুলাইমানের রাজত্ব দান কর।

২. আমাদের অন্তরে রাসুলের সেই ভালোবাসা আবার দান কর, হিন্দুস্থানের বাসিন্দা কমজোর মুসলমানকে আবার সঠিক মুসলমান বানিয়ে দাও।

৩. আজ দুঃখে যাদের চোখে রক্তের নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের হৃদয়ে তরঙ্গায়িত কান্না-কাটির ভীষণ ঝড়।

সহজ ব্যাখ্যা

হে প্রভু! আমাদের মুছিবতসমূহ দূর করে দাও। আমরা মুসলমানরা আজ অত্যন্ত দীনহীন, নিঃস্ব। আমাদেরকে পুনরায় হযরত সুলাইমানের মর্তবা দান

www.pathagar.com

কর। আমাদের অন্তরে ইশকে রাসূলের আগুন প্রজ্জ্বলিত কর। আমরা ভারতীয় মুসলমানকে সঠিক মুসলমান বানিয়ে দাও।

আল্লামা ইকবাল সব সময় তাঁর ভাষায় অলি-আবদাল, গাউস-কুতুব ও বুজুর্গদের প্রচারিত সত্যিকারের ইসলামের পথে ভারতবর্ষের মুসলমানদের কায়েম থাকার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। খাজা মইনুদ্দীন চিশ্‌তি, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, মুজাদ্দেদ আলফে সানী, শেখ ফরিদ, শাহ্জালাল, শাহ্পরান (রা.)-এর মত আদর্শিক মুসলমান হওয়ার জন্য বার বার আহ্বান করেছেন। তিনি বার বার প্রার্থনা করেছেন, 'হে প্রভু! আজ আমাদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ, আমাদের হৃদয় আফসোস খাজানা। আর তা থেকে রক্তের নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর।

আটাশ.

বূয়ে গুলনে গায়ী বায়রুনে চমন, রাযে চমন
কিয়া ক্বিয়ামত হায় কে খোদ ফুল হ্যাঁয় গামমাযে চমন ॥

আহ্দে গুল খতম হুয়া, টুট গায়া সাযে চমন
উড় গ্যায়ে ডালিউঁ সে যমযমা পরওয়াযে চমন ॥

এক বুলবুল হায় কে হায় মাহবে তারান্নুম আবতক
উসকে সীনে মে হায় নগমূঁ কা তালাতুম আবতক ॥

অর্থাৎ

১. যে বাণী ছিল সবুজ পাতার বৃক্ষে গোপন, তাকে কুসুম নিজেই আপন সেজে প্রচার করল, অথচ সে গুপ্তচর।

২. এখন আর বাগানে পুষ্পলতা ও ফুল ফুটে না, মৌসুম এবার শেষ হয়ে গিয়েছে। কুসুম ডালে বুলবুলিদের গান আর শোনা যাচ্ছে না।

৩. তবে ডালে বসে একটি দুঃখী বুলবুলি (ইকবাল) গান করছে। কিন্তু শোনার কেউ নেই।

সহজ ব্যাখ্যা

এখানে আল্লামা ইকবাল নিজ হৃদয়ের সাথে কথা বলেছেন। আফসোস, মুসলমানরা স্বয়ং নিজেরাই অন্যদেরকে জাতির দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত

www.pathagar.com

করেছে। মীর জাফর আর মীর সাদেক মুসলমান হয়েও ইসলামের ক্ষতি করেছে। উপমহাদেশের মুসলিম স্বাধীনতাকে ইংরেজ জাতির হাতে তুলে দিয়েছে। যার ফলে বিজাতীয় শাসন শোষণ ছাড়াও মুসলিম জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! মীর জাফর আর মীর সাদেক সে সকল ইংরেজকে সহযোগিতা করেছে, যারা এদের সহযোগিতায় হাজার হাজার মুসলমান ও আলেমকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ইসলাম ও মুসলিম জাতির মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। মুসলমানদের থেকে ছলে বলে কৌশলে রাজ্য-ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আল্লামা জিয়াউর রহমান ফারুকী (র.)-এর ভাষায়, 'ইংরেজ ঐতিহাসিক মিস্টার টমসন তার স্মারকলিপিতে লিখেন, ১৮৬৪ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামকে খতম করার ফন্দি আঁটে ইংরেজরা। উক্ত তিনটি বছর ছিল ভারতীয়দের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক ঘটনাবহুল। উক্ত তিন বছরে ইংরেজরা ১৪ হাজার আলেমকে ফাঁসির কাষ্টে ঝুলিয়েছে।'

মিস্টার টমসনের ভাষায়, 'দিল্লীর চাঁদনীচক থেকে খাইবার পর্যন্ত এমন কোন গাছ ছিল না, যার শাখায় ওলামায়ে কেরামের গর্দান ঝুলেনি।' তিনি আরও বলেন, 'আলেমদেরকে শূকরের চামড়ার ভিতরে ভরে জ্বলন্ত চুলায় দগ্ধ করা হয়েছিল। তামা গরম করে তাদের শরীরে দাগ দেয়া হতো, হাতির ওপর দাঁড় করিয়ে গাছে ঝুলিয়ে নিচ থেকে হাতি সরিয়ে নেয়া হতো। ফাঁসির ফাঁদ পাতা হয়েছিল লাহোরের শাহী মসজিদের বারান্দায়, ইংরেজদের ফাঁসির কাষ্ঠে প্রতিদিন ৮০ জন আলেমকে ঝুলানো হতো। চাটাইয়ের মধ্যে পুরে ৮০ জন আলেমকে রাবী নদীতে নিক্ষেপ করে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হতো।'

মিস্টার টমসন আরোও বলেন, 'আমি দিল্লীতে আমার তাবুর ভিতর প্রবেশ করলে আমার কাছে মুর্দারের দুর্গন্ধ অনুভব হয়। তাই তাবুর পিছনে গিয়ে দেখলাম, সেখানে জ্বলন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গে ৪০ জন আলেমকে উলঙ্গ করে জ্বালানো হচ্ছে। (নাউজুবিল্লাহ) কিছুক্ষণ পরে দেখলাম আরো ৪০ জন আলেমকে আনা হলো এবং আমার সামনেই তাদেরকে বিবস্ত্র করা হলো। ইংরেজরা তাদেরকে সম্বোধন করে বলছিল, 'হে মৌলভীর দল! উক্ত ৪০ জন আলেমকে যেরূপ আগুনে জ্বালানো হয়েছে তোমাদেরকেও অনুরূপ জ্বালানো হবে। তোমাদের মধ্যে কোনো একজনও যদি বলো যে, আমরা আযাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিনি তাহলে এখনই তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।'

মিস্টার টমসন আরোও বলেন, 'আমার সৃষ্টিকর্তা কসম! আমি দেখলাম যে, তাদের একজন আলেমও ইংরেজদের সামনে মাথা নত করেননি। বরং পূর্বের ৪০ জনের ন্যায়ই পরবর্তী ৪০ জনও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে শাহাদাতবরণ

www.pathagar.com

করেন। তাদের কেউই ইংরেজদের কাছে মস্তক অবনত করতে রাজি হলেন না।'

উনত্রিশ.

মুকরিয়াঁ শাখে সনূবর সে গরীযাঁ ভী হুয়েঁ
পাততিয়াঁ ফূল কী ঝড় ঝড় কে পারীশাঁ ভী হুয়েঁ ॥

ওহ্ পুরানী রোশেঁ বাগ কী বীরা ভী হুয়েঁ
ডালিয়াঁ পীরহানে বরগ সে উরইয়াঁ ভী হুয়েঁ ॥

কয়দে মওসূম সে তবী'য়ত রাহী আযাদ উস'কী!
কাশ গুলশান মেঁ সমঝতা কোই ফরইয়াদ উস কী ॥

অর্থাৎ

১. ছনবরের ডানা ছেড়ে ঘুঘুর দলও চলে যাচ্ছে। শুষ্ক হয়ে গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলোও ঝড়ে পড়ছে।

২. আজ ফুল বাগানের পূর্ব বাহার আর নেই। নগ্নখাশাগুলো পাতা দ্বারা আর ঢাকাচ্ছে না যত্ন করে।

৩. বুলবুলিটি এই খারাপ মৌসুমেও গান গেয়ে চলেছে, বাগানে যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি থাকতো তাহলে তাঁর মনের ব্যাখ্যা বুঝতে পারতো।

সহজ ব্যাখ্যা

যদি নাকি বড় বড় নেতারা জাতির খেদমতের স্থানে সরকারের পূজা করেছে। নেতাদের এই গাদ্দারীর কারণে কাওমের বহু লোক ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের তাহজীব ও তামাদ্দুন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের জাতীয় ঐতিহ্য বিলীন হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে মুসলমান উলুম ও ফুনূন থেকে দূর হয়ে গেছে। তারপরও আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাতিকে জাগরণের জন্য বার বার আহ্বান করেছেন। তাঁর এ আহ্বান সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে পুনর্জাগরণের আহ্বান। তিনি অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবের কথা বলেছেন। সর্বদাই জাতির উন্নতির জয়গান গেয়েছেন। যদি জাতি তাঁর (ইকবাল) কালাম পড়তো এবং বুঝতো তাহলে তারা হারানো মানিক ফিরে পেতো আবার জাগরণ ঘটত মুসলমানদের। বিশ্ব দরবারে মুসলিম জাতিই একমাত্র আদর্শ ও অনুসরণীয়

www.pathagar.com

জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো। আল্লামা ইকবালের সেই স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ।

ত্রিশ.

লুতফ মরণে মেঁ হায় বাকী নাহ মযা জীনে মেঁ
কুছ'মযা হায় তূ এহী খুনে জিগর পীনে মেঁ ॥

কেতনে বেতাব হ্যাঁয় জওহার মেরে আয়েনে মেঁ
কেস কদর জাল উয়ে তড়পাতে হ্যাঁয় মেরে সীনে মেঁ ॥

ইস গুলিস্তাঁ মেঁ মাগার দেখনে ওয়ালে হী নেহী
দাগ সীনে মে রাখতে হুঁ ওহ লায়ে হী নেহী ॥

অর্থাৎ

১. না মরণে শান্তি আছে আর না জীবিত থাকায় সুখ ও মজা আছে। কিছু স্বাদ থাকলে তা কেবল হৃদয়ের রক্ত পান করাতে রয়েছে।

২. আমার আয়নায় কত মুক্তা অস্থির, আমার বুকে কত জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

৩. কিন্তু এই বাগানে এই দুর্দশা দেখার মত কেউ নেই, বুকের সে ব্যথা এখন আর কে বুঝবে।

সহজ ব্যাখ্যা

জাতি আজ 'ইহসাসে মিল্লী' সহমর্মিতার বোধ হারিয়ে ফেলেছে, ফলে না মরার মধ্যে তাদের মজা না জীবিত থাকার মধ্যে মজা এটা বোঝার জ্ঞান তাদের নেই। তারা সকাল-সন্ধ্যা একে অপরের রক্ত পান করছে। আর জাতির এ অবস্থার উপর আফসোস করছি, আমার বক্ষে হাজার লক্ষ জযবাত ও খেয়ালাত বের হওয়ার জন্য পেরেশান হয়ে আছে। কিন্তু আফসোস, কাওমের মাঝে এর মূল্যায়ন করার লোক নেই। যদি স্বজাতির প্রতি তার দরদ থাকতো তাহলে সে অন্য ব্যথিত ব্যক্তির দরদ বুঝতে পারতো। তাই মুসলিম জাগরণের মহাকবি আল্লামা ইকবাল জাতির প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য ও মহব্বতের কারণে বার বার নিজ মনের খেদ প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

একত্রিশ.

চাক উস বুলবুলে তানহা কী নাওয়াসে দিল হোঁ
জাগনে ওয়ালে উসী বাঙ্গে দারা সে দিল হোঁ ॥

ইয়া'নী ফের জিন্দাহ নয়ে আহদে ওয়াফাসে দিল হোঁ
ফের উসী বাদায়ে দেরীনা কে পিয়াসে দিল হোঁ ॥

আজমী খুম হায় তু কিয়া, মেয় তূ হেজাযী হায় মেরী
নাগমাহ হিন্দী হায় তূ কিয়া, লে তু হেজাযী হায় মেরী ॥

অর্থাৎ

১. হতে পারে আবার তুর কুহকানে অলস হৃদয় দ্বিতীয় বার জাগ্রত হবে। ঘুমন্ত অলস পথচারী আবার জেগে উঠবে।

২. অর্থাৎ ওফাদারীর নব অঙ্গীকারে অলস অন্তর আবার জিন্দা হয়ে উঠবে। পুরনো সুরা পান করতে আবার হৃদয় ব্যস্ত হবে।

৩. আমি আযমী হিন্দী হলেও আমার সুরা আরব দেশীয়, আমার গজল হিন্দী হলেও সুরটি কিন্তু হেজাজের।

সহজ ব্যাখ্যা

হে প্রভু! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তুমি আমার কথার মধ্যে কবিতায় এমন স্পৃহা সৃষ্টি করে দাও যাতে করে মুসলমানদের অন্তর তার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তারা তাদের ক্ষতির বিষয় বুঝতে পারে। আর পুনরায় তোমার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং তাদের অন্তরে কুরআন ও ইসলামের মুহাব্বত গাঢ় হয়ে যায়।

আমি যদিও আমার কালাম কবিতা রূপে পেশ করলাম, তাতে কি আসে যায়। আমার পয়গামের রূহ তো কুরআন থেকে নির্গত। আর আমি যদিও উর্দু ভাষায় কবিতা লিখেছি কিন্তু তার বিষয় তো ইসলামী। সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের জাগরণের জন্য আমার এ আহ্বান তো তোমার পবিত্র কালামে পাকের বাণীরই সার-সংক্ষেপ। তোমার প্রিয় মাহবুব নবীর পবিত্র জবানে উচ্চারিত বাণীরই পুনরাবৃত্তি করেছি মাত্র।

www.pathagar.com

বত্রিশ.

দিল সে জূ বাত নিকালতী হায় আসর রাখতী হায়
পর নেজী, তাকাঁতে পরওয়ায মগর রাখতী হায় ॥

কুদসিউল আসল হায়, রফআত পে নজর রাখতী হায়
খাকসে উঠতী হায়, গরদূঁ পে গুযার রাখতী হায় ॥

ইশ্‌ক থা ফিতনাগর ওয়া সারকাশ ওয়া চালাক মেরা
আসমাঁ চীর গায়া নালায়ে বে বাক মেরা ॥

অর্থাৎ

১. যে কথা অন্তর থেকে বের হয় অন্যের মনে আছর করে, ডানা না থাকলেও পাখা ছাড়া তা উড়তে পারে।

২. পবিত্র বেহেশতে জন্ম তাঁর, তাই উর্ধ্বে তাঁর নজর থাকে, মাটির তৈরি হলেও উর্ধ্ব আকাশে তা সফর করে।

৩. আমার প্রেম যে বিবাদপ্রিয়, বিদ্রোহী ও অত্যন্ত চতুর ছিল। তাই বাধা না মেনে তীরের গতিতে আকাশ পথে ছুটে চলল।

সহজ ব্যাখ্যা

আমি আমার প্রভুর নিকট শেকায়েত করে ছিলাম, আর তা আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বের হয়েছিল। এজন্য এর মধ্যে অনেক প্রভাব ছিল। ফলে সকল স্তর অতিক্রম করে তা আমলে মালাকুত পর্যন্ত (যে স্থানে ফেরেশতারা অবস্থান করে) পৌঁছে গেল।

তেত্রিশ.

পীরে গরদূঁনে কাহা সুনকে, কাহীঁ হায় কোই!
বোলে সাইয়্যারে, সারে আরশে বরীঁ হায় কোই ॥

চান্দ কাহতা থা, নেহীঁ আহলে যমীঁ হায় কোই!
কাহ কেশাঁ কাহতী থী পূশীদাহ এহীঁ হায় কোই ॥

কুচ জূ সামঝা তূ মেরে শেখওয়ে কো রিজওয়াঁ সামঝা!
মুঝকো জান্নাত সে নিকালা হুয়া ইনসাঁ সামঝা ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ

১. আকাশের শব্দ শুনে ফেরেশতারা বলল, 'কে এসেছে?' গ্রহ বলল, 'হায় তো আরশের কেহ হবে?'

২. চাঁদ বলল, 'না, বরং যমীনের কেউ হবে।' চায়াপথও বলে উঠলো, 'এখানে কেউ আছে।'

৩. কিন্তু আমার শেকায়েত রেজওয়ান ফেরেশতা বুঝে ছিল। আমাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত মানুষই ভেবে ছিল।

সহজ ব্যাখ্যা

ফেরেশতা, গ্রহ, চাঁদ, ছায়াপথ সকলেই পেরেশান হয়ে পড়লো, এ ব্যক্তিকে কেউ চিনলো না। হ্যাঁ, রিজওয়ান ফেরেশতা বুঝতে পারলো যে, কিছু দিন পূর্বে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া আদম (আ.)-এর সন্তান।

চৌত্রিশ.

থী ফেরেশতূঁ কো ভী হায়রত কেহ ইয়ে আওয়ায হায় কিয়া?
আরশ ওয়ালূঁ পেহ ভী খোলতা নেহীঁ ইয়ে রায হায় কিয়া ॥

তা সারে আরশ ভী ইনসাঁ কী তাগ ওয়া তায হায় কিয়া?
আগ্যায়ী খাক কী চটকী কো ভী পরওয়ায হায় কিয়া ॥

গাফেল আদাব সে সুক্কানে যমী কায়সে হ্যাঁয়!
শওখ ওয়া গুসতাখ ইয়ে পাসতী কে মাকী কায়সে হ্যাঁয় ॥

অর্থাৎ

১. ফেরেশতারাও স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ করে এসব কিসের আওয়ায? আরশবাসীরাও বুঝতে সক্ষম হলো না আসল রহস্যটা কি?

২. মানুষ কি করে আরশের উপর আসতে পারে, সাধারণ এই মাটি আবার কীভাবে হল উর্ধ্বগামী?

৩. দুনিয়ার এই মানুষগুলো শিষ্টাচারের নীতি সম্পর্কে তারা এত মূর্খ কিভাবে হলো? কত ভয়ানক দুঃসাহসী রূঢ় ভাষায় কথা বলে।

www.pathagar.com

সহজ ব্যাখ্যা

ফেরেশতারা এই শিকায়াতের ভঙ্গিমা দেখে খুব আশ্চর্য হল। আর এর মধ্যে যে বেআদবী ছিল তা দেখে অত্যন্ত নারাজ হল। সুতরাং তারা বলতে লাগলো, এই জমিনের মানুষও কত বেআদব, বেলেহাজ ও অহঙ্কারী হয়!!

পঁয়ত্রিশ.

এস কদর শওখ কেহ্ আল্লাহ সে ভী বরহম হায়?
থা জু মাস জূদে মালায়েক ইয়ে ওহী আদাম হায় ॥

আলমে কাইফ হায়, দানায়ে রমূযে কম হায়?
হ্যাঁ, মগর আজয কে আসরার সে না মুহরেম হায় ॥

নায হায় তাকাতে গুফতাঁর পেছ ইনসানূ কো!
বাত করনে কা সলীকাহ নেহী নাদানূঁ কো ॥

অর্থাৎ

১. কেমন বেহায়া; স্বয়ং আল্লাহ তাআলার উপর রাগ দেখায়। এরাই কি সেই আদমের সন্তান ফেরেশতাদেরকে যাকে সেজদা করতে হুকুম করা হয়েছিল?!

২. আল্লাহ্ তাআলার কাইফ ও কামের গোপন তথ্যও জানে!? কিন্তু তাদের অক্ষমতার বিষয় সম্পর্কে নিজেরা অজ্ঞ।

৩. মানুষ বাকশক্তি বলে গর্ব করে। কিন্তু নাদান, আহম্মকদের আদবের সাথে কথা বলারও যোগ্যতা নেই।

সহজ ব্যাখ্যা

মানব জাতির বেআদবীকে দেখ যে আল্লাহ্‌র উপর রাগ করে। আরে এরা তো সেই আদম (আ.)-এর সন্তান! যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা এতো বেশি এনাম করেছেন যে, আমাদেরকে সেজদা করতে বলেছেন। বাস্তবেই যদি এরা সেই বনি আদম হয় তাহলে তো বহু নাশুকরীর কথা। তারা মানতিক আর ফালছাফা (যুক্তিতর্ক ও দর্শনবিদ্যা) দুটোতেই পটু কিন্তু কথা বলার আদব ও শিষ্টাচার জানে না।

www.pathagar.com

ছত্রিশ.

আয়ী আওয়ায গমে আঙ্গীয হায় আফ সানাহ্ তেরা
এশকে বেতাব সে লবরীয হায় পায় মানাহ্ তেরা ॥

আসমাঁ গীর হুয়া নারায়ে মুস্তানাহ তেরা
কেস কদর শওখ যবাঁ হায় দিলে দেওয়ানাহ্ তেরা ॥

শোকর শেকওয়ে কো কিয়া হুসনে আদা সে তূনে
হাম সখূন কর দিয়া বন্দুঁ কো খোদা সে তূনে ॥

অর্থাৎ

১. হঠাৎ করে এই আওয়াজ আসলো যে তোমার কেচ্ছা অত্যন্ত দুঃখময়। তোমার অন্তর থেকে উছলে পড়া এই করুন কিচ্ছা কাদায় প্রাণ।

২. তোমার এই কান্নাতে আকাশের হৃদয় কেঁদে উঠে, তোমার এই কান্না অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত।

৩.

৪. তোমার কথার ভঙ্গিতে শিক্ওয়াটি শোকরের রূপ ধারণ করল। আজ তুমি এর দ্বারা বান্দা এবং খোদার মাঝে কথা-বার্তা বলালে।

সহজ ব্যাখ্যা

ফেরেশতারা যখন এই আলোচনা করছিল, হঠাৎ করে আরশ থেকে আওয়াজ আসল, 'হে ইনসান! অবশ্যই তোমার কিচ্ছা অত্যন্ত দুঃখময়। তোমার অন্তর দুঃখে ভরা। তুমি তোমার কথার ভঙ্গিতে শিক্ওয়াকে শোকর দ্বারা পরিবর্তন করে দিলে এবং বান্দাকে খোদার সাথে বাক্যালাপের সুযোগ করে দিলে।

সাঁইত্রিশ.

হাম তূ মায়েলে বহ করম হ্যাঁয়, কোয়ী সায়েল হী নেহী
রাহ দেখলায়েঁ কি সে? রহরওয়ে মানযিল হী নেহী ॥

তাঁরবিয়ত আম তূ হায়, জাওহারে কাবেল হী নেহী
জিস সে তমীঁর হো আদাম কী ইয়ে ওহ গুলহী নেহীঁ ॥

কোয়ী কাবেল হো তূ হাম শান নয়ী দেতে হ্যাঁয়
ঢোন ডনে ওয়ালে কো দুইইয়া ভী নয়ী দেতে হ্যাঁয় ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ

১. আমি দান করতে প্রস্তুত কিন্তু কোন ভিখারীই নেই। আমি কাকে পথ দেখাবো, নিজ মনজিলে যাওয়ার কোন পথিকই তো নেই।

২. তোমার শিক্ষা সকলের জন্যই কিন্তু গ্রহণ করার কোন ছাত্র তো নেই। যে মাটি দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে বানানো হয়েছে, সে মাটিই তো আর নেই।

৩. যোগ্য কোন ব্যক্তি পেলে তাকে আমি রাজার সম্মান দিয়ে থাকি, যারা সঠিকভাবে তালাশ করতে জানে তাদেরকে আমি নতুন জগৎ দিয়ে থাকি।

সহজ ব্যাখ্যা

'হে ইনসান! তুমি শোকর এর ভঙ্গিমাতে যে শিকায়াত করেছো, এখন তার উত্তর শোন। আমি তো সর্বদা রহম করুনা করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আমার নিকট প্রার্থনাকারী তো থাকতে হবে। সকলের লালন পালনের জন্য তৈয়ার কিন্তু যে ব্যক্তি তরবিয়্যাত এবং ইছলাহ গ্রহণ না করে তখন আমি কি করবো। কোন ব্যক্তি বাদশাহ হওয়ার যোগ্যতা থাকলে তাকে আমি রাজত্ব দান করি।'

আটত্রিশ.

হাথ বে যোর হ্যায় এলহাদ সে দিল খোগর হ্যাঁয়
উম্মতী বায়েসে রুসওয়ায়ী পয়গম্বর (সা.) হ্যাঁয় ॥

বুত শেকন উঠ গ্যায়ে বাকী জূ রাহে বুত গর হ্যাঁয়
থা ইব্রাহীম (আ.) পিদর আওর পিসর আযর হ্যাঁয় ॥

বাদাহ আশাম নয়ে বাদাহ নয়া খুম'ভী নয়ে
হরমে কা'বা নেয়া বতভী নয়ে তোম ভী নয়ে ॥

অর্থাৎ

১. তোমাদের বাহু শক্তিহীন আর তোমাদের অন্তর ঈমানহীন, তোমাদেরকে উম্মতী বলতে নবী (সা.)-এরও লজ্জা আসে।

২. মূর্তি ভাঙ্গা দল আজ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, আর যারা আছে তারা হলো মূর্তির কারিগর। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আওলাদ হয়ে এখন তারা আযর সেজেছে কেমন আশ্চর্যের কথা।

www.pathagar.com

৩. এখন শরাব নতুন ও পানকারীরাও নতুন, কা'বাও নতুন মূর্তিও নতুন, তোমরাও নতুন।

সহজ ব্যাখ্যা

কিন্তু হে মুসলমান! তোমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, তোমরা অন্তরে আমাকে অস্বীকারকারী হয়ে গেছ। আর আমার নবী (সা.)-এর শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে গেছ। তোমাদের মধ্যে যে মূর্তি ভেঙ্গে ছিলো সে তো বিদায় নিয়ে গেল। এখন শুধু মূর্তি পূজারী বাকী রয়েছে। তোমরা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার উপর নেই। বরং তোমাদের কা'বাও নতুন, তোমাদের মূর্তি (অর্থাৎ প্রাপ্ত দৌলত) ও নতুন, আর স্বয়ং তোমরাও নতুন।

উনচল্লিশ.

ওহ ভী দিন থে কেহ এহী মায়ায়ে রা'নায়ী থা!
নাযেশে মওসমে গুলে লালাহে চহরায়ী থা ॥

জূ মুসলমান থা, আল্লাহ কা সওদায়ী থা
কভী মাহবূব তোমহারা এহী হারজারী থা ॥

কেসী এক জায়ী সে আব আহদে গোলামী কর লো
মিল্লাতে আহমদে (সা.) মুরসাল কো মাকামী করলো ॥

অর্থাৎ

১. এমনও দিন ছিল যে, তোমরাই ছিলে উৎস যাকে নিয়ে গর্ব করা হতো। গোলাপ ফুলের মৌসুমে জবা ফুলেরও কদর ছিল।

২. খাঁটি মুসলমানরা বাস্তবেই প্রভুর পাগল ছিল। সর্বত্র বিরাজমান এই খোদার পায়েই এক সময় সকলে আত্মদান করে ছিলো।

৩. যাও এখন নতুন কোন এক জায়ীর পূজা কর, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মকে বিশেষ স্থানে বন্দী কর।

সহজ ব্যাখ্যা

কোন এক সময় এমন ছিল যে, প্রত্যেক মুসলমান খোদার আশেক ছিল। আর তারা তাঁর ইবাদত করতো, তাকে মুহাব্বত করতো। আজ তোমরা কোন উচ্চ

www.pathagar.com

পদের অধিকারীকে তোমাদের প্রভু বানিয়ে নাও। তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। সকল মুসলমান এক গোত্র, পরস্পর ভাই ভাই, অথচ তোমরা ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায় কিংবা জাতির সাথে হাত মিলিয়ে কিংবা তাদের ষড়যন্ত্রে মেতে খোদ মুসলমানদেরকেই ধ্বংসের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছ। অর্থাৎ বিশ্বনবীর আদর্শিক ইসলামকে বর্জন করে ভ্রান্তবাদী ইয়াজেদী ভোগ-বিলাসের প্রতি ঝুঁকে পড়েছ। অর্থাৎ ইসলামকে ছেড়ে দিয়ে কুফরকে গ্রহণ করেছ। যাতে আমরাও কাফেরদের মত মাল দৌলতে পরিপূর্ণ হতে পারি।

মুসলিম জাগরণের মহাকবি আল্লামা ইকবাল এখানে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পুরা বিশ্বে বিশ্বনবীর আদর্শিক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে না পারবো, সকল মুসলমান ওহাদাতে মিল্লাতের উপর আমল প্রতিষ্ঠিত হতে না পারবো অর্থাৎ এক কাওম না হবো, ঐ পর্যন্ত আমরা বিশ্ব জয় করতে পারবো না। কেননা সারা বিশ্বের সকল কুফর আমাদের মুকাবেলায় মিল্লাতে ওহাদা রূপ নিয়ে আছে। আর আমরা নানা দল মতে বিভক্ত হয়ে নিজেরা নিজেদেরকেই নানাভাবে ধ্বংসের মাধ্যমে খোদ মুসলমান জাতিকেই ধ্বংসের বিশ্বপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছি।

চল্লিশ.

কিস কদর তোম পে গেরাঁ সুবহ কী বেদারী হায়
হাম সে কব পেয়ার হায়! হাঁ নীনদ তোমহেঁ পেয়ারী হায় ॥

তব'য়ে আযাদ পে কয়দে রমজাঁ ভারী হায়?
তোমহেঁ কাহ দো কে ইয়ে আইনে ওফাদারী হায় ॥

কাওম মাযহাব সে হায়, মাযহাব জু নেহী, তোম ভী নেহীঁ
জযবে বাহাম জু নেহী মাহফিলে আনজুম ভী নেহীঁ ॥

অর্থাৎ

১. সকালে ঘুম থেকে উঠতে তোমার কতইনা কষ্ট লাগে, আমার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? ঘুমই তোমার প্রিয়!

২. তোমার বেপরোয়া স্বভাবের উপর রমজান মাসের বোঝা অত্যন্ত ভারী, তুমিই বলো তো; এটাই কি বিশ্বস্ততার সঠিক প্রমাণ?

৩. ধর্ম দিয়েই মিল্লাত হয়, তাই ধর্ম না থাকলে তোমরাও নেই, আকর্ষণ না থাকিলে চাঁদ, সিতারা, আঞ্জুমান ও সভা সবই বৃথা।

www.pathagar.com

সহজ ব্যাখ্যা

হে মুসলিম জাতি! তোমরা আল্লাহর স্মরণকে ভুলে গেছ। তোমাদের অবস্থা এমন যে তোমরা আমার ইবাদতের উপর আরামের নিদ্রাকেই প্রাধান্য দাও। আর রমজানের রোযাকে বিরাট মুসিবত মনে কর। এটাই কি ওফাদারীর নিয়ম? কওম তো ধর্ম দ্বারা গঠিত হয়, আর তোমরা যখন ধর্ম ছেড়ে দিয়েছ তাহলে কাওম কি করে জিন্দা থাকবে। যেমন চাঁদ ও নক্ষত্রের মাঝে একে অপরের সাথে মিল না থাকলে কোনো নক্ষত্র কি স্ব-স্ব স্থানে টিকে থাকতে পারবে?

একচল্লিশ.

জিন কো আতা নেঁহী দুনইয়া মেঁ কোই ফন, তুম হো
নেহী জিস কাওম কো পরওয়ায়ে নাশীমান, তুম হো ॥

বিজলিয়াঁ জিস মেঁ হোঁ আসূদাহ্ ওহ খিরমন, তুম হো
বেচ খাতে হ্যায় জূ আসলাফ কে মাদফান, তুম হো ॥

হো নেকো নাম জূ কবরূঁ কী তিজারত করকে
কিয়া না বেচো গে জূ মিল জায়েঁ সনম পাত্থর কে ॥

অর্থাৎ

১. এই বিশ্বে তোমরাই শুধু অলস এবং কর্মহারা, তোমরাই সেই জাতি যে, কখনো উচ্চ আসন গ্রহণ করতে চায় না।

২. বজ্রপাতের অনুকূল, তারপরও জীর্ণ গৃহেই পরছে বাজ, আজ তোমরা বাবা দাদাদের কবর বিক্রয় করে খুব খাচ্ছ।

৩. যারা আজ দুনিয়াতে কবর বেচে নিজেকে ধন্য মনে করে, তারা যখন মূর্তি পাবে তখন মূর্তির বেপারী যে হবে না এর কি নিশ্চয়তা আছে?

সহজ ব্যাখ্যা

তোমরা তো দুনিয়াতে কোন বিষয়ই জানো না। না কোন শাস্ত্র না কোন জিনিস আবিষ্কার করতে পার। তোমাদেরই পূর্ব পুরুষদের মান সম্মানের কোন পরওয়া নেই। বরং তোমরা তাদের কবর বিক্রি করে খেয়ে যাচ্ছ। তোমরা নিজেদের কর্ম আর পরিশ্রম ছেড়ে দিয়ে সহজভাবে লোভ-লালসার প্রতি ঝুঁকে

www.pathagar.com

পড়েছ। তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষের বুজুর্গকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গোছাচ্ছো। অন্যের মালের লোভে পড়ে নকল বুজুর্গি সেজে ধান্ধাবাজি করে চলেছ। খোদার কথা ভুল নিজের ভেতরের সুপ্ত শক্তিকে কবর দিয়েছ। আর খোদাকে ছেড়ে ভ্রান্ত পথে সহজ লাভের আশায় মাথা ঠুকছ। তোমরা যখন নিজের স্বার্থের জন্য খোদাকে ছেড়ে দিতে পারো তখন তোমরা মূর্তির ব্যবসাও করতে পারো।

বিয়াল্লিশ.

সাফহায়ে দাহর সে বাতেল কো মিটায়া কিস নে?
নওয়ে ইনসাঁ কো গোলামী সে ছোড়ায়া কিস নে ॥

ম্যারে কা'বে কো জাবীনূঁ সে বাসায়া কিস নে?
ম্যারে কুরআন কো সীনূঁ সে লাগায়া কিস নে ॥

থে তূ আবা ওহ তোমহারে হী, মগর তোম কিয়া হো?
হাথ পর হাথ ধরে মুনতাজেরে ফরদা হো ॥

অর্থাৎ

১. এই জগত হতে বাতেলকে কে দূর করেছে? পুরো মানবজাতিকে গোলামীর কবল থেকে কে ছাড়িয়েছে?

২. কা'বা ঘরে সিজদা করার নিয়ম কে চালু করেছে? আজ বিশ্বাসী বুকে কুরআন ধারণ করাটা শিখলো কার থেকে?

৩. ওরাইতো ছিল তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ, অথচ তোমরা কি হলে? তোমরা তো হাতের উপর হাত রেখে ভবিষ্যতের চিন্তা করছো?

সহজ ব্যাখ্যা

অবশ্যই মুসলমানরাই খোদার নামকে সর্বত্রই উচ্চকিত প্রশংসার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই ভূখণ্ড থেকে সকল ধরনের শিরক, কুফর দূর করেছে, আর মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে রেহাই দিয়েছে। সব সময় তারা খোদার আদেশ পালন করেছে। কাবা শরিফের হেফাজত করেছে। আর কুরআন শরিফের মধুর বাণীর প্রচার প্রসার করেছে। আর এই কাজ তোমাদের বুজুর্গরা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, তারা কঠোর পরিশ্রম করে মুসলিম জাতিকে

www.pathagar.com

বিশ্বনবীর আদর্শিক পথে পরিচালিত করার জন্য আজীবন নিজেদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। অথচ আজ মুসলমানরা সবকিছু ভুলে গিয়ে সহজ উপায়ে সবকিছু হাতের মুঠোয় নেওয়ার জন্য সূক্ষ্ম প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। তারা খোদার সাথেও প্রতারণা করছে। তারা কুরআনের অমোঘ নির্দেশ ভুলে, বিশ্বনবীর আদর্শ ভুলে না ধর্মকে সঠিকভাবে পালন করছে না আদর্শকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরছে। আজ সর্বত্রই মিথ্যা, প্রতারণা, ফাঁকি-জুকি আর বিনা পরিশ্রমে খোদার কাছ থেকে ফললাভের ব্যর্থ আশায় মুসলমান জাতি যেন মরীচিকার পেছনে হাতড়ে ফিরছে। তারা না পারছে বুজুর্গি করতে আর না পারছে কাঠোর শ্রমের দ্বারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে। না পারছে ইসলামের খেদমত করতে।

তেতাল্লিশ.

কিয়া কাহা? বাহ্‌রে মুসলমাঁ হায় ফাকাত ওয়াদায়ে হুর!
শিক্‌ওয়া বেজা ভী কারে কোই তূ লাযেম হায় শুউর ॥

আদল হায় ফাতেরে হাসতী কা আযল সে দসতূর
মুসলিম আইয়েঁ হুয়া কাফের তূ মেলে হুর ওয়া কসূর ॥

তোম মেঁ হুরূঁ কা কোই চাহনে ওয়ালা হী নেহী
জাল ওয়ায়ে তূর তূ মওজূদ হায়, মূসা হী নেহী ॥

অর্থাৎ

১. কে বলেছে যে, মুসলমানদের জন্য শুধু হুরের ওয়াদা, শেকায়েত সঠিক কিনা তোমাদের তো সে অনুভূতি নেই।

২. মহান স্রষ্টার ইনসাফ কখনো বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার অবকাশ নেই। মুসলিম তো আজ হুরের আশাবাদীও নয়, তো তারা কিসের হুর পাবে আর তাই কাফের মুশরিকরা মুসলমানের পথ চলে দুনিয়াতে নানা নেয়ামত পাচ্ছে।

৩. মুসলমানদের মাঝে কোনো ব্যক্তির হুর নেওয়ার আগ্রহ নেই। তুর পাহাড়ের জ্যোতি আজো আছে কিন্তু কোন মুসাই তো নেই।

www.pathagar.com

সহজ ব্যাখ্যা

তোমরা এই শেকায়েত করছ যে, মুসলমানের জন্য শুধু হুরের ওয়াদা কিন্তু কবি বলছেন বাস্তবে তোমাদের মধ্যে হুর নেওয়ার আগ্রহী কোন ব্যক্তিই নেই। যদি থাকতো অবশ্যই খোদার পথে চলতো। আর খোদা সম্পর্কে শেকায়েত করা ঠিক নয়। কেননা খোদা সর্বদা ইনসাফ করেন। কাফেররা দুনিয়ার নিয়ামত এজন্য পেয়েছে যে তারা ইসলামের মূলনীতি গ্রহণ করেছে। বাস্তবে তোমাদের মধ্যে কেউ হুর গ্রহণ করার আগ্রহী যোগ্য ব্যক্তিই নেই। আমি তো আজও রহমত নাজিল করার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু কেউ আমার করুণা ও কৃপা নেওয়ার উপযুক্ত নেই।

চুয়াল্লিশ.

মানফা'আত এক হায় উস কাওম কী, নোকসান ভী এক
এক হায় সব কা নবী দীন ভী, ঈমান ভী এক ॥

হরমে পাক ভী, আল্লাহ ভী, কুরআন ভী এক
কুচ বড়ী বাত থী হোতে জু মুসলমান ভী এক ॥

ফিরকা বনদী হায় কাহীঁ আওর কাহীঁ যাতেঁ হ্যায়!
কিয়া যমানে মেঁ পনপনে কী এহী বাতেঁ হ্যায় ॥

অর্থাৎ

১. মুসলমানের জাতি হিসাবে লাভ ক্ষতি উভয় একই। সকলের নবী এক, দীনও এক, ঈমানও এক।

২. কাবাও এক, আল্লাহও এক, কুরআনও এক। কতই না ভাল হতো যদি মুসলমান অন্তরঙ্গভাবে একে অন্যের সাথে মিলে এক হয়ে যেত।

৩. কিন্তু কোথাও ফেরকাবাজী বা দলাদলি আবার কোথাও জাত্যাভিমান, এভাবে কি মানুষ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

সহজ ব্যাখ্যা

মুসলমানের ধর্ম এক, আল্লাহ এক, নবীও এক, কা'বা শরিফও এক, কুরআন শরিফও এক। যদি পরস্পরের অবস্থাও এক হতো, সকল মুসলমান এক হয়ে যেত তাহলে কতই না ভাল হতো। অথচ এর বিপরীত তোমাদের অবস্থা।

www.pathagar.com

তোমরা বিভিন্ন ফেরকা, জাতি আর গোত্রে বিভক্ত হয়ে গেছ। পৃথিবীতে উন্নতি করার পদ্ধতি কি এটাই?

পঁয়তাল্লিশ.

কোন হায় তারিকে আইনে রাসুলে মুখতাঁর?
মুসলেহাতে ওয়াকত কী হায় কিস কে আমল কা মি'য়্যার।

কিস কী আখোঁ মেঁ সামায়া হায় শেয়ারে আগইয়্যার?
হো গায়ী কিস কী নেগাহ্ তরযে সলফ সে বেযার।

কলব মেঁ সোয নেহীঁ, রূহ মেঁ ইহসাস নেহীঁ
কুছভী পয়গামে মুহাম্মদ কা তোমহেঁ পাস নেহীঁ।

অর্থাৎ

১. আজ তোমাদের মাঝে কে মহানবী (সা.)-এর সঠিক তরিকা মেনে চলছে? তোমরা শুধু সময়মত স্বার্থসিদ্ধি করে নেয়া জান এবং এটাই তোমাদের মুছলেহাতের সময়।

২. আজ কাদের নয়নে শোভা পাচ্ছে অন্য জাতির অনুকরণ? আজ কারা আকাবিরের চালচলনকে ঘৃণার চোখে দেখে?

৩. আজ তোমাদের রূহে কোন অনুভূতি নেই এবং অন্তরে কোন জ্বালাও নেই। মুহাম্মদ আরবী (সা.)-এর পয়গামেরও তোমাদের কাছে কোন মর্যাদা নেই।

সহজ ব্যাখ্যা

তোমরা ইসলামী বিধানের অস্বীকারকারী। তোমাদের ধর্ম শুধু স্বার্থ উদ্ধার করা। যে কাজে ফায়দা নজর আসে তাকে গ্রহণ কর। তোমরা কাফেরদের রুসুম ও প্রথার অনুকরণকে পছন্দ কর। আর নিজ আকাবিরের তরিকা সম্পর্কে অনাগ্রহী হও। না তোমাদের অন্তরে ইসলামের মুহাব্বত আছে, আমাদের নবী (সা.)-এর বাণীর কোন মূল্য আছে?

ছেচল্লিশ.

জা কে হোতে হ্যাঁয় মাসাজিদ মেঁ সফ আরা তো গরীব
যহমতে রোযা জু করতে হ্যাঁয় গাওয়ারা, তৃ গরীব।

www.pathagar.com

নাম লেতা হ্যায় আগার কোঈ হামারা তো গরীব
পরদাহ্ রাখতা হ্যায় আগার কোঈ তোমহারা, তূ গরীব ॥

উমারা নেশায়ে দৌলত মেঁ হ্যাঁয় গাফেল হাম সে
যিন্দাহ হ্যায় মিল্লাতে বয়জা গুরাবা কে দম সে ॥

অর্থাৎ

১. আজ মসজিদে গরীবেরাই গিয়ে নামাজের জন্য কাতার বাধে। আর গরীবেরা কষ্ট করে রোজাও রাখে।

২. গরীবরাই আজ পৃথিবীতে আমাকে স্মরণ করে এবং তোমাদের মধ্যে শুধু গরীবরাই পর্দার বিধান মেনে চলে।

৩. কিন্তু আজ ধনীরা ধন-দৌলতের নেশায় খোদাকে ভুলে গিয়েছে, আজ বিশ্বে ইসলাম জিন্দা আছে গরীব মুসলমানদের দোয়ার বরকতে।

সহজ ব্যাখ্যা

আজ দুনিয়াতে নামাজ পড়ার জন্য যে আসে সে গরীব মুসলমান, রমজান মাসে কষ্ট করে রোজা রাখে তাও গরীব লোক। আমার (খোদার) নাম নেয় তাও গরীব, আর তোমাদের সম্মান রাখে সেও গরীব মুসলমান। ধনী লোকেরা তাদের মালের নেশায় খোদা থেকে একেবারে দূরে। আর আজকে যদি ইসলাম জিন্দা থাকে তাও গরীব মুসলমান সৎকর্মকারীদের জন্য। এছাড়া সকলেই ইসলামের মূল শিক্ষা ছেড়ে এবং বিশ্বনবী (সা.)-এর আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে। এখন মুসলমানরা ধন-দৌলত ও ক্ষমতা লাভের আশায় কুফরী ও প্রতারণার পথ বেছে নিয়েছে। এ অপশিক্ষা ও অনিষ্টকারী মনোভাব তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে।

সাতচল্লিশ.

ওয়াবেজে কাওম কী ওহ্ পোখতা খায়ালী না রাহী
বরকে তবয়ী না রাহী শোলা মাকালী না রাহী ॥

রাহ্ গায়ী রুসমে আযাঁ, রুহে বেলালী না রাহী
ফালসাফা রাহ্ গায়া তালকীনে গাযালী না রাহী ॥

মাসজিদেঁ মরসিয়া খাঁ হ্যায় কে নামাযী না রাহে
ইয়ানে ওহ্ সাহেবে আওসাফে হেজাযী না রাহে ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ

১. আজ ইসলামী চিন্তা-ধারার বক্তাগণের বক্তৃতার কোন দৃঢ় চিন্তা-ধারা ও আধ্যাত্মিকতার ঈমানী তেজোদীপ্ততা নেই, জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর নেই।

২. আজ আজান দেওয়ার ধারা প্রচলিত আছে, কিন্তু হযরত বেলাল (রা.)-এর মতো প্রেমের প্রাণবন্ত কণ্ঠধারা তো নেই। আজ দুনিয়াতে দর্শনশাস্ত্র আছে, কিন্তু ঈমাম গাযালীর দার্শনিক মত ও সূফি প্রেমিক আর নেই।

৩. আজ মসজিদগুলো কাঁদছে, হায়! কেউ ঐরূপ নামাজ পড়ার মত ঈমানদার নেই। অর্থাৎ মুহাম্মদী গুণের প্রেমাস্পদে মত্ত নামাজী তো আর নেই।

সহজ ব্যাখ্যা

আজ মুসলিম বক্তার ওয়াজের মধ্যেও কোন তাছির ও ফয়েজ বরকত নেই, না তাদের অন্তরে ইসলামের কোন মুহাব্বত আছে? না বিশ্বনবীর প্রতি তাদের প্রেমিক হৃদয় আছে? আর না আছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল অন্তকরণ। আযান তো এখনও হয়! কিন্তু তার মধ্যে না আছে বেলালের ইখলাছ, প্রেম আর না আছে ইসলামের প্রতি মুহাব্বতের রং। দর্শনশাস্ত্র ও জ্ঞানের অন্বেষায় মুসলমানের অগ্রগতির শেষ নেই, কিন্তু ইমাম গাযালীর মতো দার্শনিক ও সাধক প্রেমিক নেই। আজ মুসলমান দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা তো পড়ে কিন্তু তাতে নবীর মুহাব্বত তাদের অন্তরে পয়দা হয় না। এ কারণেই দিন দিন মসজিদগুলো বিরান হয়ে যাচ্ছে। তাতে নামাজীতে ঠাসা আছে ঠিকই কিন্তু প্রকৃত নামাজীর উপস্থিতি নেই বললেই চলে।

আটচল্লিশ.

শোর হ্যায় হো গায়ে দুনইয়া সে মুসলমাঁ নাবুদ!
হাম ইয়ে কাহতে হ্যায় কেহ থে ভী কাহীঁ মুসলিম মওজূদ ॥

ওজাআ' মেঁ তুম হো নাসারা, তূ তামাদ্দুন মেঁ হনূদ
ইয়ে মুসলমাঁ হ্যাঁয়, জিন হেঁ দেখকে শরমায়ে ইয়াহুদ ॥

য়ু তূ সাইয়্যেদ ভী হো, মির্যা ভী হো, আফগান ভী হো
তুম সবহী কুচ হো, বাতাও তূ মুসলমান ভী হো? ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ

১. আজ পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে গেছে, মুসলমানে এই জগত ছেয়ে যাচ্ছে। আমি বলি, বিশ্বনবীর আদর্শবাদী প্রকৃত মুসলমান কোথাও ছিল কি?

২. তোমার চালচলনে খৃস্টান, ইহুদী ও হিন্দুর বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, আজ তোমরা এমন মুসলমান, তোমাদের অধঃপতনের দিকে তাকালে যেন ইহুদীরা ও নাসারাগণও লজ্জা পায়।

৩. হতে পার তুমি সাইয়্যেদ, মির্যাও হতে পার। তুমি আফগানীও হতে পার। তুমি সব কিছু হতে পার, কিন্তু বলোতো তুমি সত্যিকার মুসলমান কি না? তোমার ভেতরে নবী প্রেমও নেই আর আল্লাহর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসও নেই।

সহজ ব্যাখ্যা

আজ চতুর্দিকে আওয়াজ উঠেছে, দুনিয়া মুসলমানে ছেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, সাচ্চা ঈমানওয়ালা কিংবা বিশ্বনবীর আদর্শের অনুগামী মুসলমান আছে কোথায় যে দুনিয়া ছেড়ে যাবে? যারা আজ নিজেকে মুসলমান বলে, তাদের অবস্থা এমন যে তারা লেবাস-পোশাকে খৃস্টান আর তামাদ্দুন ও সংস্কৃতিতে হিন্দু বলে মনে হয়। আর লেনদেনে ইহুদীদের থেকেও নিকৃষ্ট। এ যেন ইহুদী ও নাসারা জাতির চাইতেও লজ্জাকর অবস্থায় রয়েছে। খান্দানের হিসাবে তোমরা সাইয়্যেদও হতে পার, মির্যাও হতে পার, আফগানীও হতে পাব; কিন্তু প্রশ্ন হলো তোমরা কি প্রকৃতই মুসলমানও কি না? সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

উনপঞ্চাশ.

দমে তাকবীর খী মুসলিম কী সদাকাত বেবাক
আদল উস.কা খা কওবী, লাওসে মুরা'আত সে পাক ॥

শাজারে ফিতরাতে মুসলিম খা হায়া সে নিম নাক
খা শাজাআত মে ওহ এক হাসতি ফাওকাল ইদরাক ॥

খোদ গুদাযী নেমে কায়ফিয়তে ছহবায়েশ বুদ
খালী আয খেশ গুদান সূরতে মীনায়েশ বুদ ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ

১. কথাবার্তায় সত্য বলা সব সময় মুসলমানদের স্বভাব ছিল। তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার ছিল পক্ষপাত মুক্ত।

২. মুসলমানের স্বভাবে লজ্জাশীলতা ছিল। আবার বীরত্বে তাদের অবস্থান ছিল ধারণারও উর্ধ্বে।

৩. আত্মরূপ প্রকাশ করা যেমন তাদের অন্তরের গভীর অনুভূতি ছিল শরাবে মত্ত আশেকের আকুলতাপূর্ণ। তেমনি তারা আবার পান পিয়ালার রিক্ত অনুভূতি ত্যাগেও অতুলনীয় দৃষ্টান্তের অধিকারী ছিল। তারা যেমন বীরত্বে নির্ভীক চিত্তে প্রাণ বিসর্জন দিতে পিছপা হতো না, তেমনি খোদার প্রেমের শরাব পানেও তাদের ভূমিকা ছিল নজিরবিহীন।

সহজ ব্যাখ্যা

প্রথম যুগের মুসলমানের অবস্থা ছিল এই যে, তারা সত্য বলতে কখনো ভয় পেতো না। তারা সকলের সাথে ইনসাফ করতো। মুসলমান খোদার প্রেমে বিভোর থাকতো। ফলে তারা প্রভুর জন্য সব কিছু কোরবান করতো এবং অন্যদের জান বাঁচানোর জন্য নিজের জান কুরবান করতে প্রস্তুত থাকতো। কিন্তু মুসলমানদের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধঃপতন ঘটেছে। তারা আজ নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় নিমজ্জিত হয়েছে।

পঞ্চাশ.

হার মুসলমাঁ রাগে বাতিল কে লিয়ে নিশতর থা
উসকে আয়নায়ে হাসতী মেঁ আমল জাওহার থা ॥

জো ভরোসা থা উসে কুওয়্যতে বাযু পর থা
হায় তোমহেঁ মওত কা ডর, উস কো খোদা কা ডর থা ॥

বাপ কা ইলম না বেটে কো আগার আযবর হো
ফের পিসর কাবেলে মীরাসে পিদর কেউ কার হো ॥

অর্থাৎ

১. প্রত্যেক মুসলমান বাতিল শক্তির মোবাবেলায় উন্মুক্ত অস্ত্র ছিল। তাদের জীবনের নীতি ছিল কার্যকরী।

www.pathagar.com

২. তাদের সব সময় নিজ বাহু বলের উপর আস্থা ছিল। আর তোমাদের কাছে শুধু মৃত্যুর ভয় অথচ তাদের ছিল খোদার ভয়।

৩. যদি ছেলে পিতার গুণে গুণান্বিত হতে না পারে, সে ছেলে পিতার মিরাস নেওয়ার যোগ্য কি করে হবে? যদি সুফি বুজুর্গদের গুণবৈশিষ্ট্য তোমাদের ভেতরে না থাকে তবে তোমরা কি করে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

সহজ ব্যাখ্যা

প্রত্যেক মুসলমান সব সময় কুফর ও ভ্রান্ত শক্তির মোকাবেলায় কার্যকর ও কর্মঠ ছিল। তাদের ভরসা ছিল খোদার উপর এবং তাদের বাহুর উপর। আর তোমরা ভয় পাচ্ছ মৃত্যুকে আর তারা ভয় পেতো খোদাকে। যদি তোমাদের মধ্যে তোমাদের আকাবিরের মত ছিফাত গুণ না থাকে তাহলে তোমরা কি করে সেই ইজ্জত সম্মান অর্জন করবে? যা শুধুই ছিল ঐ বুজুর্গদের অর্জন মাত্র।

একান্ন.

হার কোয়ী মাসতে মায়ে জাওকে তন আসানী হায়
তুম মুসলমাঁ হো? ইয়ে আনদাযে মুসলমানী হায়? ॥

হায় দারী ফকর হায়, নায় দৌলতে ওসমানী হায়
তুম কো আসলাফ সে কিয়া নিসবতে রূহানী হায়? ॥

ওহ যমানে মেঁ মুআযযায থে মুসলমাঁ হো কর
আওর তুম খার হুয়ে তারেক কুরআঁ হো কার ॥

অর্থাৎ

১. আজ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশ্বনবীর আদর্শ ভুলে আরাম আয়েশে লিপ্ত। তোমরা কিসের মুসলমান, এটা কি মুসলমানের শান?

২. তোমাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)-এর দরিদ্রতার রূপও নেই, আর হযরত ওসমান (রা.)-এর দৌলতের নিশানাও নেই। তোমরা আধ্যাত্মিক শক্তি বঞ্চিত প্রেমহীন নিরস ইবাদতের অহঙ্কারে নিমজ্জিত। তোমরা যেন আজ আসলাফ ও আকাবিরের সাথে রূহানী সম্পর্কহারা, ভ্রান্ত পথ ও মতের অনুসরণে মুসলমান জাতি আজ বিভ্রান্তির চরম সীমায় উপনীত।

www.pathagar.com

৩. মুসলমানরা এক সময় বিশ্বনবীর অনুপম আদর্শ ও রূহানী শক্তির দ্বারা বিশ্বের সম্মান ও মর্যদাপূর্ণ জাতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিল প্রকৃত মুসলমান হয়ে, আর তোমরা কুরআন নবীর আদর্শচ্যুত হয়ে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হচ্ছো প্রতিনিয়ত।

সহজ ব্যাখ্যা

তোমরা প্রত্যেক মুসলমান আজ আরাম-আয়েশের পূজারী। না তোমাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)-এর মত দরিদ্রতার রূপ-রেখা আছে। না হযরত ওসমান (রা.)-এর মত ধন-দৌলত আছে? তোমাদের পূর্ববর্তীদের যে সম্মান তা এজন্য যে, তারা বিশ্বনবীর আদর্শের অনুসরণকারী সঠিক মুসলমান ছিলেন, তাদের রূহানী ও ঈমানী শক্তির উৎস ছিল নবীর প্রেম ও খোদার প্রতি গভীর আনুগত্যশীল হৃদয় আর তোমরা লাঞ্ছিত-অপমাণিত হচ্ছো এজন্য যে, তোমরা সেই সঠিক ও আদর্শিক পথ পরিহার করে ভ্রান্ত ও শয়তানের পথ বেছে নিয়েছো। এখনও সময় আছে সঠিক ইসলামের পথে, বিশ্বনবীর দেখানো ও সাহাবায়ে কেরামগণের প্রদর্শিত পথে নিজেদের কায়েম কর নইলে শীঘ্রই ধ্বংসই মুসলমানদের নিত্য পরিণতির অংশরূপে গণ্য হবে।

বাহান্ন.

তুম হো আপস মেঁ গজব নাক, ওহ আপস মেঁ রহীম
তুম খাতাকার ওয়া খাতাবী, ওহ খাতা পোশ ওয়া কারীম ॥

চাহতে সব হ্যাঁয় কে হোঁ অওজে সুরাইয়া পে মুকীম
পহলে ওয়ায় সা কোই পয়দা তূ করে কলবে সালীম ॥

তখতে ফাগফুর ভী উন কা থা, সারীর কে ভী
যুহী বাঁতে হায় কে তুম মেঁ ওহ হামিয়্যাত হায় ভী? ॥

অর্থাৎ

১. আজ তোমরা সকলে একে অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ, নানা দল মতে বিভক্ত হয়ে আজ তোমরাই মুসলমান মুসলমানের ঘোরতর শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ, অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীরা একে অন্যের সাথে মিল-মহব্বতের জীবন কাটাতো। তোমরা বিশ্বনবীর আদর্শচ্যুত হয়ে একে অন্যের দোষ ত্রুটি খোঁজায় ব্যস্ত, আর তোমাদের পূর্বসুরীরা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন।

www.pathagar.com

২. আজ তোমরা আল্লাহর দীনকে বর্জন করে শয়তানের তাবেদারী করার দ্বারা সকলেই উর্ধ্বাকাশে বাস করতে চাও, কিন্তু এর জন্য তো সর্বপ্রথম সেই ধরনের গুণ অর্জন করতে হবে।

৩. তোমাদের পূর্ববর্তীরা তো নিজেদের বৈশিষ্ট্য গুণে ইরানের তাজ এবং কায়সারের সিংহাসন লাভ করেছিলেন। আর তোমরা তাদের আওলাদ হয়ে কি করছ? এখন এ সব কথা মূল্যহীন, বাস্তব কথা হল তোমাদের মধ্যে মর্যাদার অনুভূতিও নেই।

সহজ ব্যাখ্যা

মুসলমানরা আজ একে অন্যের দুশমন, তারা নানা দল মতে বিভক্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। আর অন্যান্য জাতিরা তাদের ধ্বংসের তামাশায় আনন্দ পাচ্ছে। মুসলমানদের মাঝে পূর্ববর্তীদের ঈমানী চেতনাও নেই আর সেই আদর্শও নেই। অথচ তাদের পূর্ববর্তীদের যেমন আদর্শ জীবন ছিল তেমনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল অন্তর ছিল। তারা ছিলেন নবীর প্রকৃত উত্তরসূরী। তাদের অন্তর ছিল একে অন্যের প্রতি দয়াশীল, সাহায্যকারী ও ভ্রাতৃসুলভ। অথচ আজ নানা আক্বিদায় বিভক্ত হয়ে মুসলমানরা যেন একে অন্যকে কতল করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এতে তারা নিজেরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন। তারা মহানবীর আদর্শের অনুসরণ ছেড়ে শয়তানের বৈশিষ্ট্য লালন করে একে অন্যের দোষ তালাশ করার জন্য মরিয়া, অথচ তাদের পূর্ববর্তীরা একে অন্যের দোষ ঢেকে দিয়ে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরিতে সিদ্ধহস্ত ছিল। তোমাদের মধ্যে ইসলামের ঝান্ডা উঁচু করার ইচ্ছা তো আছে, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে পূর্ববর্তীদের মতো ইসলামের সঠিক মহাব্বত, বিশ্বনবীর আদর্শ ও ঈমানী শক্তি আছে কি?

তিপ্পান্ন.

খোদ কাশী শেওয়াহ তুমহারা, ওহ গুয়ূর ওয়া খোদ দার
তুম উখুওয়াত সে গারীযা, ওহ উখওয়াত পে নেছার ॥

তুম হো গোফতাঁর সারাপা ওহ সারাপা কেরদার
তুম তরসতে হো কলী কো, ওহ গুলিসতা বকিনার ॥

আব তলক ইয়াদ হায় কওমূঁ কো হেকায়াত উনকী
নকশ হায় সফহায়ে হাসতী পে সাদাকাত উন কী ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ

১. তোমরা সকলে আত্মঘাতি আর তারা ছিল আত্মমর্যাদাশীল। তোমরা ভ্রাতৃত্ব ধ্বংস করছ আর তারা ভাইয়ের জন্য প্রাণ বিলিয়ে দিতো।

২. তোমরা সকলে কথা ও গল্পের পটু আর তারা ছিল কর্মবীর। তোমরা শুধু মুকুল ও কুড়ি নিয়ে ব্যস্ত আর তারা ছিল বাগানের মালিক।

৩. আজ পর্যন্ত তাদের এই কিচ্ছা-কাহিনি বিশ্ববাসীর জানা আছে। আজও সৃষ্টির বুকে তাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বগৌরবের সাথে লেখা আছে।

সহজ ব্যাখ্যা

আজ তোমরা নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংস করছ, বোমা মেরে মসজিদে নামাজীদের প্রাণ হরণ করছ, আবার আক্বিদার কারণে নিরীহ মুসলমানকে কতল করতে আতৃতায়ীর বেশ ধারণ করছ। অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীরা ভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তির প্রতীক রূপে নিজেদের আত্মসম্মান ও মর্যাদাকে সমগ্র দুনিয়ার সামনে সমুন্নত রেখেছিল। আজ তোমরা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে একে অন্যের ক্ষতি কর, অথচ তারা অন্যের জন্য জান বিলীন করে দিতো। তোমরা শুধু কথায় পাকা কিন্তু তারা কথা ও কাজে কর্মবীর ছিল। আজ তোমরা ধন-দৌলত ও ক্ষমতার লোভে পথভ্রষ্টদের পথ অনুসরণ করছ অথচ তারা বিশ্বনবীর প্রতি প্রেম ও আদর্শের নজীর স্থাপন করেছিল। সেজন্য সমস্ত ধন-দৌলত ও কতৃত্ব তাদের পদ চুম্বন করতো। অথচ তোমরা সে আদর্শ ও প্রেমকে বিসর্জন দিয়ে ধন-দৌলত ও ক্ষমতার পেছনে ছুটে মিথ্যে মরীচীকার স্বপ্নে বিভোর। তাই আজও ইতিহাস তোমাদের পূর্ববর্তীদের মর্যাদা ও গৌরবোজ্জ্বল কর্মের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে অনন্ত সময় ধরে।

চুয়ান্ন.

মিসলে আনজুম উফুকে কাওম পে রওশন ভী হুয়ে
বুতে হিন্দী কি মুহাব্বাত মেঁ বারহমান ভী হুয়ে ॥

শওকে পরওয়ায মেঁ মাহজুরে নাশীমান ভী হুয়ে
বে আমল থে হী জাওয়াঁ দীন সে বদ জন হুয়ে ॥

উনকো তাহজীব নে হার বনদ সে আযাদ কিয়া
লা কে কা'বে সে সনম খানে মেঁ আবাদ কিয়া ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ

১. তোমাদের অবস্থা এমন যে আমি তোমাদের কে বাদশাহী, রাজত্ব দিয়েছি কিন্তু তোমরা বিশ্বনবীর সঠিক ইসলাম ছেড়ে ভ্রান্ত পথকে গ্রহণ করেছ। নবী (সা.)-কে ছেড়ে হিন্দুস্থানের মোহগ্রস্ত সংস্কৃতিকে মহব্বত করা শুরু করেছ।

২. দুনিয়ার উন্নতির আশায় আপন ধর্মের নিশান ছেড়ে দিয়েছ। প্রথমে তো আমল বিহীন ছিলে, এখন ধর্ম থেকে দূরে চলে গেছ।

৩. বর্তমানে তোমাদের অবস্থা হলো, বিশ্বনবীর আদর্শিক ইসলাম ছেড়ে একেবারে আযাদ হয়ে গেছ। আর মসজিদ ছেড়ে বাজার ও ক্লাব আর বুজুর্গানে দ্বীনের আদর্শ ছেড়ে খানকায় বসে মিথ্যে বুজুর্গির আবাদ করা শুরু করেছ।

পঞ্চান্ন.

কায়স যাহমত কাশে তানহায়ী সহরা না রাহে
শহর কী খাই, বাদিয়াহ পয়মা না রাহে।

ওহ তূ দীওয়ানা হায়, বসতী মেঁ রাহে ইয়া না রাহে
ইয়ে জরুরি হায়, হিজাবে রুখে লায়লা না রাহে।

গেলায়ে জুর না হোঁ শিক্‌ওয়ায়ে বেদাদ না হো
ইশক আযাদ হায়, কিও হুসন ভী আযাদ না হো।

অর্থাৎ

১. মুসলিম যুবকের অবস্থা হচ্ছে তাদের হৃদয় নবী (সা.)-এর মুহাব্বত হতে খালী। তারা আজ লোভ-লালসায় মোহগ্রস্ত।

২. মুসলমান মেয়েরা শরয়ী বিধান দিন দিন ছেড়ে দিচ্ছে। আজ হিজাবের ব্যবহার আছে ঠিকই কিন্তু লাইলির মতো আশেক নেই।

৩. যুবতী মেয়েরা বলছে, ছেলেরা যখন পর্দা করছে না, আমরা কেন পর্দা করবো। তারা আল্লাহর মহব্বত থেকে দূরে সরে গেছে আর প্রবৃত্তির গোলামীকে মহব্বত হিসেবে গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

ছাব্বান্ন.

আহদে নও বারক হায়, আতেশে যনে হার খারমান হায়
আবমন উস সে কোয়ী সহরা, না কোয়ী গুলমান হায় ।

ইস নয়ী আগকা, আকওয়ামে কাহন ইনধন হায়
মিল্লাতে খতমে রসূল শো 'লায়ে পীরাহান হায় ।

আজ ভী হো জু ইবরাহীম কা ঈমাঁ পয়দা
আগকর সেকতী হায় আনদাযে গুলিস্তা পয়দা ।

অর্থাৎ

১. বর্তমান আধুনিক যুগ যেখানে বস্তু অত্যন্ত উন্নতীর দিকে চলছে, যা সকল জাতির জন্য একই ধরনের ধ্বংস।

২. এটা ঐ ধরনের অগ্নি যা দ্বারা অতি তাড়াতাড়ি মুসলিম সম্প্রদায় ধ্বংস হতে চলেছে। যদি মুসলমান এ আধুনিকতার পরিবর্তনকে বুঝতে না পারে তবে বিশ্বনবীর উম্মতগণই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৩. হ্যাঁ, এখন যদি মুসলমানের মধ্যে ইবরাহীম (আ.)-এর ন্যায় ঈমানের রং সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে এই আগুনই তাদের জন্য গুলজারে ইবরাহীম (ইবরাহীমের ফুল বাগানে) হয়ে যাবে।

সাতান্ন.

দেখ কর রঙ্গে চমন হো নাহ পারীশাঁ মালী
কাওকাবে গনচাহ সে শাখেঁ হ্যাঁয় চমকনে ওয়ালী ।

খাঁস ওয়া খাশাক সে হোতা হায় গুলিস্তা খালী
গুল বরান্দায হায় খুনে শুহাদা কী লালী ।

রং গুরদূঁ কা যারা দেখতু আন নাবী হায়
ইয়ে নেকা লতে হুয়ে সূরাজ কী উফুক তা বী হায় ।

অর্থাৎ

১. মিল্লাতে ইসলামিয়ার করুণ অবস্থা দেখে মুসলমানদেরকে নিরাশ হতে হবে না, মুসলমানদের মুসীবত বেশি দিন থাকবে না।

www.pathagar.com

২. অতি নিকটেই এ উম্মতের জয় হবেই, ইনশাআল্লাহ্ শহীদের রক্ত কোন দিন বৃথা যাবে না।

৩. পূর্বদিগন্ত আলো করা নতুন রবিরশ্মির মতো মুসলমানের মধ্যে নতুন জাগরণ দেখা যাচ্ছে।

সহজ ব্যাখ্যা

বন্ধুগণ! মুসলিম জাগরণের মহাকবি আল্লামা ইকবাল এ কবিতার মাধ্যমে পতিত মুসলিম জাতিকে আশার বাণী শুনাচ্ছেন। তিনি বলছেন, মুসলিম জাতির এ করুণ অবস্থা চিরদিন থাকবে না। আল্লাহপাক হয়তো সাময়িক মুছিবত দিয়ে তাদের পরীক্ষা করছেন কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি মুসলিম জাতির প্রতি দয়ার ভাণ্ডার খুলে দেবেন। মুসলিম জাতির করুণ বিপর্যয়কর অবস্থার বর্ণনা শেষে কবি জাতির হালাকত ও বরবাদীর দাস্তান শুনানোর পর বলেছেন, মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা অচিরেই মুছিবত শেষ হয়ে উম্মতের জয় হবেই। ইনশাআল্লাহ।

আটান্ন.

উম্মাতেঁ গুলশানে হাসতী মেঁ সামার চীদাহ্ ভী হ্যাঁয়
আওর মাহরূমে সামার ভী হ্যাঁয় খাযাঁ দীদাহ ভী হ্যাঁয় ॥

সায়কড়োঁ নাখল হ্যাঁয়, কাহীদাহ ভী, বালীদাহ ভী হ্যাঁয়
সায়কড়োঁ বাতনে চমন মেঁ আভী পূশীদাহ্ ভী হ্যাঁয় ॥

নখলে ইসলম নমূনা হায় বরোমনদী কা।
ফল হায় ইয়ে সায়কড়োঁ সদয়ু কী চমন বনদী কা ॥

অর্থাৎ

১. বাগানের অনেক গাছে ফল হয়, অনেক গাছে ফল হয় না। শীতে শুকিয়ে যায়।

২. বহু খেজুর গাছ দুর্বল ও পুরনো হয়ে যায়। অনেক গাছে ফুল ও ফল এখনো গোপনই আছে।

৩. ইসলামের খেজুর গাছে ফল ধরার নমুনা রয়েছে। শত বছরের বাগান চর্চার কারণে তাতে ফল হয়।

www.pathagar.com

সহজ ব্যাখ্যা

যদিও বর্তমান মুসলিম বাস্তবেই বহু পেরেশান, তথাপি নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। যেমনিভাবে পূর্বের বিভিন্ন জাতি ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের খেদমত করেছে, সামনেও এমনিভাবে ইসলামের নতুন নতুন দা'ঈ জন্ম দিবে এবং ইসলামের প্রসার করবে।

উনষাট.

পাক হায় গরদে ওয়াতন সে সারে দামাঁ তেরা
তূ ওহ্ ইউসূফ হায় কে হার মিসর হায় কেন আঁ তেরা ॥

কাফেলা হো না সাকে গা কভী বীরাঁ তেরা
গায়রে এক বাঙ্গে দারা কুচনেহী সামাঁ তেরা ॥

নখলে শমা আসতীওয়া দর শো'লা দূদ রিশায়ে তূ
আকিবাত সূয বূদ সায়ায়ে আনদীশায়ে তূ ॥

সহজ ব্যাখ্যা

হে মুসলমান! এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, মুসলমান জাতি খাছ্ কোন স্থান বা দেশের সাথে সীমাবদ্ধ নয় যে, যদি ঐ ওতন বা বংশ বা দেশ ধ্বংস হয়ে যায় তবে মুসলমান ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি ইউসুফের মতো তোমার কেনান রাজত্বও আছে আবার তুমি মিসরের রাজ প্রাসাদেরও অধিকারী। সুতরাং সারা বিশ্ব মুসলমানের রাষ্ট্র। ইসলাম কখনো শেষ হতে পারে না পৃথিবী থেকে। হে মুসলিম জাতি! তোমরা দুনিয়ার জন্য বাতির মত, তোমাদের আলোর কারণে আজ মানবকুল চলছে। যদি আজ মুসলমান পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে যায় পৃথিবী অচল হয়ে যাবে। তোমাদের কাজ শুধু পরকালের ফিকির তারপর তোমরা অবশ্যই দুনিয়াতে কামিয়াব হবে।

ষাট.

তূ না মিট জায়েগা ইরাঁ কে মিট জানে সে
নেশায়ে ম্যায় কো তাআল্লুক নেহী পয়মানে সে ॥

আয় আয়াঁ ইউরোশে তাতাঁর কে আফসানে সে
পাসবাঁ মিল গ্যায়ে কা'বে কো সনম খানে সে ॥

কাশতীয়ে হক যমানে মেঁ সাহারা তু হায়
আসরে নওরাত হায় ধন্দলা সা সিতারা তু হায় ॥

www.pathagar.com

অর্থ ও ব্যাখ্যা

যখন তোমাদের অস্তিত্ব হলো এই ভূ-খণ্ড টিকে থাকার কারণ, তাহলে তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। ইরান, ইরাক, আফগান ধ্বংস হওয়ার কারণে তুমি মিটে যাবে না। কেননা শরাব ও মদের নেশার সাথে বোতল ও পিয়ালার কোন সম্পর্ক নেই। এভাবে মুসলমানতো পুরো বিশ্বে টিকে আছে, ইসলামের অস্তিত্ব ইরান ও ইরাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদি তোমার প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তুমি আব্বাসিয়া রাজত্বের ইতিহাস অধ্যয়ন কর। বাগদাদ ধ্বংস হয়ে গেল? কখনো নয়। যে তুর্কীরা আব্বাসী রাজত্ব ধ্বংস করেছে তারাই পরবর্তী সময়ে ইসলামের মুহাফেজ হয়েছে। তোমরা ইসলামের নৌকার চালক, তাই বর্তমান জাতিও তোমাদের থেকে উপকৃত হবে।

একষট্টি.

হায় জূ হাঙ্গামা বপা ইউরোপে বুলগারী কা
গাফেলূঁ কে লিয়ে পয়গাম হায় বেদারী কা।

তূ সমঝতা হায় ইয়ে সা মাঁন হায় দিল আযারী কা
ইমতিহাঁ হায় তেরে ঈসার কা, খোদদারী কা।

কেউ হারাসাঁ হায় সাহীলে ফারাসে আদা সে
নূরে হক বুঝ না সাকেগা নাফাসে আদা সে।

অর্থ ও ব্যাখ্যা

মুসলমান পৃথিবী থেকে ধবংস হয়ে যাবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। মুসলমানরা হয়তো বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে এই বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। আজ যদি কেউ (১৯১৩-১৪ ইং) বলকানের রাজা তুর্কীর উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে তাহলে অর্থতো এটা নয় যে, তুর্কী শেষ হয়ে যাবে। বরং নতুন করে জেগে ওঠার বার্তা। মুসলমানদের এই করুণ পরিণতির থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। মুসলমান পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে এমনটা না ভেবে বরং মহান প্রভু মুসলিম জাতিকে মহা পরীক্ষার মধ্যে রেখেছেন তাই সঠিক ইসলাম ও বিশ্বনবীর আদর্শের অনুসরণ করলেই এ জাতি মুক্তি পাবে। মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলছেন, তোমরা অমুসলিমদের সংখ্যা বেশি দেখে ভয় পাচ্ছ কিনা? বিশ্বাস রাখ যে, তারা ইসলামকে দুনিয়া থেকে বিদায় করতে পারবে না। কারণ মুসলিম জাতির ঈমানী শক্তি ও আল্লাহর সাহায্যই তাদেরকে টিকিয়ে রাখবে।

www.pathagar.com

বাষট্টি.

চশমে আকওয়াম সে মাখফী হায় হাকীকত তেরী
হায় আভী মাহফেলে হাস্তী কো জরুরাত তেরী ॥

যিন্দাহ রাখতী হায় যমানেঁ কো হারারাত তেরী
কাওকাবে কিসমাতে এমকাঁ হায় খেলাফাত তেরী ॥

ওয়াকতে ফুরসত হায় কাহাঁ কাম আভী বাকী হায়
নূরে তাওহীদ কা ইতমাম আভা বাকী হায় ॥

অর্থ ও ব্যাখ্যা

হে মুসলমান! দুনিয়ার ঐ সকল জাতি যারা তোমাদেরকে শেষ করতে চায়, তারা বাস্তবে এই রহস্য থেকে অজ্ঞ যে এখানে দুনিয়ায় তোমাদের প্রয়োজন আছে। এই পৃথিবী শুধু তোমাদের কারণে টিকে আছে। দুনিয়াতে ইসলামের বিজয় হওয়া অনিবার্য, এই সিদ্ধান্তকে কোন শক্তি পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই তোমরা চলো পুরো বিশ্বকে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান কর। বিশ্বনবীর আদর্শের অনুসরণ ও আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মানব মুক্তি ও কল্যাণ অসম্ভব।

তেষট্টি.

মিসলে বূ কয়েদ হায় গনচে মেঁ পারীশাঁ হোজা
রখতে বরদোশে হাওয়ায়ে চম নিস্তা হোজা ॥

হায় তুনুক মায়া তূ যাররে সে বায়াবাঁ হোজা
নোগমায়ে মওজ সে হাঙ্গামায়ে তূফাঁ হোজা ॥

কুওয়াতে ইশক সে হার পুসত কো বালা করদে
দাহর মেঁ ইসমে মুহাম্মদ (সা.) সে উজালা করদে ॥

অর্থ ও ব্যাখ্যা

হে মুসলিম সম্প্রদায়! বিশ্বনবীর আদর্শ ও শান্তির ধর্ম ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান কর। তোমরা সমগ্র বিশ্বে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দাও। বিশ্বনবীর আদর্শ ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে এমন গুণাবলি রয়েছে যা সকল জাতি ও গোত্রকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একীভূত করে দেয়। তোমাদের আত্মিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অতুলনীয়। তোমাদের শক্তি বা সংখ্যা

www.pathagar.com

বাস্তবপক্ষে কম হলেও নিরাশ হবার কারণ নেই। তোমরা বিশ্বনবী (সা.)-এর প্রেম ও মহানুভবের শিক্ষাকে হৃদয়ে লালন কর আর তার প্রতি অন্তরের প্রেমকে বর্ধিত কর, নিশ্চয় তোমরা কামিয়াব হবে। আর বিশ্বাস রাখ যে, এই ইশকে রাসুলের কারণে তোমাদের মধ্যে এমন অসীম শক্তি সৃষ্টি হবে, যে তোমরা দুনিয়াতে নবী (সা.)-এর নাম উঁচু করতে পারবে এবং নিজের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

চৌষট্টি.

হো না ইয়ে ফুল, তূ বুলবুল কা তারাননুম ভী না হো
চমনে দাহর মেঁ কলিউঁ কা তাবাসসুম ভী না হো ॥

না ইয়ে সাকী হো তূ ফের ম্যায় ভী না হো খম ভী না হো
বযমে তাঁরহীদ যু দুনয়া মেঁ না হো, তুম ভী না হো ॥

খীমা আফলাক কা ইসতাদাহ উসী নাম সে হায়
নবজে হাসতী তাপশে আমাদাহ উসী নাম সে হায় ॥

অর্থাৎ

১. হে মুসলিম শোন! যদি বিশ্বনবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা না হতো তবে বুলবুল গাইতো না, ফুল বাগানে কলি ফুটতো না।

২. সাকী না থাকলে শরাবও থাকতো না, পেয়ালাও থাকতো না। যদি বিশ্বনবী (সা.)-এর তাওহীদের মজলিস না হতো, তাহলে তোমরাও হতে না।

৩. বিশ্বনবী (সা.)-এর মোবারক নামেই সকল সৃষ্টির সূচনা। তাঁর নামেই এ আকাশ দাঁড়িয়ে আছে, অস্তিত্বের ধমনী তো তাঁর দ্বারাই চলছে। তাঁরই প্রেমের ফল্গুধারাই এ বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ।

সহজ ব্যাখ্যা

হে মুসলমানগণ! স্মরণ রেখো, যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সত্তা না হতো, তবে পুরো দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেতো। আল্লাহপাক এ পৃথিবীকে এতো সুন্দর ও শুশোভিত করতো না। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য নবী (সা.)-এর কারণে, যদি তিনি না হতেন, দুনিয়াতে তাওহীদের নাম নেওয়ার

www.pathagar.com

মত কেউ থাকতো না। তোমরাও থাকতে না, তাওহীদও থাকতো না। অবশ্যই এই সৃষ্টি জগত বিশ্বনবী (সা.)-এর মোবারক নামের দ্বারা টিকে আছে। আর এ ইসলামী জীবনে তাঁর কারণেই রূহ চালু আছে। সুতরাং সকল সৃষ্টির মূলে তার নূরে মুহাম্মদী সত্তার কর্তৃত্ব বর্তমান।

পঁয়ষট্টি.

দাসত মেঁ দামানে কাহসার মেঁ, ময়দান মেঁ হায়
বাহর মেঁ মওজ কী আগূশ মে, তূফান মেঁ হায় ॥

চীন কে শহর, মারাকাশ কে বায়া বাঁ মেঁ হায়
আওর পুশীদাহ মুসলমান কে ঈমান মেঁ হায় ॥

চশমে আকওয়াম ইয়ে নাজ্জারাহ আব তক দেখে
রাফ'আতে শানে অরাফা'না লাকা জিকরাকা দেখে ॥

অর্থ ও ব্যাখ্যা

নবী (সা.)-এর নাম জঙ্গলে, পাহাড়ে, ময়দানে, শহরে, বন্দরে সর্বত্র প্রত্যেক মানুষের মুখে আছে। এর চেয়ে বড় কথা প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ের মণি হয়ে তিনি অন্তস্থলে লুকায়িত রয়েছেন। এভাবে রাসূল (সা.)-এর নাম কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করছেন, হে রাসুল, আপনি আপনার নামকে পুরো বিশ্বে উঁচু করে দিয়েছি।

ছেষট্টি.

মরদামে চশমে যমী, ইয়া'নী ওহ কালী দুনইয়া
ওহ তুমহারে শুহাদা পালনে ওয়ালী দুনইয়া ॥

গরমীয়ে মোহর কী পরওয়ারি দাহ্ হেলালী দুনইয়া
ইশক ওয়ালে জিসে কাহতে হ্যাঁয় বেলালী দুনইয়া ॥

তাপশে আনদুয হায় উস নাম সে পারে কী তরাহ
গোতাহ যন নূর মেঁ হায় আঁখ কে তারে কী তরাহ ॥

অর্থ ও ব্যাখ্যা

আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ শাসক নাজ্জাসী ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন। যেখানে প্রচণ্ড গরম পড়ে, যাকে ইসলামের আশেককুল

www.pathagar.com

হযরত বিলালের দেশও বলে, কেননা তিনি এ এলাকার লোক ছিলেন। এই জমিন ইসলামের দাওয়াতের কারণে দিন দিন ইসলামের আলোতে আলোকিত হচ্ছে। এই অন্ধকার দেশের আনাচে-কানাচে ইসলামের আলোর সাথে নবী (সা.)-এর নামও প্রচার হচ্ছে এবং হাজার হাজার মসজিদের মিনার থেকে আল্লাহ্ এবং তাঁর নবী (সা.)-এর নাম ধ্বনিত হচ্ছে।

সাতষট্টি.

আকল হায় তেরী সিপার ইশক হায় শমশীর তেরী
মেরে দরবেশ! খেলাফত হ্যাঁয় জাহাঙ্গীর তেরী ॥

মা সেওয়াল্লাহ কে লিয়ে আগ হাঁয় তাকবীর তেরী
তূ মুসলমাঁ হো তু তাকদীর হ্যাঁয় তাদবীর তেরী ॥

কী মুহাম্মদ সে ওয়াফা তূনে তূ হাম তেরে হ্যাঁয়
ইয়ে জাহাঁ চীয হ্যাঁয় কিয়া? লওহ ওয়া কলম তেরে হ্যাঁয় ॥

অর্থাৎ

১. হে মুসলিম সম্প্রদায়! বুদ্ধি ও জ্ঞান তোমার সম্পদ, অন্তরের প্রেম হচ্ছে তরবারি। তুমি মহান গুণে গুণান্বিত। তুমি দরবেশ হওয়ার যোগ্য প্রতিনিধি।

২. তুমি মুসলিম রূপে আল্লাহর আশিষধন্য, তাই মাশাআল্লাহ তোমার অন্তরের আওয়াজ। তুমি মুসলমান হিসেবে সৌভাগ্যের অধিকারী, তাই মুক্তির পথ অত্যন্ত সহজ।

৩. তুমি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উচ্চতর প্রশংসাকারীদের একজন হয়ে যাও, তাহলে আমি আল্লাহ্ তোমার হয়ে যাবো। নবী মুহাম্মদ (সা.) এমন এক মহান রাসূল যার প্রতি মহব্বত বর্ষণ করলে তুমি লাওহ কলমের অধিকারী হয়ে যাবে। কারণ এই লৌহ কলম তাঁর পবিত্র নূর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

অর্থ ও ব্যাখ্যা

শেষ কবিতায় ড. আল্লামা ইকবাল (র.) বলছেন, মহান প্রভু মুসলমানদেরকে এভাবে সম্বোধন করছেন যে, হে মুসলমান সম্প্রদায়! আমি তোমাদরেকে দুটি

www.pathagar.com

গুণ দান করেছি। তোমার নিকট ইশকের শক্তি আছে, আর আকলের সম্পদও আছে। তুমি ইশককে তলওয়ার বানিয়ে নাও। আমার হাবিব মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম দুনিয়াতে উঁচু করো। আর এই কাজ করতে গিয়ে যে সকল মুসীবত আসে তাকে নিজ বুদ্ধি দ্বারা দূর কর। অর্থাৎ তুমি যদি সত্যিকার মুসলমান হতে চাও তাহলে আমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি প্রেমপূর্ণ প্রশংসা বর্ষণ কর আর আমার অনুগত হয়ে যাও, তাহলে আমিও তোমার প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে যাবো। তারপর তোমার সকল চিন্তাধারা তোমার তাকদীরের সাথে মিলে তোমার সহযোগী হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমার সকল আশা পূরণ হবে।

আর যদি তোমরা আমার নবী (সা.)-কে অধিক মহব্বত কর, তাঁর কথা মত চলো, তবে তোমাদেরকে পৃথিবীর মালিক বানিয়ে দেবো।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বে সৌভাগ্যের সূর্যোদয়

সিয়ালকোটে বাস করতেন এক মহান ব্যক্তি। তিনি পেশায় একজন সরকারী কর্মকর্তা। সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ ব্যক্তিরূপে পূজনীয় ছিলেন সর্বত্র। জনগণের প্রিয়পাত্র হিসেবেও তাঁর বেশ নামডাক ছিল। আলেম-বুজুর্গদের সাথে ছিল তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক। হর-হামেশা দীনী শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকতেন। আল্লাহ্‌র বাণী ও রাসুলের হাদিস নিজে যথাযথভাবে বুঝা ও অপরকে বুঝানোর ব্যাপারে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন তিনি। অতি সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন। তিনি ছিলেন সিয়ালকোটের ইসলাম গ্রহণকারী সেই অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের উত্তরসূরী। তাঁর নাম শেখ নূর মুহাম্মদ।

পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে শেখ নূর মুহাম্মদ সিয়ালকোটের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। সমাজের গরীব-দুঃখী মানুষের পরম বন্ধু ছিলেন তিনি। সামন্ত-প্রভুদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার কন্ঠ নির্যাতিত জনগণের পক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালন করতো। অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তাঁর পরিবারটি এলাকার মধ্যে 'শেক পরিবার' হিসেবে বেশ সুপরিচিত ছিল। পারিবারিক উপাধি ছিল 'সপরু'।

একদিন গভীর রাতে শেখ নূর মুহাম্মদ স্বপ্নে দেখেন– একটি ধবধবে সাদা কবুতর মনের আনন্দে আকাশে উড়ছে। কবুতরটি দেখতে খুবই সুন্দর দেখায়। তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে কবুতরটি পাওয়ার। হাত বাড়ালেন এটা ধরার উদ্দেশ্যে। তা এতো উপরে যে, হাতে নাগাল পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কবুতরটি নীচে নেমে এসেছে। একেবারে মাথার উপর। একটু পরে তিনি দেখলেন, তাঁর কোল জুড়ে বসে পড়েছে। কবুতরটি পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা।

সকাল বেলা তিনি স্বপ্ন বিশারদের কাছে গেলেন। খুলে বললেন তাঁর কাছে গতরাতের ঘটনা। স্বপ্ন বিশারদ বর্ণনা শুনে ধীর স্থিরভাবে বললেন, 'শেখ সাহেব! অদূর ভবিষ্যতে আপনি এক ভাগ্যবান সন্তানের পিতা হতে যাচ্ছেন।'

শেখ নূর মুহাম্মদ স্বপ্নের ব্যাখা শুনে আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করলেন। ঘরে

www.pathagar.com

ফিরে তাঁর স্ত্রী ইমাম বিবিকেও এ সুসংবাদ জানালেন। তিনিও এটা শুনে আনন্দিত হলেন।

দিন যায় আর আসে। পিতামাতা গভীর আগ্রহে চেয়ে আছেন সেই সোনালী দিনের প্রতি– যেদিন তাঁরা লাভ করবেন একটি নয়নমনি সোনার চাঁদ। রাতের মুসাফির যেমনি সুবহে সাদিকের আশায় থাকে অপেক্ষমান ঠিক তেমনি তাঁরাও প্রতীক্ষায় রইলেন কখন আসবে সেই শিশু মেহমান– আল্লাহ্র অপার দান। ইতিমধ্যে তাঁরা ঠিক করে ফেলেছেন নবজাতকের নাম। তার নাম হবে 'ইকবাল' মানে–সৌভাগ্য।'

সেই স্মরণীয় দিন

১২৮৯ হিজরীর ২৪শে যিলহজ্জ মুতাবিক ৯ই নভেম্বর ১৮৭৭ ইংরেজি (মতান্তরে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩) রোজ শুক্রবার একটি স্মরণীয় দিন। দীর্ঘদিনের সেই প্রতীক্ষিত শিশু আগমন করলো ধরার বুকে।[১] মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীর মাঝে মহাখুশীর সাড়া পড়লো। সবার মুখে একই দোয়া– 'আল্লাহ্ এ ছেলেকে দীর্ঘজীবি করুন।'

নয়নের দুলাল ইকবাল মা বাপের আশার আলো– সোনার ধন। তাঁরা শুধু চান বড় হয়ে এ ছেলে ইসলামের সেবার সম্পূর্ণরূপে আত্মোনিয়োগ করুক। দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করুক। ফুটফুটে চাঁদের মতো সুন্দর চেহারার ছেলেকে কোলে নিয়ে তাঁদের আন্তরিক দোয়া ও ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই।

ইকবাল একদিন সেই স্বপ্নসাধ পূর্ণ করবে কড়ায়-গণ্ডায়। দেশ ও জাতির সুনাম বয়ে আনবে। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর নাম। সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে তাঁকে– এটা ছিল মহান আল্লাহ্র ইচ্ছে।

পিতার বংশ পরিচয় ও পেশা

ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ প্রথম জীবনে সরকারী চাকুরীতে ছিলেন। তিনি মোটা অংকের মাইনে পেতেন। তাঁর সংসার জীবন ছিল অত্যন্ত সুখী।

---

১. ইকবালের জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তাহের ফারুকী 'সীরাত ইকবাল' বহু ভাষাবিদ-পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'মহাকবি ইকবাল', অধুনালুপ্ত ইকবাল সোসাইটি, ঢাকা-এর সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমান সম্পাদিত 'ইকবালও : দেশ-বিদেশে' গ্রন্থে ইকবালের জন্ম তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ারিয় ১৮৭৩ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার ৯ই নভেম্বর ১৮৭৭ সালকে কবির জন্ম দিবস স্থির করেছেন। ৯ই নভেম্বর পাকিস্তানে সরকারী ছুটির দিন। এদিনটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে 'ইকবাল ডে' হিসেবে উদযাপিত হয়।

www.pathagar.com

স্বপ্নের ব্যাখ্যার শুভ সংবাদ শুনে তাঁর মন-মানসিকতা হঠাৎ পাল্টে গেল– না, সরকারী চাকুরীতে হালাল রুজীর সন্দেহ আছে। আর সন্দেহযুক্ত রুজী-রোজগার জীবন-যাপন করলে ভবিষ্যত বংশধররাও এর থেকে মুক্ত হতে পারে না। পরাধীন হিসেবে চোখ বুঁজে সরকারের গোলামী করে যাবে; স্বাধীনভাবে কোন কিছু করতে পারবেই না। উপরন্তু হারাম মিশ্রিত রোজগার পেট পুরবে। অবশেষে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ধরলেন ব্যবসা বাণিজ্যের পথ।

মা ইমাম বিবি ছিলেন উচ্চবংশীর শিক্ষিতা মহিলা। সাংসারিক জীবনে ছিলেন তিনি অত্যন্ত পরহেযগার, বুদ্ধিমতী ও স্নেহবতী। তিনি ছিলেন ইকবালের দিগদর্শন। ইকবাল তাঁর মায়ের অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

তোমারই চেষ্টায় আমি
আকাশের তারকা পেয়েছি ॥
আমার জীবনেতিহাস
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে,
তোমার স্নেহমাখা নাম
থাকবে চির অম্লান ॥

ইকবালের বাল্য জীবন

পরম আদর-যত্নে লালিত-পালিত হতে লাগলো শিশু ইকবাল। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। শান্ত-শিষ্ট ও কোমল স্বভাব ছেলেটির। মা-বাপ শিক্ষা দিতে লাগলেন আস্তে আস্তে স্নেহ-প্রীতির মাধ্যমে। মাস পেরিয়ে বছর। এভাবে বয়স যখন পাঁচ বছর হলো, আব্বা-আম্মা আদর যত্ন করে মক্তবে পাঠাতে শুরু করলেন। উৎসাহ দিতে লাগলেন ছেলেকে পড়ার দিকে। মক্তবে ইকবালের লেখাপড়া, কথাবার্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বিনয়ী স্বভাব উস্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। একদিন সকাল বেলা। শেখ নূর মুহাম্মদ নিত্য দিনের মতো ফজর নামায সেরে কুরআন তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর ইকবালকে কোলে তুলে নিয়ে বসলেন। ছেলেকে তিনি ঈমান-কলেমা ইত্যাদি শিক্ষা দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ইকবালকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বাবা! যদি তুমি বড় হয়ে কুরআনের খেদমত করতে পারো তাহলে দীর্ঘায়ু লাভ কর। আর যদি তা না পারো, তাহলে ইকবাল নামের স্বার্থকতা দুর্ভাগ্যে পরিণত হবে।' পিতার এই বাণী ও আশা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

ইকবালের বুদ্ধি ও মেধা সহজেই মক্তবের উস্তাদজীর সুনজর লাভ করে। প্রতিদিন তিনি খোঁজ নেন ইকবালের পড়াশুনার। পরম স্নেহ করতেন তিনি। ইকবাল এতে পেতো দারুণ উৎসাহ। ক্লাসের সেরা ছাত্র হিসেবে মধুর সম্পর্ক

www.pathagar.com

ছিল সবার সাথে। তাই ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাকে আদর করতো- ভালোবাসতো। রোজ সকালে মক্তবে পৌছার ক্ষেত্রে ইকবালের যথেষ্ট সুনাম ছিল- কখনও দেরী করতো না মোটেও। সবার আগে মক্তবে গিয়ে পড়াশুনায় মনোযোগ দিতো।

একদিন সকাল বেলা। মক্তবের ক্লাস যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেল। সেদিন মক্তবে ইকবালের পৌছতে পৌছতে দেরী হলো। উস্তাদজী ক্লাসের ছাত্রদের দিকে নজর করে দেখেন, ইকবাল অনুপস্থিত। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। ভাবছেন কত কিছু। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ইকবাল এসে হাজির। উস্তাদজী কাছে ডাকলেন ইকবালকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বাবা! আজকে তোমার এতো দেরী হলো কেন? অসুখ হয়নি তো!'

ইকবাল সুন্দরভাবে জবাব দিল, বললো- 'ইকবাল (সৌভাগ্যে) দের ছে আতা হ্যায়।' অর্থাৎ 'ইকবাল (সৌভাগ্য) দেরীতেই আসে।' জবাব শুনে উস্তাদজী অবাক হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ, এত সুন্দর জবাব। তিনি বুঝতে পারলেন, এ ছেলে একদিন জ্ঞানী-গুণীদেরকে অবাক করে দেবে। ইকবালের বয়স তখন আট-দশ বছর মাত্র।

মক্তবে ইকবাল কুরআন শরিফ ছাড়াও উর্দু ও ইংরেজি পড়তো। তখনকার যুগে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মক্তবেই পড়ানো হতো। ইকবাল সবগুলো ক্লাসে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করে এবং ১৮৮৮ সালে ইংরেজি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। শেখ নূর মোহাম্মদের বাল্য বন্ধু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা মীর হাসানও ইকবালের লেখাপড়ার তদারকী করতেন। শেখ সাহেব তাঁর সাথে পরামর্শ করে ইকবালকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কারণ তিনি প্রথম দিকে ইতস্তত করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষা দেবেন কিনা। মাওলানা সাহেব বললেন, 'ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেয়া হলে ইংরেজি কেন অন্যান্য ভাষায়ও শিক্ষা দিলে ইসলামের শিক্ষা প্রসারের জন্য বেশ সুফল দেবে।' এতে আশ্বস্ত হয়ে ইকবালের পিতা তাঁকে ১৮৮৮ সালে এস্কচ মিশন হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন।

ভিক্ষুকের প্রতি আচরণ

একদিন ইকবাল পড়ার ঘরে বসে অধ্যয়ন করছেন। গভীর মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া হচ্ছে। বাইরের জগতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এমন সময় একজন ভিক্ষুক একেবারে বাড়ির ভেতরের গেইটে প্রবেশ করলো। 'মাগো! এ গরীবকে যা পারেন সাহায্য করেন। মাগো....ক্ষিধের জ্বালায় আর বাঁচি না।' এভাবে ভিখারীটি ইকবালকে বিরক্ত করে তুললো। কানের উপর হাঁক-ডাক আর কতো সহ্য করা যায়। একবার-দু'বার মাফ করার জন্য বললেন। কিন্তু

www.pathagar.com

সে নাছোড় বান্দা, কথায় মোটেও কান দেয় না। শুধু বলেই যাচ্ছে– মাগো...। ইকবাল এবার চটে গেলেন। আস্তে করে এক টুকরা ইট হাতে নিয়ে সজোরে ভিক্ষুকের দিকে মারলেন। এতে ভিক্ষুক আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়লো। আর ভিক্ষার থলেটি মাটিতে পড়ে লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল। ভিক্ষুকের হাঁউ-মাঁউ চীৎকার শুনে অন্দর মহল থেকে পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ ছুটে এলেন। এসে দেখেন ভিক্ষুকের শোচনীয় অবস্থা। তিনি তাকে তুলে এনে ঘরে বসালেন। তারপর পড়ার ঘরে গিয়ে ইকবালকে বললেন, 'কিয়ামতের দিন যখন রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতগণ সমবেত হবেন, সেখানে গাযী, শহীদ, জ্ঞানী-সাধক, আবেদ, হাফেজ সবাই উপস্থিত থাকবেন। আর তখন এঁদের সামনে রাসুল (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করবেন– 'আমি একজন মুসলিম সন্তান তোমাকে দান করেছি, তাকে তুমি মানুষ করতে পারলে না! তখন আমি কী জবাব দেবো?' ভিক্ষুকের সাথে তোমার এ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মর্মাহত ও লজ্জিত। এ সময় শেখ নূর মুহাম্মদের দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইকবাল লজ্জায় মাথা নত করে রইলেন। অপরাধের জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত হলেন। এবং ভিক্ষুকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ভিক্ষুক প্রথমে কষ্ট পেলেও ইকবালের অনুতপ্তের কথা ভেবে তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর জন্য দোয়া প্রার্থনা করলেন। অবশেষে শেখ নূর মুহাম্মদ ভিক্ষুককে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় করলেন। সেদিন থেকে ইকবাল আর দ্বিতীয়বার এ ধরনের কোন অপরাধ করেনি। সে তাঁর বুজুর্গ পিতার নিকট গিয়ে কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলেন। পিতা তাঁকে দীর্ঘক্ষণ বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষার মাহত্ব ব্যাখ্যা করলেন। ইকবাল খুশি মনে পিতার উপদেশ শিরোধার্য করে নিলেন।

পড়াশুনার জন্য উপদেশ

শেখ নূর মুহাম্মদ প্রায় সময়ই লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে পড়ার ঘরের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে ছেলের পড়াশুনার খোঁজখবর রাখতেন। একদিন সকাল বেলা কুরআন অধ্যয়নকালে তিনি ছেলেকে বললেন, 'বাবা! তুমি এভাবে কুরআন অধ্যয়ন করবে যাতে তোমার এটা মনে হয় যে, যেন তোমার উপর কুরআন নাযিল হচ্ছে।' লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় পিতা ইকবালের হাত ধরে ওয়াদা করালেন, 'বড় হয়ে তুমি কুরআনের উপর গবেষণা করবে এবং এর শিক্ষাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবে। বিশ্বনবীর আদর্শের অনুসরণ করবে এবং তাঁর মহব্বতকে জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরবে।' বস্তুতপক্ষে ইকবাল তাঁর এ ওয়াদা আজীবন যথাযথভাবে পালন করেছেন।

www.pathagar.com

শিক্ষাজীবন

১৮৯১ সাল। ইকবাল সিয়ালকোটের এস্কচ মিশন হাইস্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে 'মেডেল' লাভ করেন। পুরস্কার লাভের সূচনা এখান থেকেই। আব্বা-আম্মা, আত্মীয়-স্বজনের খুশীতে আর ঠাঁই নেই। তাঁদের মুখ উজ্জ্বল হলো ইকবালের কৃতিত্বে। সবাই তাঁর ভবিষ্যত উন্নতির জন্য দোয়া করতে লাগলেন।

১৮৯৩ সালে ইকবাল মেট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক ও স্কলারশিপ লাভ করেন। ১৮৯৪ সালে ভর্তি হন সিয়ালকোটের এস্কচ মিশন কলেজে। মাওলানা মীর হাসান এ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৯৬ সালে ইকবাল কৃতিত্বের সাথে এফ. আই. (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আব্বা শেখ নূর মুহাম্মদ মাওলানা মীর হাসানের সাথে পরামর্শ করে ইকবালকে বি.এ. পড়ার জন্য লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে এ কলেজের বেশ সুনাম রয়েছে। লেখা-পড়ার পরিবেশ ছিল বেশ উন্নত। প্রতি বছর বহুসংখ্যক ছাত্র এখান থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়।

ইকবাল লাহোর গিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও খুশী দুটোই হলেন। দুশ্চিন্তা এজন্য যে, আত্মীয়-স্বজন ও মাওলানা মীর হাসানের বিচ্ছেদ এবং খুশী হলেন এজন্য যে, তিনি দীর্ঘকাল ধরে যেসব খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের নাম শুনে আসছিলেন, লাহোরে এসে তাঁদের সাক্ষাত পেলেন। আল্লামা আলতাফ হুসাইন হালী, মীর্যা আরশাদ গোরগানী প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইকবাল যেসব কবি সাহিত্যিকদের পরম সান্নিধ্য লাভ করতেন, তখন কি কেউ জানতেন যে, এই তরুণই একদিন বিশ্বসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র হবে।

www.pathagar.com

ইকবালের তাসাওউফ শিক্ষার পথিকৃৎ সাইয়েদ মীর হাসান

ইকবালের শিক্ষাগুরু, মুর্শিদ সাইয়েদ মাওলানা মীর হাসান একজন সুফি, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বরেণ্য আলিম হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। লাহোরের স্বনামধন্য ও বরেণ্য আলিম হিসেবে তিনি সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আরবী ও ফার্সী ভাষায় ছিল তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। সিয়ালকোটের ছোট বড় সবার কাছে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। লাহোর এস্কচ মিশন কলেজে তিনি দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন। সে যুগে আলিম সমাজে তাঁর মতো সর্ববিষয়ে, পারদর্শী বিদ্বান ব্যক্তিত্ব বিরল ছিল। তিনি ছিলেন আলিম সমাজের শিরোমণি, বিদ্যার সাগর।

শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতো। কেননা প্রথমদিকে তিনি যেভাবে কড়াকড়ি শাসন করতেন তাতে অনেকেই হিমসিম খেয়ে যেত, কথায় কথায় শাসাতেন খুব। এটা ছিল তাঁর শিক্ষাদানের টেকনিক। যে ছাত্র প্রাথমিক পরীক্ষায় ধৈর্য সহকারে এসব সহ্য করতে', পরবর্তীতে তিনি তার জন্য জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিতেন। অন্তরঙ্গভাবে মায়া-মমতার ছায়াতলে আশ্রয় দিতেন। ফলে প্রকৃত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছাত্ররা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হতো। ইকবাল ছিলেন এদেরই একজন। এ মহান মাওলানার কাছে অমূল্য শিক্ষা লাভ করে ইকবাল ধন্য হলেন।

ইকবালের পিতা প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সাথে দেখা করতেন। আলাপ-আলোচনা করতেন। একদিন মাওলানা বললেন, 'আপনার ছেলেকে মক্তবের শিক্ষার দ্বারা তিপ্ত করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াতে হবে ওকে।' ইকবাল তাঁর কাছে এফ.আই. পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা সাইয়েদ মীর হাসানের কাছে ইকবাল আরবী, ফার্সী, ইসলামিয়াত, হিকমত, কুরআন, হাদিস ও ইলমে তাসাওউফের প্রাথমিক সবক লাভ করে প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন।

ইকবাল মাওলানার পবিত্র সাহচর্যে গিয়ে ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন ও সুফি দর্শন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন। এতে তাঁর জীবনে সোনায় সোহাগায় মেলবন্ধন তৈরি হয়। এ সময় তিনি 'পারস্য ভাষায় কুরআন' নামে

www.pathagar.com

খ্যাত বিশ্বপ্রসিদ্ধ সুফি মাওলানা রুমির মসনবী শরিফের গুপ্তজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভে ধন্য হন। মাওলানা সাইয়েদ মীর হাসান ছিলেন মসনবীর অনুরক্ত সুফি ও মাওলানা রুমির অনুসারী। তিনি ইকবালকে মসনবীর গুপ্তজ্ঞানের সন্ধান দেন। ইকবালকে নিয়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা মসনবীর আলোচনা করতেন। তাই স্বাভাবিকভাবে আমরা ইকবালকে রুমি (রা.)-এর দার্শনিক ভাবধারায় উজ্জীবিত একজন মরমী কবি হিসেবে দেখি। বস্তুতপক্ষে সুফি মতবাদের প্রতি আকর্ষণ ইকবালের ছোট বেলা থেকেই অন্তরে সুপ্ত ছিল। মীর হাসানের সাহচর্যে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে। তাই তাঁর কবিতার মধ্যে আল্লামা রুমির কাব্যিক ভাবাদর্শের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন,

ইকবাল বলেছেন :

মরা বিঙ্গর কি দর হিন্দুস্তাঁ নমী বীনা
ব্রাহ্মন রমযৃ আশনায়ে রূম ও তাবরীয আস্ত ॥

অর্থাৎ 'আমার প্রতি লক্ষ্য কর! কেননা আমাকে ভারত দেখবে না। এক ব্রাহ্মণ সন্তান মাওলনা রুমি ও শামসউদ্দীন তাবরিযীর (কাব্যের) রহস্য হৃদয়ঙ্গম করে আমি নিজেই রহস্যবিধ হয়েছি।'

ইকবালের দীক্ষাগুরু মাওলানা সাইয়েদ মীর হাসান মহান অতীন্দ্রীয়বাদী সুফিগুরু এবং মরমী কবি জালালউদ্দিন রুমির পরিচয় ও মসনবী গ্রন্থের রহস্য ইকবালের সামনে মেলে ধরে তাঁকে সুফিতত্ত্বের রহস্য সন্ধানী ডুবুরীতে পরিণত করেছিলেন।

আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি ১২৭৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর ছেষট্টি বৎসর বয়সে দক্ষিণ তুরস্কের কোনিয়ায় সূর্যাস্তের সময় যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁর জীবনের প্রায় তিরিশ বৎসর বয়সে প্রবুদ্ধ জীবনের জ্যোতির্ময়তায় অতিবাহিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৩৫০০০টি গাঁথা ২০০০টি চতুষ্পদী এবং মহাকাব্য 'মসনবি' রচনা করেছিলেন, তিনি সুফি ধারার মাওলাইয়াত প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বব্যাপি ইশ্‌কের আবাদ করেছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শন এবং রচনার মাহাত্ম্য তাঁর পুত্র সুলতান ওয়ালাদ এবং অন্যান্য উত্তরসূরির নেতৃত্বে মুসলিম বিশ্বের বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়েছিল, যা আলজিরিয়ার্স থেকে কায়রো, আফগানিস্তান থেকে আফ্রিকা, ইউরোপ থেকে আমেরিকা, বাগদাদ থেকে লাহোর এবং সারাজেভো থেকে প্রত্যন্ত তুরস্ক, ইরান এবং ভারতের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে এবং ইসলামের ইতিহাসের অনেক উত্থানপতন এবং বিয়োগান্ত ঘটনার পরও রুমি রচিত গাঁথাসমূহ তীর্থযাত্রীদের দ্বারা এবং ধর্মীয় মাহফি-সমাবেশে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয়ে

www.pathagar.com

আসছে। প্রাচ্যবিদগণ রুমিকে সর্বশ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রীয় কবি হিসাবে স্বীকার করেন এবং প্রাচ্যবাসীগণ তাঁর রচনাবলিকে মোহনীয়তা, গভীরতা, রহস্যময়তা ও পবিত্রতার দিক থেকে কুরআনের পরেই স্থান দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে মাওলাতান্ত্রিক ধারার রুমির প্রায় ১,০০০,০০০ অনুসারী বলকান, আফ্রিকা ও এশিয়ায় বসবাস করতেন। ইতিহাসে কোনো কবিই—এমনকি শেক্সপিয়ার বা দান্তেও সভ্যতার উপর এমন মহিমান্বিত এবং সার্বিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি এবং কোনো কবিই এরূপ ভাবাবিষ্ট এবং নিবিড়ভাবে ভক্তি অর্জন করতে সক্ষম হননি।

এই সুবিশাল প্রভাববলয় মানবতার প্রতি রুমির অবদানের সূচনা মাত্র। দেহত্যাগ করার কিছুদিন পূর্বে রুমি তাঁর গুরু শামস্ তাবরিজের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ, আবেগ এবং এর মর্মার্থ সম্পর্কে লিখে গেছেন :

আমরা একে অপরের সঙ্গে যে সকল পেলব কোমল বাক্য বিনিময় করতাম
তা স্বর্গের গোপন অন্তরে জমা আছে।
একদিন, সেগুলো বৃষ্টিধারার মতো ঝরবে এবং ছড়াবে
এবং এর রহস্য সারা বিশ্বকে শ্যামল করে তুলবে ॥

চুয়াল্লিশ হাজার আটশত উনত্রিশ পঙ্‌ক্তির বিরাট গ্রন্থ মসনবী। মানুষের রচিত ফারসি ভাষার *কোরান* বলে তিনি ঘোষণা দিলেন এবং বললেন যে, *কোরান*-এর মূল বিষয়টি তুলে নিয়ে শুকনো হাড়গুলো কুকুরদের জন্য রেখে দিলাম। রুমির ফারসি ভাষায় বর্ণনাটি হুবহু এই রকম—

মান আজ কুরআন মাজারা বরদাস্তাম
এসতে খাওয়া পেশে সাঁগে আন্দাখতাম ॥

'আমি কুরআনের মগজ বাহির করে নিয়েছি আর কুকুরদের জন্য হাড্ডিগুলো ফেলে রেখেছি।'

মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি অন্যত্র সিনার এলেমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

ছদ কিতাবো ছদ ওয়ারাক দর নারে কুন
সিনারা আজ নূরে হক গোলজারে কুন ॥

অর্থাৎ 'শত কেতাব এবং শত পৃষ্ঠা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করো। তোমার সিনাকে (পীরের ধ্যান দ্বারা) সত্য নূর দিয়ে ফুল বাগানে পরিণত করো।'

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য রুমির গুপ্তজ্ঞানের রহস্য ও মসনবীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফল্গুধারায় ইকবাল এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। যে জীবন তাঁকে এমন জগতে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর হৃদয়ে ইশ্‌কের নহর প্রবাহিত হয়েছিল। মাওলানা সাইয়েদ মীর হাসান তাঁকে এ ইশ্‌কের জগতের দীক্ষাদান করেছিলেন।

বিশ্বকে শ্যামল করার সেইদিন সমাগত, যখন শামস্-এর জন্য রুমির ভালোবাসার প্রকাশ শুরু হয়েছে। বিগত তিরিশ বছর ধরে রুমির মাহাত্ম্য কেবল ইসলামের মাধ্যমে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের অনুবাদ ও পাণ্ডিত্যকর্মে এবং সর্বাধিক শৈল্পিক কাজকর্মের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। রুমিকে একজন অসীম প্রতিভাধর কবি হিসাবে গণ্য করা ছাড়াও আমি যা মনে করি, নতুন একটি অতীন্দ্রীয় পুনর্জাগরণের পথ প্রদর্শক হিসাবে তাঁকে বিবেচনা করা হচ্ছে, যে-পুনর্জাগরণ আমাদের মৃতপ্রায় সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ থেকে জন্মগ্রহণ করার জন্য সংগ্রামরত। রুমি একজন অদম্য অথচ নম্র দিশারি এবং আত্মার পরিচর্যাকারী যিনি খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগে মানবজাতি ও এই ধরিত্রী ধ্বংসের পূর্বেই আলোক-উদ্ভাসিত হৃদয়ের দৃষ্টিকে পুনরুদ্ধার করতে আমাদের সাহায্য করছেন।

'ইলতিজা-ই মুসাফির' কবিতায় ইকবাল সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ মীর হাসানের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন : তিনি আমার কাছে হযরত আলী মুর্তজা (রা.)-এর জ্ঞানের দ্বারের মত। যেভাবে রাসূল (সা.) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমি জ্ঞানের শহর আর আলী হলেন তার প্রবেশদ্বার।'

তিনি চিরদিন আমার কাছে পবিত্র কা'বার ন্যায় সম্মানিত থাকবেন। তিনি আমার কল্যাণ কামনা করেছেন। তাঁর মহত্ত্ব আমাকে জ্ঞানী করেছে। আল্লামা ইকবালের ভাষায় :

> 'উওহ্ শমা' এ বারগাহে খান্দানে মুর্তযাভী
> রহেগা মিস্‌লে হেরম জিস্‌কা আস্তাঁ মুজকো ॥
>
> নফ্‌স সে জিস্‌কে খোলী মেরী আরযু কী কলী,
> বনায়া জিস্‌কী মরওতনে নুকতাদাঁ মুজকো ॥
>
> দোয়া ইয়েহ্ কর কি খোদাওন্দে আসমানো যমী'
> করে ফের উস্‌কী যিয়ারত সে শাদ মাঁ মুজকো ॥

অর্থাৎ 'প্রদীপ্ত আলোর শিখা
খান্দানে আলী মুর্তজার;
কা'বার সম্মান হেন

www.pathagar.com

তাঁর ঘরে কাছেতে আমার ॥
আমার হৃদয়-কলি
প্রস্ফুটিত যাঁহার নিঃশ্বাসে,
যাঁর দানে তত্ত্ববিদ
আমার এ জীবনে বিকাশে ॥
আসমান-যমীনের
প্রভু ওগো মালিক সবার,
সখী করো, এই দোয়া
আরবার দর্শনে তাঁহার ॥'

১৮৯৬ সালে লাহোরের এক জনাকীর্ণ সাহিত্য সভায় ইকবাল জীবনের সর্বপ্রথম মুশায়েরা বা কবিতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর কবিতার রচনাশৈলী শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করে দেয়। এতে অল্পদিনের মধ্যে ইকবালের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৯৭ সালে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ইকবাল আরবী ও ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগে বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এ বছরই তিনি জামান উদ্দিন পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কারের খবর সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। এতে তিনি দেশবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু এরপরে ইকবাল তাঁর প্রিয় মুর্শিদ মীর হাসানের কাছে গমন করেন এবং পুনরায় রুমির মসনবী ও শামস তাবরিজের প্রতি লিখিত দিওয়ানসমূহের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করেন। এ সময় তিনি পুরোপুরিভাবে সুফিতত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিখ্যাত সুফি সাধকগণের মাজার ও তীর্থভূমির প্রতি ইকবালের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর পিতার উপদেশ ও মুর্শিদের প্রেমের প্রতি আত্মনিবেদন করেন। মুর্শিদ তাঁকে রুমির মতো শামসের প্রেমের শুধাপানে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে টানেন।

রুমির সুফি বয়েত ও দিওয়ানসমূহ আল্লামা ইকবালের উপর যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁকে প্রেমিক ও সুফিরূপে পুনর্গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছিল। দীর্ঘ সময় ধরে ইকবাল তাঁর মুর্শিদের কাছে রুমির সুফিধারার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি তাঁর শিক্ষকের সঙ্গে বিখ্যাত সুফিসাধক দাতাগঞ্জে বকস লাহোরীর তীর্থভূমি যাত্রা করেন এবং সুফি ধ্যান সাধনার প্রতি আত্মনিয়োগ করেন।

এ সময় নির্জন ঘরে ঐশীজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক আলাপচারিতায় মুর্শিদ সাইয়েদ মীর হাসানের কাছ থেকে রুমির ঐশীজ্ঞান ও শামসের প্রকাশিত হবার রহস্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন ইকবাল। সাইয়েদ মীর হাসান

www.pathagar.com

অবলীলায় বলে যেতে থাকলেন এক আশ্চর্যময় প্রেমিকের গৌরবান্বিত হওয়ার গল্প :

রুমি খোরাসানের (বর্তমান আফগানিস্তান) বলখ্ শহরে ১২০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিবার ছিল বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও ধর্মতত্ত্ববিদ পরিবার। তাঁর পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদকে সমসাময়িক পণ্ডিতগণ 'পণ্ডিতদের সুলতান' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। রুমির পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ, সুফি এবং অতীন্দ্রীয়বাদী যাঁর সাহস, সাধুতা, অন্তরের মহত্ত্ব এবং আল্লাহর প্রতি দার্শনিক বা মৌল অভিগমনের পরিবর্তে সরাসরি আধ্যাত্মিকভাবে সমীপবর্তী হওয়ার বাসনা রুমিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত করেছিল।

রুমি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন তখন আমাদের যুগের মতোই ভয়াবহ এক আলোড়ন চলছিল। অটোম্যান সাম্রাজ্য ভিতর এবং বাইরে থেকে আক্রান্ত ছিল; ভিতরে ছিল ধর্মীয় অধঃপতন এবং সার্বিক রাজনৈতিক দুর্নীতি; আর বাইরে একদিকে ছিল খ্রিস্টান আক্রমণকারীরা এবং অপর দিকে চেঙ্গিস খানের দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী। এই সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়ন রুমিকে তরুণকাল থেকে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা দ্বারা দহন করেছিল। ধর্মীয় বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা এবং সম্ভাব্য মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কায় ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র বারো বৎসর বয়সে রুমি তাঁর পিতাসহ বলখ্ ত্যাগ করেন। বাহাউদ্দিনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। এক বৎসর পরেই বল্খ্ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

তাঁরা দশ বৎসর ধরে এশিয়া মাইনর ও আরবে পরিভ্রমণ করেন। মক্কার পথে রুমি এবং তাঁর পরিবার নিশাপুরে অবস্থান করেন, সেখানে তাঁদের সঙ্গে বিখ্যাত সুফি কবি আল্লামা ফরিদুদ্দীন আত্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্তার রুমি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, 'এই বালকটি ভালোবাসার অন্তরে একটি দ্বার উদ্‌ঘাটন করবে।' রুমি কখনও 'পাখিদের সম্মেলন' গ্রন্থের এই রচয়িতাকে ভোলেননি এবং আত্তার সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'আত্তার ভালোবাসার সাতটি নগরই ভ্রমণ করেছেন আর আমি এখনও একটি গলির প্রান্তে অবস্থান করছি।' তাঁর পিতার সঙ্গে ভ্রমণের আরেক পর্যায়ে রুমি দামাস্কাস যান। সেখানে সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইবনুল আরাবীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। শোনা যায়, ইবনুল আরাবি যখন রুমিকে তাঁর পিতার পিছনে হাঁটতে দেখেন তখন বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের কী মহিমা! একটি হ্রদের পিছনে এক সমুদ্র যাচ্ছে।' আঠারো বৎসর বয়সে রুমি সমরখন্দের এক অমাত্যের কন্যা গওহর খাতুনকে বিবাহ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে দুই পুত্র সুলতান ওয়ালাদ ও আলাউদ্দিন তিলবির পিতা হন। লারান্দা এবং আরমেনিয়ার আরজানজানে কিছুদিন অবস্থান করার পর রুমির পিতা কোনিয়ার সুলতান

www.pathagar.com

আলাউদ্দিন কায়কোবাদ দ্বারা আমন্ত্রিত হন। তখন ১২২৯ খ্রিস্টাব্দ। কোনিয়ায় বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের জন্য বিশেষভাবে এক বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে শিক্ষাদান করেন। পরবর্তীকালে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে রুমি সেই বিদ্যাপীঠে তাঁর পিতার উত্তরসূরি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জনের সাথে সাথে রুমির ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা চলতে থাকে। তিরমিজি নামে তাঁর পিতার একজন শিষ্য কোনিয়া এসে রুমিকে নয় বছর ধরে সুফি দর্শনের মূল বিষয়গুলো শিক্ষা দেন এবং তাঁকে পুনরায় এলেপ্পো এবং দামাস্কাস ভ্রমণে পাঠান। সেখানে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, আরবি এবং ফারসি ভাষা ও ব্যাকরণ, ছন্দ, কুরআনের ভাষ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করে রুমি একত্রিশ বৎসর বয়সে কোনিয়া ফিরে আসেন। তখন তিনি তাঁর পিতার আধ্যাত্মিক গুণে গুণান্বিত, অসামান্য বাগ্মী, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মপরায়ণ তরুণ পণ্ডিত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সুনাম অর্জন করেন এবং অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র সুলতান ওয়ালাদ লিখেছেন, ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে রুমির 'দশ হাজার অনুসারী' ছিল।

এ সবকিছুই রুমিকে তাঁর সনাতন, গণ্ডিবদ্ধ অথচ 'মিথ্যা অহং'-এর আত্মতৃপ্তির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারত—তাঁর পিতার প্রভাব বিস্তারকারী উদাহরণ, অতীন্দ্রীয়বাদী হওয়া সত্ত্বেও যা মৌল এবং বুদ্ধিবাদী ছিল, অনিশ্চয়তার ভয় যা তাঁর উত্তাল বাল্যকালকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছিল, সহজ তোষামোদের পুরস্কার, তীব্র আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা অথবা বাহ্যিক সমালোচনার পরিণাম—এসবের কোনটিই তাঁকে আত্মতুষ্টি দেয়নি। রুমির সুফি দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন সমকালীন কয়েকজন বিখ্যাত অতীন্দ্রীয় গুরুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, আকর্ষণীয়ভাবে অতীন্দ্রীয়বাদ অথবা কুরআনের ভাষ্য বা ন্যায়শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা দিতে পারতেন, কয়েকটি ধর্মীয় স্তর অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তিনি কোনো তাৎপর্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক পথ খুঁজে পাননি। প্রকৃতপক্ষে ছত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর জীবনের দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি তাঁর অর্জিত যশের চাকচিক্যে এত মোহিত হতে পারতেন যে, তিনি স্বীয় প্রতিবিম্বের মোহিনী মায়ায় ধরা পড়তেন। কারণ তিনি অল্প বয়সেই গর্ববোধ করার মতো মেধা ও আধ্যাত্মিকতা অর্জন করেছিলেন। অবশ্যই তাঁর মধ্যে মহৎ আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা নিহিত ছিল, যা তাঁর পিতা, আত্তার এবং ইবনুল আরাবি লক্ষ করেছিলেন—এই সম্ভাবনা প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য বা সুখ্যাতির লোভে তাঁকে বিভ্রান্ত বা বিপথগামী করতে পারত। পরবর্তীকালে মানসিক দম্ভ এবং গৌরবের আকাঙ্ক্ষার প্রতি

www.pathagar.com

রুমির আক্রমণের তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা থেকে আমরা বুঝতে পারি রুমি দম্ভ ও গৌরবের বিপদ থেকে কতটা সজাগ ও সতর্ক ছিলেন।

প্রেমের দ্বারা প্রজ্বলিত এবং বিচূর্ণ হওয়া ছিল তাঁর সমীপবর্তী, যা রুমিকে একাধারে রক্ষা করেছিল, ধ্বংস করেছিল এবং পরিবর্তিত করেছিল। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কোনো-এক সময় রুমির সঙ্গে মজ্জুব ফকির শামস্-ই তাবরিজের সাক্ষাৎ ঘটে, যা ঐশী পরিবর্তনের অনলে তাঁকে প্রজ্বলিত করে এবং ঐশী প্রেমের নিগূঢ়তার সঙ্গে পরিচিত করে, এই ঘটনা রুমির জীবনকে এবং মানবজাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসকে পরিববর্তিত করেছিল। রুমি পরবর্তীকালে লিখে গেছেন, 'আমি কাঁচা ছিলাম, তারপর আমি দগ্ধ হলাম এবং সুপক্ক হলাম।'

রুমির পুত্র সুলতান ওয়ালাদ তাঁর রচিত 'ওয়ালাদনামায়' স্বীয় পিতা সম্পর্কে লিখেছেন : 'অতীন্দ্রীয়তার পথে তাঁর চূড়ান্ত পথপ্রদর্শক ছিলেন শামস্-ই-তাবরিজ, খোদার অভিপ্রায় ছিল যে, শামস্ বিশেষ করে তাঁর নিকটেই প্রকাশিত হবেন এবং এটা কেবলমাত্র তাঁর জন্যই...। এরূপ দর্শনের উপযুক্ত আর কেউ হয়নি... তিনি তাঁকে দেখেছিলেন, যাঁকে দেখা যায় না, তিনি তাঁকে শ্রবণ করেছিলেন যা ইতিপূর্বে অন্য কেউ কারও কাছ থেকে শ্রবণ করেননি... তিনি তাঁকে ভালোবেসেছিলেন এবং বিলুপ্ত হয়েছিলেন।'

রুমি লিখেছেন—

আমি মহিমামণ্ডিত মুখাবয়বের এক মহান রাজাকে দেখেছি,
তিনি যিনি চক্ষু এবং স্বর্গীয় সূর্য স্বরূপ,
তিনি যিনি সৃষ্টির সঙ্গী এবং পরিত্রাতা,
তিনি যিনি একাধারে আত্মা এবং নিখিল সৃষ্টি যা আত্মাদের জন্ম দেয়,
তিনি যিনি প্রজ্ঞাকে প্রজ্ঞা দান করেন, বিশুদ্ধতাকে বিশুদ্ধতা,
তিনি যিনি সাধু-সন্তদের আত্মার জায়নামাজ,
আমার দেহের প্রতিটি পরমাণু পৃথকভাবে চিৎকার করে ওঠে :
'সকল মহিমা খোদার'।

কে এই রহস্যময়, ভয়ংকর এবং সুমহান দরবেশ, যাঁর পরিধানে ছিল 'কৃষ্ণবর্ণের মোটা পশমী বস্ত্র', সেই ষাট বৎসরের বৃদ্ধ যাঁকে রুমি ১২৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দেখেছিলেন এবং যিশু ও মুহাম্মদের (সা.) সমান ভালোবেসেছিলেন এবং খোদার মধ্যে লীন মনে করেছিলেন? কে ছিলেন এই 'শামস্', যাঁর নামের অর্থ সূর্য, যিনি ইরানের তাবরিজ থেকে আগমন করেছিলেন, প্রায় সকল জীবিত ও মৃত সুফি গুরুদের প্রতি যাঁর প্রচণ্ড ও প্রকাশ্য

www.pathagar.com

অবজ্ঞা তাঁকে সমগ্র এশিয়া মাইনরে বিতর্কিত করেছিল এবং যাঁর উপস্থিতিতেও অতীন্দ্রীয় ক্ষমতা ছিল এত বিশাল, এত প্রচণ্ড, এত দীপ্ত যে, বিশ্বের এক মহৎ কবি তাঁর এবং তাঁদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাক্যহারা হয়ে সারাজীবন অতিবাহিত করে গেছেন? এবং কেনই বা তাঁর ভ্রমণের জন্য 'পরিন্দা' পাখি নামে পরিচিত, বৃদ্ধ, নিঃসঙ্গ, অবজ্ঞাত মানুষটি যিনি সর্বদা সত্যের অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন ১২৪৪ সালের ২৯ নভেম্বর কোনিয়ায় এসে চিনি ব্যবসায়ীদের মুসাফিরখানায় অপরিসীম দুর্ভোগ স্বীকার করে নিলেন?

আফলাকি বলেছেন, 'শামস্ খোদার কাছে প্রার্থনা করে জানতে চান কে সেই দৈব ইচ্ছার প্রিয় এবং গোপন শক্তিধর যাঁর কাছে গিয়ে তিনি দৈবপ্রেমের আরও রহস্য জানতে পারেন। তখন তাঁকে বল্খের বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের পুত্রের কথা বলা হয় যিনি খোদার সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র। সেজন্য শাম্স কোনিয়ায় আসেন।'

আরেকজন জীবনীকার দৌলত শাহ্ আমাদের আরও গভীরে নিয়ে গেছেন : 'শামস্-ই-তাবরিজ এক ব্যক্তির অনুসন্ধান করছিলেন। সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক আস্থা অর্জন করতে পারেন। সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর গতিশীল ব্যক্তিত্বকে সহ্য করতে সক্ষম, সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর আবেগময় অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে এবং আত্মস্থ করতে সক্ষম, সেই ব্যক্তি যাঁকে তিনি আকার দিতে পারেন, ধ্বংস করতে পারেন, নির্মাণ করতে পারেন, নবজন্মদান করতে পারেন এবং উন্নীত করতে পারেন। সেই ব্যক্তির সন্ধানে তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে পাখির মতো পরিক্রমণ করেছেন। অবশেষে তাঁর গুরু রুকনুদ্দিন সাঞ্জাবি তাঁকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে কোনিয়া গমন করতে বলেন।'

কিন্তু আরও মহাসত্যের সন্ধান পাওয়া যায় আফলাকি বর্ণিত পূর্বতন এক কাহিনির মধ্যে। এই কাহিনিতে আফলাকি শামস্‌কে নিঃসঙ্গ এবং মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত হিসেবে দেখিয়েছেন। সাথে সাথে শামস্ এ-বিষয়েও সচেতন ছিলেন যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁর জ্বালাময়ী উপস্থিতিকে অসহ্য মনে করে এবং শামস্ এও জানতেন, অসীম শক্তিধর এক অতিপ্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা তাঁর প্রয়োজন। শামস্ খোদার কাছে অনুনয় করলেন, 'আমাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দাও যে আমাকে সহ্য করতে পারে, এমন ব্যক্তি যে নির্ভীক, দৃঢ়চেতা, স্বচ্ছমনসম্পন্ন এবং উন্মত্ত যাকে আমি চূর্ণবিচূর্ণ করে এমনভাবে পুনর্নির্মাণ করতে পারি এবং তাঁর মাধ্যমে বিশ্বকে আমার যা-কিছু দেওয়ার আছে তা দিতে সক্ষম হই।' খোদা শামস্‌কে প্রশ্ন করলেন, 'এর পরিবর্তে তুমি আমাকে কী দেবে?' শামস্ উত্তর দিলেন, 'আমার জীবন।'

www.pathagar.com

আফলাকির এই চমৎকার এবং ভয়ংকর কাহিনি আমাদের সেই রহস্যের কাছে নিয়ে যায় যা ছিলেন এবং হচ্ছেন শামস্। গভীরভাবে চিন্তা করলে এটি এক অবিশ্বাস্য কাহিনি। আমার ধারণা শামস্-ই-তাবরিজ এমন একজন ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, যিনি পূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন। যখন কেউ উপলব্ধির সেই উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয় তখন তিনি সকল প্রকার যোগাযোগের অতীত হয়ে যান, সকল ভাষা, সকল ধারণা, সকল ভাব তাঁদের বহু নিম্নে অবস্থান করে এবং সেই অবস্থায় তাঁদের যা প্রয়োজন হয় তা হলো একজন মুখপাত্র। এমন একজন যাঁর মানবিক সত্তা বর্তমান, যিনি পরিপূর্ণতা লাভ করছেন, যিনি বিকশিত হচ্ছেন, যাঁকে ক্রমান্বয়ে এবং স্তরে স্তরে ধ্বংস করা যায়, দগ্ধ করা যায়, পুনর্গঠিত করা যায় এবং উন্নীত করা যায়। এবং এমন একমাত্রায় নেওয়া যায় যেখানে গুরু অবস্থান করছেন। এমন একজন যাঁকে প্রকাশের অগ্নিতে দীক্ষা দেওয়া যায়, যেন তাঁর মাধ্যমে বিশ্বকে দীক্ষিত করা যায় মুহাম্মদ, যিশু, বুদ্ধ, সক্রেটিস, রামকৃষ্ণ কেউই কিছু রচনা করেননি; কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু শিষ্য ছিল যাদেরকে তাঁরা হৃদয়ের গভীরে আকর্ষণ করেছিলেন এবং ঐশী প্রেমের এক আশ্চর্য রসায়নের দ্বারা এমনভাবে জাগরিত করেছিলেন যাতে এদের মাধ্যমে তাঁদের বার্তার কিছু প্রেমচ্ছটা বিশ্বে প্রতিভাত হতে পারে।

শামস্-এর জন্য রুমি সেইরকম একজন শিষ্য ছিলেন। শামস্ জানতেন তাঁর চেতনা এবং উপলব্ধি কেবলমাত্র ইসলামের জন্যেই নয় বরং সমগ্র বিশ্ব এবং বিশ্বের অস্তিত্বের জন্য কত প্রয়োজনীয়। সেজন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে প্রস্তুত হতে হয়েছিল (একথা জেনে এবং তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, তাঁর অনলশিখা ছড়িয়ে পড়ার উপর কত কিছু নির্ভর করছে) —চরম মূল্য দেওয়ার জন্য, যেমন যিশুও প্রস্তুত হয়েছিলেন। 'এর পরিবর্তে আমাকে কী দেবে?' খোদা শামস্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং শামস্ উত্তর দিলেন, 'আমার জীবন।'

খোদার সঙ্গে শামস্-এর চুক্তিবদ্ধতা এবং তাঁর চূড়ান্ত আত্মবিসর্জন রুমির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সকল পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে শক্তিময় করেছে। শামস্ কেবলমাত্র রুমির বাক্যকে বর্ণচ্ছটা দেননি, তা রুমির সত্তা, কার্যাবলি এবং রুমি প্রবর্তিত পন্থার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। শামস্ জানতেন যে, তিনি কোনিয়ায় এসেছেন রুমির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এবং রুমি তাঁর হৃদয় এবং মুখপাত্রে পরিণত হবেন যাঁর মাধ্যমে তাঁর নিকট উন্মোচিত চেতনা কেবলমাত্র ইসলাম ধর্ম এবং তাঁর কালকেই সমৃদ্ধ করবে না বরং সমগ্র বিশ্ব এবং পরবর্তী মানব-ইতিহাসকে উদ্ভাসিত করবে। তিনি আরও জানেতন যে, রুমির সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তাঁর খুব সংক্ষিপ্ত সময় থাকবে : তাঁর কারণ

www.pathagar.com

ঈশ্বর প্রদত্ত সকল মহিমা এবং বিস্ময় রুমিকে এবং তাঁর মাধ্যমে সমগ্র মানবতাকে দেওয়ার পরিবর্তে তিনি নিজের জীবন ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি জানতেন যে, খোদা এই চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন, কারণ এরূপ মহিমান্বিত উপহার কেবলমাত্র চরম আনুগত্য ও ভালোবাসার শর্তেই অর্পিত হয়ে থাকে।

রুমি শামস্-এর জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু শামস্ তৎপূর্বেই রুমির জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন। তিনি চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করেই এসেছিলেন যাতে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রীয় ভালোবাসা সম্ভবপর হয়। যাতে তাঁর হৃদয় থেকে রুমির হৃদয়ে আনন্দ এবং দিব্যজ্ঞান পবিত্রভাবে, প্রাঞ্জলভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে প্রবাহিত হতে পারে, যাতে ভালোবাসার ঐশীশক্তির প্রভা সমভাবে উজ্জ্বল থাকে এবং যাতে বর্তমানে আমরা ধরিত্রীর বিনষ্টি অথবা বিনষ্টির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর ও রুমির ভালোবাসা এবং এর আবেগময় আনন্দবার্তার দিকে ফিরে চাই এবং নিজেদেরকে এবং বিশ্বকে রক্ষা করি। রুমি লিখেছেন :

তাবিরেজ থেকে শামস্-ই-তাবরিজের মুখমণ্ডল উদিত হয়েছে।
শামস্ হচ্ছেন তিনি যাঁর মাধ্যমে আলোক বিশ্বে প্রবিষ্ট হয় ॥

কেবলমাত্র এখন আমরা শামস্-এর উপলব্ধির মর্মবাণীর গভীরতা অনুধাবন করতে পারি এবং তাঁর আত্মোৎসর্গের ঝুঁকির গৌরব অনুমান করতে সক্ষম হই যাঁর ফলে এই ভাবসঞ্চালন সম্ভব হয়েছিল।

তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের একটি বিবরণে বলা হয়েছে, ১২৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো একদিন বাজারের কফি বিক্রয় বিপণি থেকে রুমি একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে বের হয়ে আসছিলেন। তাঁর ছাত্ররা পায়ে হেঁটে তাঁর অনুসরণ করছিল। হঠাৎ শামস্ দৌড়ে এসে তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরলেন এবং রুমিকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'কে বেশি মহীয়ান! মুহাম্মদের অনুগামী বায়েজিদ না কুরআনে বর্ণিত নবী মুসা?'

মাওলানা রুমি যেন মুহূর্তেই ইতস্তত ভঙ্গিতে ঘাবড়ে গেলেন। কুরআনে বর্ণিত জাদরেল নবী মুসা। যার কাছে অহি ও কেতাব এসেছে। কিন্তু বায়েজিত বোস্তামী তো একজন সুফি। যিনি আউলিয়া পর্যায়ের একজন সাধক। রুমি এবার উত্তর দিলেন, 'কী আশ্চর্যজনক প্রশ্ন! বনি ইসরাইলদের সবচাইতে আলোচিত নবী মুসা, তিনিই বেশি মহীয়ান।'

শামস্ এবার প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে এর অর্থ কী? নবী মুসা কেন কুরআনের বর্ণিত সুরা কাহাফের ঘটনায় অলি পর্যায়ভুক্ত খিজিরের কাছে মারেফত শিক্ষার

www.pathagar.com

জন্য গেলেন এবং খিজিরের অলৌকিক ঘটনায় ধৈর্যহারা হয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমি আপনার এসব ঘটনায় মর্মাহত, আপনি এসব হীনকর্ম বন্ধ করুন। খোদার রহস্য আমাকে জানতে সাহায্য করুন।'

আর অপরদিকে বায়েজিদ বলেছেন, 'আনা সুবহানি মা আজামুশ্বানি, লাইসা ফি জুব্বাতি শেওয়া আল্লাহতায়ালা।' 'আমি কত গৌরবময়। আমার মর্যাদা কত উচ্চ। আমার জুব্বার ভেতর স্বয়ং আল্লাহতায়ালা বাস করছেন।' এই গূঢ় কথার অর্থ কি?

এমন কথা শোনামাত্র রুমি হতচেতন হলেন। তাঁর সমস্ত কিতাবী বিদ্যা যেন ক্রমেই অকেজো হয়ে গেল।

তাঁর জ্ঞান ফিরলে তিনি শামস্-এর হাত ধরে তাঁর বিদ্যাপিঠে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করলেন। কিন্তু মাওলানা রুমির ভেতরে কুরআনে বর্ণিত সুরা কাহাফের ঘটনাটি বার বার মনে হচ্ছিল। অলির মর্যাদায় অভিষিক্ত খিজির ও নবী মুসার ঘটনাটির মর্মার্থ তাঁর অজানা। অবশেষে শামস্ তাবরিজ তাঁর মনের ব্যাকুলতা জানতে পারলেন। তিনি অবলীলাক্রমে সুরা কাহাফের ৬০ নং আয়াত থেকে ৮২ নং আয়াত পর্যন্ত বর্ণনা করতে লাগলেন :

হযরত মুসা (আ.)-এর নবুয়তের সময়কালে আরেকজন পরম ধার্মিক লোক তীহা প্রান্তরের আশে পাশে বাস করতেন। তিনিও খুব খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। সেই সময়ের অনেকেই তার অলৌকিক ক্ষমতা ও কারিশমার কথা জানত। হযরত মুসা নবীও তা শুনেছিল কিন্তু তার ঠিকানা কেউ জানত না। অবশেষে মহান আল্লাহর তরফ থেকে ঠিকানা জেনে এবং তার সাথে সাক্ষাত লাভের জন্য মুসা (আ.) তাঁকে খুঁজতে বাহির হলেন। ঘটনাটি তীহা প্রান্তরের উন্মুক্ত বন্দীশালায় থাকা অবস্থায় ঘটেছিল। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, মুসা (আ.) একদিন বনি ইসরাইলদের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণে বনি ইসরাইলদের পূর্ববর্তী নবী রাসুলগণের জীবনী এবং তাদের উপর অর্পিত কিতাবসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'হে মুসা! এখন এই দুনিয়ার মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি কে?' ইসরাইলিরা ছিল অমনোযোগী, মতলববাজ ও নচ্ছার প্রকৃতির জাতি। আচমকা উদ্ভট ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে রাসুলগণকে বিপদে ফেলা, তাদের সঙ্গে তাট্টা তামাসা করা ছিল তাদের নিত্য অভ্যাস। মুসা (আ.) সবই জানতেন। আর এটাও জানতেন যে, তিনি কোন উত্তর না দিলে তারা প্রচার করবে, 'মুসা আসলে কিছুই জানে না।' তার কথা শুনে সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই। আর তারপর তার মসলিসে আসতে লোকজনদের বাধা সৃষ্টি করবে। আবার যদি বলেন, 'আমি' সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি, তাহলেও

www.pathagar.com

তারা বলবে, 'দেখ, সে কত বড় বেওকুফ! সে নিজেকে সবার চেয়ে জ্ঞানী মনে করে।' ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর মুসা (আ.) কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেখলেন। তারপর উত্তর দিলেন এই ভেবে যে, তিনি এ যমানার নবী ও রসুল, সুতরাং তার চেয়ে জ্ঞানী আর কে হতে পারে? তাই অবশেষে বললেন, 'আমি'। মুসা যা ভেবেছিলেন তাই হলো। লোকেরা তার উত্তর শুনে হাসাহাসি করতে লাগল। অন্যদিকে তার এই উত্তর আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না। কেননা নবী হিসেবে তার বলা উচিত ছিল, এর উত্তর মহাজ্ঞানী আল্লাহই ভালো জানেন। এর পরবর্তী ঘটনা কোরআনের সুরা কাহাফের ৬০ থেকে ৮২ আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

যেহেতু মুসা (আ.) এর দেওয়া এমন উত্তর আল্লাহর কাছে পছন্দ হলো না। তাই অচিরেই আল্লাহপাক অহি নাযিল করলেন, 'হে মুসা! দু' সমুদ্রের মোহনায় অবস্থানকারী আমার এক বান্দা তোমার চাইতে অধিক জ্ঞানী।' এতে মুসা (আ.) লজ্জিত হলেন এবং বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! সে অধিক জ্ঞানী হলে, আমাকে জ্ঞানলাভের জন্য তার কাছে যাওয়া উচিত। মেহেরবানী করে তুমি তার সাক্ষাত লাভের উপায় আমাকে বলে দাও।' আল্লাহ বললেন, 'একটি ভাজা মাছ সাথে নিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে সফর করতে থাক। যেখানে মাছটি জীবন লাভ করে সাগরের জলে অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেখানে অপেক্ষা কর, সেই দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে আমার এই বান্দার দেখা পাবে।'

পরদিন নবী মুসা (আ.) থলে করে একটি ভাজা মাছ এবং নিজেদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে সমুদ্রের পথে যাত্রা করল। এই যাত্রায় ইউশায়া ইবনে নুন তার সঙ্গী ছিলেন। চলতে চলতে একসময় মুসা তার সঙ্গীকে বললেন, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না। আমি বছরের পর বছর চলতে থাকব। দীর্ঘ পথ চলতে চলতে এক সময় তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, সুতরাং একস্থানে বিশ্রাম নিতে থামলেন। এ সময় হযরত মুসা (আ.) ক্লান্তিতে একটি পাথরের উপর মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ইউশায়া জেগেই ছিলেন, নবী ঘুমাচ্ছিলেন, তাকে পাহাড়া দিতে হবে, তাই তার ঘুম আসছিল না। একসময় তিনি হাত মুখ ধৌত করে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলেন, জায়গাটি ছিল দু সাগরের মিলনস্থল। ইউশায়া দেখলেন, দু সাগরের দু দিক থেকে ঢেউ এসে দু দিকের পানি উপরে উঠে যাচ্ছে। আর মাঝে একটি তাকের ন্যায় স্তম্ভের সৃষ্টি হয়েছে। কাছেই একটি ঝর্ণা সাগরে এসে পতিত হয়েছে। ঝর্ণাটি ছিল আইনুন হায়াত বা আবে হায়াত অর্থাৎ জীবন প্রদায়ী ঝর্ণা। ইউশায়া হাত মুখ ধৌত করার মানসে ঝর্ণাটির দিকে এগিয়ে গেলেন, ইউশায়া যখন ঝর্ণার পানিতে হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন, তখন তার সাথে রাখা থলিতে হাতের পানি ছিটা লাগল। এই পানি ভাজা মাছের গায়ে লাগতেই তাতে জীবনী শক্তির সূচনা হল, এবং থলির মধ্যে

www.pathagar.com

মাছটি নড়াচড়া করতে আরম্ভ করল। তারপর তার চোখের সামনেই মাছটি থলি থেকে লাফিয়ে ঝর্ণার পানিতে পড়ল এবং ঐ পানির সাথে সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল।

যে পথ দিয়ে মৃত ভাজা মাছটি সদ্য জীবন পেয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল, সেই পথে স্রোত বন্ধ হলো এবং পানি বরফের ন্যায় জমে গেল। ফলে মাছটির চলাচলের পথে ছিদ্রের ন্যায় হয়ে রইল। দেখে মনে হচ্ছিল বরফের উপর কেউ যেন একটি গভীর দাগ কেটে দিয়েছে। ইউশায়া নিরবে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাটি লক্ষ করল। তার তখনই মনে হয়েছিল মুসা (আ.)কে ঘুম থেকে জাগিয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপারটি দেখানোর জন্য। কিন্তু সদ্য ঘুমিয়ে পড়া ক্লান্ত নবীকে এক্ষুণি জাগানোটা ঠিক হবে না ভেবে আপাতত কিছুই করলেন না। ফিরে এসে তিনিও একটি পাথরের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

মুসা নবী ঘুম থেকে উঠলেন তারপর ইউশায়াকে জাগিয়ে তুললেন, সে সময় ইউশায়া কিন্তু ঘটনাটি মুসা নবীকে জানাতে ভুলে গেলেন। অতপর রওনা হয়ে তারা যখন আরও দূরে গেলেন, তখন একসময় মুসা তার সঙ্গীকে বললেন, 'আমাদের সকালের খাবার আন। আমাদের এই যাত্রায় আমরা তো কাহিল হয়ে পড়েছি।' এসময় ইউশায়ার মাছের কথা মনে হলো, তিনি বললেন, 'তুমি কি লক্ষ করেছিলে, আমি যখন এক পাথরের উপর বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, আমি দেখলাম মাছটা আশ্চর্য রকম ভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিল।' এ কথা শুনে তৎক্ষনাৎ মুসা বলল, 'আমরা তো এই জায়গারই খোঁজ করছিলাম।' তারপর তারা নিজেদের পায়ের চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। প্রস্তরখন্ডের কাছে যখন তারা এসে পৌঁছলেন, তখনও প্রভাত রশ্মির আলো জোরালোভাবে চারদিক ছড়িয়ে পড়েনি। দূর থেকেই তারা দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক সাদা চাদরে নিজেকে আবৃত করে শুয়ে আছেন। মুসা ঘুমন্ত ব্যক্তিটির আরও নিকটবর্তী হলেন। তারপর লোকটিকে ডাকাডাকি না করে তিনি তাঁকে সালাম জানালেন, এই ভেবে যে, লোকটি যদি জাগ্রত অথবা অর্ধনিদ্রায় থাকে তবে সে এই সালামের জবাবে উঠবে, আর যদি গভীর নিদ্রায় থাকে তবে তার নিদ্রা না টুটা পর্যন্ত সে এখাসে বসেই অপেক্ষা করবে। বন্ধুগণ! এই শায়িত ব্যক্তিই হলেন খিজির (আ.)। তিনি মুসার নবুয়তির সময়ই ধরণীতে এসেছিলেন। খিজির অর্থ চিরসবুজ-শ্যামল। তিনি যেখানেই বসতেন সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হতো। তাই তার কর্মধারা ছিল ভিন্নমুখি। যাইহোক সালাম পেয়ে তিনি বিস্মিত হলেন, মনে তার প্রশ্ন জাগল, এই জনমানবহীন প্রান্তরে সালাম এল কোত্থেকে? তিনি চাদরের ভেতর থেকে মুখ বের করে শব্দের উৎসের দিকে তাকালেন, অতপর সালামের

www.pathagar.com

উত্তর দিলেন। দেখলেন, দুজন লোক তাঁর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। মুসা বললেন, 'আমি মুসা!' জবাব শুনে খিজির (আ.) বললেন, 'কোন্ মুসা!' বলতে বলতে তিনি শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। 'বনি ইসরাইলদের মুসা!' এভাবে হযরত খিজিরের সাথে আলাপ-পরিচয়ের পর মুসা ইউশায়াকে তার দেশের পথে বিদায় করে দিলেন। এরপর তিনি হযরত খিজির (আ.)কে তার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন, 'হে আল্লাহর মহান বান্দা! সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়েছে, তার থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন এ শর্তে আমি কি আপনাকে অনুসরণ করব?'

খিজির (আ.) বললেন, 'তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবে না। যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরবে কেমন করে?' মুসা বললেন, 'আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করতে পারব না।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা যদি তুমি আমাকে অনুসরণ করই তাহলে আমাকে কথা দিতে হবে, তুমি আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবে না। যতক্ষণ না আমি তোমাকে সেই বিষয়ে কিছু বলি।' তারপর তারা চলতে লাগলেন, সামনে একটা নদী পড়ল, দূরে নদীর ঘাটে একটা পারাপারের নৌকা রয়েছে। তারা যখন ঘাটে এলেন, তখন মাঝিরা খিজিরকে চিনে ফেলল। সুতরাং তারা তৎক্ষনাৎ নৌকাটি তাদের দিকে এগিয়ে আনল এবং কোনরকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদেরকে নৌকায় তুলে নিল। ইতোমধ্যে একটা কালো চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং নদী থেকে প্রায় এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। সেদিকে ইঙ্গিত করে খিজির (আ.) বললেন, 'আমার এবং আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের জ্ঞান মিলিতভাবে আল্লাহর জ্ঞানের মোকাবেলায় সমুদ্রের বুক থেকে চড়ুই পাখির পানির চঞ্চুতে উঠানো এক ফোটা পানির সমতুল্য। নৌকাটিতে একটি কুড়াল ছিল, তারা যখন অপর তীরে পৌছলেন, তখন খিজির ঐ কুড়াল দিয়ে নৌকাটিতে একটা ফুটা করে দিয়ে তারপর নামলেন। এতে নৌকার মাঝি মোটেও রাগ করল না। কিন্তু এই দৃশ্য দেখে মুসা রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'আপনি কি সাওয়ারীদেরকে ডোবানোর জন্য ওর মধ্যে ফুটা করলেন? এতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ। এটা দ্বারা তার জীবিকার কাজ চলে।' এ কথা শুনে খিজির বললেন, 'আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবে না।' মুসা বললেন, 'আমার ভুলের জন্য অপরাধ ধরবেন না। আর আমার উপর বেশি কঠোর হবেন না।'

তারপর তারা পুনরায় চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তাদের সঙ্গে একটি ছোট বালকের সাথে দেখা হলো। খিজির তাকে ডাকলেন, বালকটি তাদের দেখে মুখ ভ্যাংচালো কিন্তু কাছে এল। খিজির তাকে ঝাপটে ধরে মাথার উপর তুলে

www.pathagar.com

মুহূর্তেই সজোরে আছড়ে নিরেট একটি পাথরের উপর ফেলে দিলেন। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল বালকটির মাথা এবং সে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করল। মুসা ছেলেটির কাছে ছুটে গেলেন। ততক্ষণে ছেলেটির প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে। মুসা বলল, 'আপনি হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিরপরাধ ছেলেকে হত্যা করলেন। নিশ্চয়ই আপনি গুরুতর অন্যায় করেছেন।' খিজির বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?' মুসা বলল, 'ঠিক আছে, এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। নিশ্চয়ই আমার পক্ষ থেকেই ওজর আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।' অতঃপর ওরা চলতে শুরু করল, চলতে চলতে এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইল কিন্তু তারা ওদের আতিথিয়তাকে অস্বীকার করল। অতঃপর তথায় তারা এক হেলে পড়া প্রাচীর দেখতে পেল, খিজির সে প্রাচীরটি দুহাতের স্পর্শ দ্বারা সোজা করে দিলেন। মুসা বলল, 'ওরা আমাদেরকে খাদ্য দিল না, আতিথিয়তা প্রত্যাখ্যান করল অথচ আপনি ওদের প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন, আপনি তো এ কাজের জন্য ওদের থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন?' খিজির বলল, 'মুসা! তুমি তোমার শর্ত ভঙ্গ করেছ, এখানেই তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল কিন্তু যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য রাখতে পারোনি, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি : ঐ যে নৌকার ঘটনাটি : ওটা কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির ছিল, ওরা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত, আমি ইচ্ছা করলাম ওদের নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করতে, কারণ ওদের নিকটবর্তী ছিল এক রাজা, সে সৈন্য-সামন্তসহ যুদ্ধে যাবার জন্য একটি নিখুঁত নৌকার সন্ধান করছিল, সে নৌকাটি দেখতে পেলে বলপ্রয়োগে ছিনিয়ে নিত। আর ঐ কিশোরটির ঘটনা : তার পিতা-মাতা ছিল বিশ্বাসী, আল্লাহর খাস বান্দা, আমি আশঙ্কা করলাম যে, ছেলেটি তাদের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসের দ্বারা বিব্রত করবে, সে শয়তানের তাবেদারী করবে, অতঃপর আমি চাইলাম যে, আল্লাহপাক যেন ওর পরিবর্তে তাদেরকে এক নেক সন্তান দান করেন, যে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর হবে। আর ঐ প্রাচীরটির ঘটনা : এটি ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় প্রাচীরটির বর্তমান মালিকানা ছিল তাদের চাচার উপর, এই প্রাচীরের নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং ওদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার রব দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, ওরা প্রাপ্তবয়স্ক হোক অতঃপর ওদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। কারণ প্রাচীরটি সোজা করে না দিলে গুপ্তধন প্রকাশ হয়ে যেতো। আমি নিজ হতে কিছু করিনি বরং এটি তার ব্যাখ্যা, তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে অপারগ হয়েছিল।'

—সূরা : কাহাফ, আয়াত : ৬০-৮২

www.pathagar.com

মাওলানা রুমি অবাক হয়ে মজ্জুব ফকিরের বর্ণনা শুনছিলেন। শামস্ বললেন, 'এর মারেফতভেদ অত্যন্ত ব্যাপক।' রুমি তা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেলেন কিন্তু শামস্ তাবরিজ তাঁকে নবী মুসার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'ধৈর্য ধারণ কর বৎস! এ জ্ঞান লাভের জন্য তোমার সম্মুখে বাধার প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। তুমি সমস্ত কিতাবী এলেম, মান-মর্যাদা, শান-শওকত পরিত্যাগ করে মৃত্তিকার মত মৃত হয়ে যাও।' রুমি মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের আরও দু'টি বর্ণনা আছে; এর প্রতিটিতেই রুমির উপর শামস্-এর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। এরকম হওয়াই উচিত ছিল, নাহলে যথাসময়ে শামস্ তাঁর সত্তার সারবত্তা রুমিকে বোঝাতে সক্ষম হতেন না। একটি ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, মাওলানা তাঁর গৃহে ছাত্রদল এবং পুস্তক সমূহ-পরিবৃত হয়ে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় শামস্ সেখানে প্রবেশ করে তাঁকে সম্ভাষণ করে প্রশ্ন করলেন, 'এগুলো কি?' রুমি উত্তর দিলেন, 'তোমার বোধগম্য হবে না।' তাঁর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে একটি অগ্নিপিণ্ড পুস্তকগুলির উপর নিপতিত হলো এবং পুস্তকসমূহ ভস্মীভূত হলো। রুমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এটা কী?' শামস্ উত্তর দিলেন, 'তোমার বোধগম্য হবে না।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, শামস্ যখন কোনিয়ায় আসেন রুমি তখন একটি ঝরনার পাশে তাঁর পুস্তকসমূহ নিয়ে বসেছিলেন। শামস্ প্রশ্ন করলেন, 'এগুলো কী?' মাওলানা উত্তর দিলেন, 'এগুলো মহামূল্যবান বাক্য। কিন্তু তুমি এর কী বুঝবে?' শামস্ সমস্ত পুস্তক পানিতে ফেলে দিলেন। মাওলানা চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমার কি দুঃসাহস! এর মধ্যে কিছু পুস্তক আমার পিতার রচিত পাণ্ডুলিপি যা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।' শামস্ তখন স্বীয় আঙ্গলের ইশারায় একটি একটি করে সকল পুস্তক পানি থেকে তুলে আনলেন; কিন্তু পুস্তক গুলোর কোনোটিই জলসিক্ত ছিল না। রুমি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার গোপন কৌশলটি কী?' শামস্ উত্তর দিলেন, 'খোদার ইচ্ছা এবং আধ্যাত্মিক অবস্থান। কিন্তু তুমি এর কী বুঝবে?' এরপর রুমি শামস্-এর পেছনে ছুটলেন এক সময় তাঁরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন এবং কিছুদিন নির্জনবাস করলেন।

আমার বিশ্বাস প্রথম বর্ণনাটিই সঠিক কারণ এটিই সর্বাপেক্ষা বাস্তব। এর মধ্যে সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে। এর একটি আশ্চর্য নাটকীয় গুণ রয়েছে। রুমি তাঁর খচ্চরের পিঠে এবং ছাত্রবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে চলেছেন। তিনি এক অশ্বারোহী রাজপুত্র, তাঁর অহং-এ রয়েছে জাঁকজমক, বিদ্যা, দীপ্ত এবং ক্ষমতা এবং কোনিয়ার বিপনিকেন্দ্রের মধ্যে, মোটা কৃষ্ণবর্ণের কাপড় গায়ে এক বৃদ্ধ তাঁর কাছে এসে এমন কিছু প্রশ্ন করলেন যা উদ্ভট মনে হয়, এমন একটি প্রশ্ন যার উপর তাঁর জীবনের পরবর্তীকাল নির্ভরশীল এবং যখন রুমি চিরাচরিতভাবে

www.pathagar.com

এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন তখন শামস্ এমন কথা বললেন যে, রুমি তাঁর খচ্চরের উপর থেকে পড়ে গেলেন। রুমি তাঁর খ্যাতি, তাঁর সুনাম, তাঁর জাঁকজমক, তাঁর ক্ষমতা থেকেই নিপতিত হলেন। মনে হল যেন শামস্ তাঁর অতীন্দ্রীয় আবেগ এবং প্রজ্ঞার তরবারি দিয়ে রুমিকে খণ্ডিত করে ফেললেন। এ প্রশ্নটি মোটেও সাধারণ প্রশ্ন নয় 'কে বেশি মহীয়ান! নবুওয়াতধারী মুসা না বেলায়েতধারী বায়েজিদ?' শামস্-এর এই প্রশ্নের রুমি চিরাচরিত উত্তর দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি আর কী করতে পারতেন? বিপনিকেন্দ্রের মধ্যে এই উন্মাদের সম্মুখীন হয়ে কোনিয়ার বিশিষ্ট তরুণ পণ্ডিত সাধারণভাবে গ্রহণীয় স্বাভাবিক উত্তরটিই দিলেন, 'অবশ্যই মুসা মহীয়ান! কারণ কুরআনে সবচেয়ে বেশি যে নবীর নাম উচ্চারিত হয়েছে এবং বনি ইসরাইলদের মধ্যে সবচেয়ে জাদরেল নবী মুসা। তাই তিনিই সবচেয়ে গৌরবান্বিত।' শামস্ তখন রুমির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, তাহলে নবুওয়তধারী মুসা কেন বেলায়েতধারী খিজিরের কাছে গেলেন জ্ঞান অর্জন করতে। বেলায়েতে বায়েজিদই সবচে মহীয়ান। নবুওয়াত আসে শরিয়তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর বেলায়েত আসে শরিয়কে সত্যায়ন করার জন্য। শরিয়তের উচ্চতম পরিষদের নাম বেলায়েত। আর শরিয়ত হচ্ছে বেলায়েতে প্রবেশের প্রথম ধাপ। নবুওয়াত আগমন করে সম্প্রদায়, জাতি ও গোত্রকে সহজ পথের সন্ধান দিতে। আর নবীরা হলেন সেই পথের দ্রষ্টা, পথ-প্রদর্শক। নবুওয়াত আসে অহীর মাধ্যমে প্রকাশ্যে, বেলায়েত আসে অন্তকরণে সিনায় সিনায় গোপনে। নবুওয়াত ধারা সকল কাওমের জন্য আর বেলায়েত ধারা শুধুমাত্র বেলায়েত প্রাপ্তদের জন্য।

বেলায়েত হল—সত্য পথের সারথীদের মিলনকেন্দ্র। যেখান থেকে সত্যের জ্যোতি নিক্ষিপ্ত হয় সন্ধানীদের অন্তর মানসে। আর এই অন্তর মানস—যেখানে স্রষ্টার জ্যোতি জ্যোতির্ময়তার বিকিরণ ঘটায়।

মাওলানা রুমি এবার অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন শামস্ তাবরিজের দিকে। শামস্ আবার বললেন, 'ওহে মাওলানা! এখানে নবুওয়াতধারী মুসা বলতে শুধুমাত্র মুসাকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু বায়েজিদ বলতে নবীশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত ও বেলায়েতের উত্তরাধিকারী মহান সাধকসত্তা বায়েজিদকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ বায়েজিদ দুই গুণের সমন্বয় সাধনকারী। তাই তিনিই বেশি মহীয়ান। উম্মতে মুহাম্মদের বেলায়েত জ্ঞান অন্যান্য নবীদের চেয়ে মহীয়ান। মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু নবীকুলের সরদার আর প্রত্যের নবীর ললাটেই নূরে মুহাম্মদের ধারা বংশপরম্পরা বর্তমান আর বায়েজিদ হচ্ছে তারই উম্মত তাই অন্যান্য নবীদের থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর বেলায়েত ধারী উম্মত মহীয়ান। আর জেনে রেখো, উম্মতে মুহাম্মদীর বেলায়েতের ভেতর সর্বগুণের সমন্বয় ঘটেছে। শরিয়ত, তরিকত, মারেফত

www.pathagar.com

হাকিকত তথা বেলায়েত সর্বগুণই মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান আদর্শের বৈশিষ্ট্য। আর তাই বেলায়েত ধারায় বায়েজিদ বলেছেন, আনা সুবহানি মা-আজামুশানিই, 'আমি কত গৌরবময়। আমার মর্যাদা কত উচ্চ।'
রুমি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর জ্ঞান লোপ পেল। প্রকৃতপক্ষে তিনি জ্ঞানশূন্য হননি, তিনি আত্মসমাহিত হলেন, তিনি নির্বাক আনন্দলোকে প্রবেশ করলেন। ঐ মুহূর্তে তাঁর সত্যদর্শন হলো, তিনি এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, বায়েজিদ আত্মার অবর্ণনীয় মর্যাদা এবং গৌরব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁর সমস্ত চিন্তা, তাঁর সমস্ত সত্তা, তিনি যা সমস্ত বুঝেছিলেন বলে চিন্তা করতেন, সমস্ত কিছু, সেই শামস্ প্রদত্ত শক্তি এবং ভালোবাসায় সম্পূর্ণভাবে এবং চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এই শক্তি এবং ভালোবাসা তাঁকে ধ্বংস করে পুনর্গঠিত করল।

প্রিয়তমের রূপ হঠাৎ করে হৃদয় থেকে তার মাথা উঠাল
দিগন্ত থেকে চন্দ্রোদয়ের মতো, একটি শাখা থেকে উত্থিত পুষ্পের মতো—
বিশ্বের সকল রূপ তাঁর রূপের দিকে ধেয়ে এল,
চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ডের মতো।

এবং রুমি উঠে দাঁড়ালেন, নিঃশব্দে শামসের দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁর হাত ধরলেন এবং সারাবিশ্বের শত্রুতা ও বোধগম্যতার অতীত হওয়া সত্ত্বেও সেই হাত ধরে থাকলেন, তাঁর গুরুর প্রতি আনুগত্য তাঁকে যে অপরিসীম দুর্দশাগ্রস্ত করেছিল তা সহ্য করেও ধরে থাকলেন। শামসের হস্তের আকর্ষণে তিনি মিথ্যা অহং-এর দহনের ভয়াবহতা এবং সকল পরীক্ষা অতিক্রম করে ক্ষতি, শোক, নিঃসঙ্গতা ও মানসিক বিকৃতির সমীপবর্তী হয়ে এগিয়ে গেলেন, যে পর্যন্ত ভালোবাসার অনল তাঁর কাজ না করল, রুমি 'সুপক্ব' হলেন এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলেন, তিনি এবং শামস্ চিরন্তন প্রভায় এক হয়ে রইলেন—এক ভালোবাসা, এক অগ্নি, এক শক্তি, এক সূর্য।
আরেকবার আমরা শামস্-এর বিজয় মিলনের বর্ণনায় মনোনিবেশ করি, এই পূর্ণ বর্ণনা করেছেন রুমির পুত্র সুলতান ওয়ালাদ :

> 'সন্ধানী হচ্ছে সে যে খুঁজে পায়, কারণ প্রেমাস্পদই প্রেমিকে পরিণত হয়। অতীন্দ্রীয়তার পথে আমার পিতার সর্বোচ্চ পথপ্রদর্শক ছিলেন শামস্-ই-তাবরিজ। খোদার অভিপ্রায় ছিল যে, শামস্ কেবলমাত্র তাঁর নিকট প্রতিভাত হবেন এবং কেবলমাত্র তাঁর জন্যই হবেন। অন্য আর কেউ এরূপ দর্শনের উপযুক্ত ছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, মাওলানা শামসের মুখমণ্ডল দেখলেন এবং সকল গোপনীয়তা

www.pathagar.com

তাঁর নিকট দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি তাঁকে দেখলেন যিনি দৃষ্টিগোচর হন না, তিনি তাঁকে শ্রবণ করলেন যিনি পূর্বে শ্রুত হন নাই। তিনি তাঁর সঙ্গে ভালোবাসায় আবদ্ধ হলেন এবং তাঁর বিলয় ঘটল।'

যে-চল্লিশ দিন শামস্ এবং রুমি একান্তে ছিলেন, সেই ক'দিনে এক বিশাল পরিবর্তন সংঘটিত হলো, শামসের হৃদয় থেকে রুমির হৃদয়ে ঐশী গোপনীয়তা প্রবাহিত হলো, শামস্ যে গোপনীয়তার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আরও দুটি প্রয়োজনীয় ধাপ রুমিকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। আমরা যখন রুমির পরবর্তী তিন বৎসরের অতীন্দ্রীয় শিক্ষার কথা চিন্তা করি, তখন তিনি কীভাবে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা ধারণা করতে পারি না, কারণ এই শিক্ষার প্রচণ্ডতা এত মহান, এত বিশাল ও এত কষ্টসাধ্য ছিল! কিন্তু এই দুরন্ত গতি, প্রাবল্য, তীব্রতা এবং হিংস্রতার প্রয়োজন ছিল রুমির পরিবর্তনের জন্য। শামস্ জানতেন যে, তাঁর সময় খুব অল্প, রুমি যা প্রকাশ করার জন্য মনোনীত সেই শিক্ষার জন্য তাঁকে চূড়ান্তভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হতে হবে, নইলে এই শিক্ষা কার্যকর হবে না।

এর পরের ঘটনা হলো: তাদের সম্মানিত, সুদর্শন ও গর্বিত তরুণ গুরু এবং অখ্যাত এক উন্মত্ত দরবেশের মধ্যে যে আবেগপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং রুমি তাঁর জীবনে এই সম্পর্ককে এত গভীরভাবে মর্যাদা দান করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে এত সময় অতিবাহিত করছিলেন যে, রুমির শিষ্যরা এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। তারা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে শামস্‌কে বিদ্রূপ করতো এবং ঘৃণা করতো। তারা শামস্-এর সঙ্গে এত দুর্ব্যবহার করতে থাকল যে শামস্ প্রথমবারের মতো সহসা চলে গেলেন। এই বিচ্ছেদের বেদনায় রুমি উন্মাদপ্রায় হয়ে গেলেন, কারণ এর মধ্যেই তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, শামস্ কত মহান পুরুষ এবং শামস্ এর চিত্ত এবং মনের গভীরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্য লুকানো আছে। তিনি আধ্যাত্মিকভাবে এবং প্রতিবিধানের অসাধ্যভাবে শামস্‌কে ভালোবেসেছিলেন। সেজন্য প্রথম বিচ্ছেদকালে রুমি উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বেদনায় এতই কাতর হয়েছিলেন যে, যাত্রীগণ এবং ভ্রমণকারীগণ কোনিয়ার যেস্থানে আসতেন সেখানে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করতেন: 'তোমারা কি শামস্‌কে দেখেছ? তোমরা কি শামস্-ই-তাব্রিজকে দেখেছ?' কয়েকমাস বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় কালক্ষেপণ করে তিনি শুনতে পেলেন, শামস্ দামাস্কাসে অবস্থান করছেন এবং তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুলতান ওয়ালাদকে শামস্‌কে ফিরিয়ে আনার জন্য দামাস্কাস পাঠালেন।

সুলতান ওয়ালাদ দামাস্কাস গিয়ে শামস্‌কে খুঁজে বের করলেন এবং তাঁকে কোনিয়া ফিরে আসতে রাজি করালেন। কোনিয়া ফেরার পথে সুলতান ওয়ালাদ

www.pathagar.com

শামসের ঘোড়ার লাগাম ধরে পদব্রজে তিনমাসের পথ অতিক্রম করলেন। সুলতান ওয়ালাদ বর্ণনা দিয়েছিলেন যে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের বেদনাশেষে যখন শামস্ এবং রুমি মিলিত হলেন, তাঁরা দৌড়ে গিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন এবং 'প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে পৃথকভাবে চেনা যাচ্ছিল না।'

পুনর্বার শামস্ এবং রুমি গভীরতম অতীন্দ্রীয় মিলনে মিলিত হলেন। তাঁরা দীর্ঘ আনন্দময় ধ্যানে নিমগ্ন হলেন, তাঁরা নৃত্য করলেন, তাঁরা গাইলেন এবং তাঁরা ঐশী গোপনীয়তা বিনিময় করলেন এবং ভাবের এই সঞ্চালন দুরন্ত শক্তিতে সংঘটিত হতে থাকল। পুনর্বার শিষ্যদের ঈর্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকলো, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের ঈর্ষা বেড়েই চলল, ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দের সেই ভয়ংকর মুহূর্ত পর্যন্ত, যখন রুমির দ্বারে কেউ করাঘাত করল। শামস্ শান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার সময় এসেছে। আমি যাচ্ছি। মৃত্যু আমাকে আহ্বান করছে।' তিনি সেই রাত্রিতে বের হয়ে গেলেন এবং এরপর তাঁকে আর কেউ দেখেনি।

রুমিকে কেন এই জটিল ও কঠোর যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছিল? দিওয়ানে শামস তাবরিজে রুমি স্বয়ং লিখেছেন :

আমার দেহরূপ দ্রাক্ষা কেবল তখনই সুরা হতে পারে
যখন সুরা প্রস্তুতকারী আমাকে পদদলিত করে।
আমার সত্তাকে আমি দ্রাক্ষার মতোই তাঁর পদতলে সমর্পণ করি
যাতে আমার অন্তরাত্মা আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে নাচতে পারে।
যদিও আঙুরের রক্ত ঝরতে থাকে এবং সে ক্রন্দন করে বলে,
'আমি আর সহ্য করতে পারছি না এই যন্ত্রণা, এই নিষ্ঠুরতা'
পদদলিতকারী কানে তুলো গুঁজে বলে: 'আমি অবুঝের
মতো কাজ করছি না। তুমি চাইলে আমাকে অস্বীকার করতে পার,
তোমার বহুবিধ কারণ রয়েছে,
কিন্তু আমিই হচ্ছি সেই ব্যক্তি যে এই কাজে পারদর্শী।
এবং আমার আবেগে মথিত হয়ে তুমি যখন পূর্ণতা লাভ করবে
তখন আমার প্রশংসা করতে তুমি কোনোদিনই ভুলবে না।'

রুমিকে ভালোবাসা দিয়ে বিচূর্ণ করে ভালোবাসায় পরিণত করার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল শূন্য করে ভেঙে আবার পুনর্নির্মিত করার, প্রয়োজন ছিল দগ্ধ করার যাতে অনল তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে এবং সত্তা হিসাবে তাঁর মধ্যে অবস্থান করে তাঁর সত্তাকে সময়মতো স্বয়ং প্রতীকরূপে ব্যবহার করে।

রুমির যন্ত্রণাভোগের প্রতিটি স্তরের একটি স্বর্গীয় উদ্দেশ্য ছিল। যখন তাঁদের আনন্দময় মিলন অচ্ছেদ্য বলে মনে হচ্ছিল, সেই সময়েই শামসের সঙ্গে

www.pathagar.com

প্রথমবার বিচ্ছেদ রুমির মধ্যে শামস্-এর জন্য অকল্পনীয় মিলনাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল, যাতে রুমির হৃদয়, মন এবং আত্মার প্রতিটি কোষ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল এবং একটি অন্ধকার শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল যা শামস্-এর আলোকোজ্জ্বল উপস্থিতি কামনা করছিল। সেজন্য শামস্ যখন ফিরে আসলেন তখন তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রুমির তীব্র কামনা দ্বারা সৃষ্ট শূন্যগর্ভ পরিশীলিত অন্তরে আর গভীরভাবে, উন্মত্তভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে আলোকিত সত্তা প্রবাহ সঞ্চালিত হতে থাকল।
কিন্তু এটাই 'সুরা প্রস্তুতকারীর পদদলিত' করার শেষ পর্যায় ছিল না। একটি শেষ উন্মোচন, পরিত্যাগের একটি শেষ মৃত্যু, একটি শেষ দীক্ষার প্রয়োজন ছিল যার পর রুমি শামস্-এর সঙ্গে এবং শামস্-এর অবয়বে বিম্বিত চিরন্তন প্রেমাস্পদের সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিত হতে পেরেছিলেন এবং শামস্-এর চোখে প্রতিভাত রহস্য উন্মোচনের আলোকচ্ছটায় আলোকিত হতে পেরেছিলেন। অতিক্রম করার জন্য একটি বড় বাধা ছিল—বাধা ছিল যে, যদিও শামস্ অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং আলোকময় ছিলেন তবুও জীবিত শামস্ রুমি ও চিরন্তন জ্যোতির্ময়তার মধ্যে একটি পর্দার মতো বিরাজ করছিলেন। শামসের ভালোবাসা এবং তাঁর উপলব্ধির গৌরব রুমিকে ধাপে ধাপে, চেতনা থেকে চেতনান্তরে, ক্ষমতা থেকে ক্ষমতার চূড়ান্ত উপলব্ধির প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। এখন রুমি এবং চূড়ান্ত চেতনার মধ্যে, মাহাত্ম্যের মধ্যে যে-ব্যবধান থাকল তা হলো স্বয়ং শামস্, অন্যকথায়, শামস্‌ের প্রতি রুমির পবিত্র আকর্ষণ। এই সর্বশেষ বাধা অপসারিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। শামস্‌কে তাঁর দেহের আশ্রয় থেকে দূরীভূত হতে হয়েছিল, রুমির নিকট থেকে শামসের দৈহিক উপস্থিতি প্রত্যাহৃত হয়েছিল যাতে তাঁর দেহাতীত সত্তা রুমির হৃদয়ের কন্দরে তাঁর চূড়ান্ত গৌরবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে পারে এবং স্বর্গীয় ভালোবাসা স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে তাঁর বিজয় ঘোষণা করতে পারে।
শামস্‌ের যখন শেষবার অন্তর্ধান ঘটল, সম্ভবতঃ তিনি নিহত হলেন এবং হয়তোবা রুমির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারাই, তখন রুমি পুনর্বার হতচেতন হলেন। দীর্ঘকাল তিনি কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাননি। শোকে উন্মাদ হয়ে তিনি পথে পথে গান গেয়ে, নেচে এবং কেঁদে বেড়াতেন। নৃশংস বেদনার দহনে মিথ্যা অহংয়ের সর্বশেষ অংশ, আত্মসচেতনতার অবশেষ, শামসের সঙ্গে বিচ্ছেদজনিত পিপাসাদগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তারপর, অতিধীরে, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এই অলৌকিকতা তাঁর কাছে ধরা পড়ল যে, শামসের মৃত্যু ঘটেছে তাঁরই অন্তরে পুনরায় জন্ম নেওয়ার জন্য। বেদনার অনল স্থানকালের ঊর্ধ্বে তাঁর প্রেমাস্পদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে তাঁর সমগ্র সত্তাকে এবং তাঁকে রূপান্তরিত করেছে স্বর্গীয় স্বর্ণের গৌরবময়তায়। এই আনন্দময় নিশ্চয়তায় রুমি অমরত্বে

www.pathagar.com

বিলীন হলেন। আশেক মাশুকের এই প্রেমের খেলা জগদ্বাসীকে বিমোহিত করল। জগদ্বাসী তাই জানতে চায় মাওলানা রুমির সেই প্রেমতত্ত্বকে যে আত্মায় একাকার হয়ে রুমি খোদার এত কাছে পৌঁছে গেলেন যে সেই জ্যোতির্ময়তার প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব নতুন আলোর মুখ দর্শন করল। বিশ্বভূবনে ছড়িয়ে পড়ল জ্ঞানের অগ্নিপ্রবাহ—সন্ধানীদের কৌতূহল হলো সেই জ্ঞানকে জানার যার একবিন্দু পান করলে সেই জ্যোতির্ময়তার ধারা চির অমরত্ব দান করে মাশুকের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়।

মাওলানা রুমিকে বলা হয়ে থাকে প্রেমিকজগতের প্রবাদপুরুষ। তাই তাঁর রচিত সমস্ত প্রেমতত্ত্বমূলক দিওয়ানসমূহের তাত্ত্বিক ভেদ সকল সন্ধানীর অন্তর মানসে ইশকের নহর সৃষ্টি করে। এভাবে রুমি ও শামস তাবরিজের ঘটনাপ্রবাহ সুদীর্ঘ সময় ধরে বর্ণনা করছিলেন আল্লামা ইকবালের প্রিয় দীক্ষাগুরু মাওলানা সাইয়েদ মীর হাসান। এ সময় ইকবাল যেন ইশ্‌কের এক নতুন জগতে নবজীবনের সন্ধান পেলেন। পরবর্তী সময়ে ইকবালের সমস্ত লেখায় ও কাব্যে সেই ইশ্‌কের জ্যোতির প্রকাশ লক্ষ্যনীয়।

www.pathagar.com

টমাস আরনল্ড : ইকবালের অনন্য শিক্ষক

দর্শন শাস্ত্রের প্রতি ইকবালের গভীর আগ্রহ ছিল। ১৮৯৮ সালে তিনি পুনরায় লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের দর্শন বিভাগে ভর্তি হন। এখানেও তিনি আর একজন খ্যাতনামা শিক্ষকের সন্ধান পেলেন, যিনি দর্শন শাস্ত্র ছাড়াও ইসলাম ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদৃত ছিল। তিনি হলেন প্রফেসর টমাস আরনল্ড। তিনি একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি নিয়োগ-পত্র নিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন।

টমাস আরনল্ডের সাহচর্যে এসে ইকবাল মাওলানা মীর হাসানের অভাব মোচন করলেন। তাঁর সান্নিধ্যে ইকবালের ঐশী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি আরও বেশি কৌতূহলের জন্ম হল এবং দর্শন জ্ঞানের রাজ্য দ্রুত প্রসারিত হতো লাগলো। তিনি তাঁর কাছ থেকে বিশ্বজ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে অবহিত হতে লাগলেন। টমাস ইকবালের মতো অনুসন্ধানী ছাত্রকে পেয়ে অশেষ খুশী হলেন। উভয়ের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হতো। এসব উচ্চাংগের আলোচনা ইকবালের জন্য ছিল অমৃতের ন্যায়। লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রফেসর টমাসকে ইকবালের অনন্য শিক্ষাদাতা বলা চলে। তিনি বলতেন, 'এ ছাত্রই শিক্ষককে (আমাকে) অধিকতর জ্ঞানী করে তুলেছে।'

ইকবাল প্রায় দু'বছর তাঁর স্নেহছায়ায় শিক্ষা লাভ করে ১৮৯৯ সালে প্রথম বিভাগে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন এবং কৃতিত্বের স্মৃতিস্বরূপ স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁর এ মহান শিক্ষক দর্শনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ও ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ও ডুবুরী ছিলেন। এ সময় ইউরোপে রুমির পাশাপাশি সবচেয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত ও দর্শনের ভাবধারায় রচিত দিওয়ানসমূহ ও সুফির অভিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ যা ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া আরও দুজন কবির আধ্যাত্মিক কাব্য ও রুবাই ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে– মহাকবি হাফিজের দিওয়ান ও ফরীদুদ্দীন আত্তারের মানতিকুত তোয়ারের নামক রহস্য গ্রন্থ।

www.pathagar.com

অধ্যাপক টমাস আরনল্ড প্রিয় ছাত্র ইকবালের প্রতি অত্যন্ত সদাশয় ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি লক্ষ করলেন দর্শনের পাশাপাশি ইকবালের প্রবল আগ্রহ ছিল ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি। তিনি আরও গভীরভাবে খেয়াল করলেন ইকবাল সুফিতত্ত্ব ও খোদার ঐশীজ্ঞান রহস্য সম্পর্কে অসীম কৌতূহলী। ইসলাম সম্পর্কে যেমন তাঁর দরদ অপরিসীম তেমনি নবী মুহাম্মদের আদর্শের প্রতি ইকবালের ভালোবাসা সীমাহীন।

টমাস আরনল্ড মুহাম্মদী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং রুমি, হাফিজ, আত্তার ও খৈয়ামের রুবাই, দিওয়ান ও দর্শনের অনুসন্ধানী ডুবুরী ছিলেন। তাই ইকবালের সাথে ইউরোপের জনপ্রিয় এই সকল মুসলিম কবির কাব্য ও দর্শনের পরিচয়ের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হলেন। ইকবাল তখনও বুঝে উঠতে পারেননি মুসলিম কবিদের কাব্য, দর্শন ও আধ্যাত্মিক দিওয়ানসমূহ ইউরোপ ছাপিয়ে সমগ্র বিশ্বে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গেছে। পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদ হয়ে ভারতবর্ষে এমনকি আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

দর্শনের এই মহান অধ্যাপকের নিকট ইকবাল শিক্ষা জীবনের দ্বিতীয় বর্ষের শুরুতেই ইউরোপে জনপ্রিয় মুসলিম কবিদের কাব্য সাহিত্য ও দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে থাকে। এ সময় পুরো একটি বছর ইকবাল অধ্যাপক টমাস আরনল্ডের আবাসিকগৃহে সন্ধ্যার পর মিলিত হতেন। ছুটির দিনগুলিতে পুরো সময় ধরে আলোচনা চলত। একদিন বিশ্বপ্রসিদ্ধ মহাকবি ওমর খৈয়ামের দর্শনতত্ত্ব ও রুবাই সম্পর্কে টমাস আরনল্ড অত্যন্ত জ্ঞানগর্ব আলোচনা করছিলেন : তিনি বলছিলেন ওমর খৈয়ামের ইউরোপ জয়ের কথা। বিশ্বপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মনীষী ও বিদগ্ধ গুণীজনদের বিশ্বমতে খৈয়ামের দুনিয়া শ্রেষ্ঠ কবিতাটি। এডওয়ার্ড ফিটসজেরাল্ডের ইংরেজি অনুবাদে তার প্রকাশ:

Here with a little Bread beneath the Bough
A Flask of Wine, a Book of Vesce-and thou,
Beside me Singing in the Wilderness–
Oh, Wilderness were Paradise enow!-Fitz-Gerald.

ফার্সীতে যা ছিল :

তুংগী মেই লা-ল খোহাম ব' দিওয়ানী
সদ্দ রমকী বায়েদ ব' নিকসে নানী
ব' নগা মান ব' তো নিশসতে দর ব'রানী
খোশতর বুদ আয মামলাকাতে সুলতানী ॥

www.pathagar.com

রুবাইটির সরল বাংলা তরজমা হল—

এক বোতল চুনিলাল মদ আর একটি কবিতার বই
জীবন বাঁচাতে চাই আর একটু রুটি—সঙ্গে তুমি সই;
যদি কোনও ছায়াচ্ছন্ন বিরান মাঠের কোণে বসে
এমন বেহেশত কারও ভাগ্যে জোটে না নিশ্চয়ই।

সাদা কথায় তরজমা এ রকম—

আমি চাই এক তুংগি (সোরাই) লালমদ এবং একখানা দিওয়ান (কবিতার বই), দেহ মনকে যৌথভাবে কার্যকর প্রয়োজনে চাই এক গ্রাস (কামড়) রুটি এবং সে সময় তুমি আর আমি নির্জনে বসি কোনও বিরান স্থানে, যা একজন সুলতানের রাজত্বের চাইতে অনেক বেশি আনন্দদায়ক।

এখানে ফিটসজেরাল্ড 'মামলাকাত' সুলতানী বা সুলতানের রাজত্বের বদলে জুড়েছেন *'Paradise anow* বা *Paradise enough'*- যথেষ্ট স্বর্গ। সুলতানের রাজত্বকে যথেষ্ট স্বর্গ মনে করেননি। অথচ খৈয়ামের যুগে সুলতান মাহমুদের রাজত্ব ও বিলাস জীবন যাপন যে কোনও ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত স্বর্গের চাইতে অধিক মজার ছিল। এটা অবশ্য ইউরোপকে ভোলাবার জন্য দান্তে ভার্জিল মিলটনের প্যারাডাইসের ছ্যাঁকা বলা চলে।

অধ্যাপক এ জে আরবেরির মতে পৃথিবীর শিক্ষিত লোক মাত্রই খৈয়ামকে জানে, অন্তত একটি কবিতা তাদের কাছে পৌঁছে গেছে, তা হল—

A Flask of wine, a Book of verse-and thou
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র
অল্প কিছু আহার মাত্র
তোমায় সঙ্গে নিয়ে

মহাকবি ওমর খৈয়ামের মনের এই আকুলতা— একটি কবিতার বই, এক পেয়ালা আঙ্গুর রস ও একজন তরুণী বালিকা যে কিনা অনন্ত প্রেমের অমৃত শুধায় পরিপূর্ণ করে দেবে ওমর খৈয়ামের সমস্ত কামনা-বাসনাকে। তাঁর এ বোধ ও অন্তরানুভূতি কত গভীর, কত আবেদনময় বিশ্বভাবুক মাত্রই তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা তাই বলেন—*It is one of the most frequently quoted of the lyric 'Rubaiyet' and any of its images such as 'A jug of wine, a Book of Verse-and thou' theory have passed into current courrency.*

www.pathagar.com

ইংরেজি ভাষার জিম্মায় খৈয়াম অন্যদের কাছে পরিচিত হলেও তাঁর নিজের ভাষা ফার্সি কম সুললিত ও মধুর নয়, এক সময় এ ভাষা পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছিল, জার্মানরা বলতেন, 'যবানে ফার্সি শীরিনাস্ত মগর খাইলে দিশব'রাস্ত'-ফার্সি ভাষা মধুর তবে কঠিন।

এখন মূল রুবাই বা প্রথম রুবাই থেকে দুটি শব্দ নিয়ে আরবেরি দেখিয়েছেন, 'তুঙ্গি' যার অর্থ হল বোতল, আর 'দিওয়ানী' যার অর্থ হল কবিতার বই। ফার্সি কাব্য মানেই হল দিওয়ান, গ্যাটে জর্মানি ভাষায় ফার্সি কবিতার যে সংকলন বের করেন তাকে বলেন, *'Divan 1819'*। সদ্দ-ই-রমকি-দেহ ও মনযুক্ত না হলে কাব্য বোঝার জন্য মগজও ঠিক রাখা যায় না। তাই 'তুঙ্গি ও দিওয়ান' থেকে যৌথভাবে যাতে করে রসাস্বাদন করা যায় তার ব্যবস্থা করে গেছেন খৈয়াম।

তাই খৈয়াম তাঁর রুবাইয়াত থেকে কখনও 'দিওয়ান' বাদ দিতে পারেন না। বেহেশতের ফিরিস্তি বানাতে অবশ্যই দিওয়ানের প্রয়োজন। এ কথাটি সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর বইকেনা প্রবন্ধ যখন লেখেন তখনই উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানি অনন্ত যৌবনা—যদি সেই সে বই (ওমর খৈয়ামের বইয়ের মতো) হয়।

সারা জীবন দর্শনে ব্যয় করার জন্য বাল্যকালের শিক্ষাকে ভিত্তি করেই তো মজবুত থাকে সকলে, তা নাহলে অধীত বিদ্যা জোব্বার জেবের ভেতর না রাখার যুক্তি এবং জীবন যুদ্ধ তো এখানে। এ জ্ঞান কি জোব্বার পকেটমার? ওমরের অভিজ্ঞতার বিবেচনায় কি বলা যায়,

My self when young did eagerly frequent
Doctor and Saint and heard great argument
about it and about, but evermore
Come out by the some door wherein I went. Fitz

হ্যাঁ, সত্যি তাই, খৈয়ামই তো বলেছেন একথা—
ইয়াক চান্দ বুদকী বউসতাদ শুদমী
ইয়াক চান্দ বউসতাদ খোদ শাদ শুদীম
কাইয়ান সখনে শোনো যে মারা চে রসীদ
আয খোয়াকর আযীম ব' বরবাদে শুদীম

অর্থাৎ বাল্যকালে মাদ্রাসায় উসতাদের কাছে কিছু শিখতে গিয়েছিলাম। মনে ছিল অফুরন্ত উৎসাহ আর আগ্রহ, তা দিয়ে জ্ঞান বুদ্ধির যথেষ্ট সওদা সেরে

www.pathagar.com

জোব্বায় ভরিয়েছি। কিন্তু শিক্ষা শেষে মনে হল হায়! যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম ঠিক সে দরজায় দিয়ে বেরিয়েছি, বুঝলাম কিছু তো লাভ হলই না, বরং যা ছিল তাও বরবাদ হল।

অর্থাৎ ওমর খৈয়াম তাঁর সুফি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ করেছেন। সুফিরা প্রেমের পূজারী, তারা খোদার সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় কিন্তু প্রচলিত শরিয়তে স্রষ্টা সৃষ্টিতে ব্যবধান থাকায় আল্লাহর সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। কারণ প্রেম হয় সমানে সমানে। আর শরিয়তের আল্লাহ হলেন প্রভু আর বান্দা হলেন তাঁর দাস। কিন্তু সুফির আল্লাহ হলেন প্রেমিকা আর বান্দা হলেন প্রেমিক। আর এর প্রধান বস্তু 'প্রেম' যাকে রূপকভাবে শরাব বা মদ হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এই মদ বা শরাব যিনি পরিবেশন করেন তার রূপক হল সাকী।

শরিয়তে সেই সুরা বা শরাব আস্বাদন সত্যিই সত্যিই নবী হারাম করেছেন কিনা? সে সম্পর্কে খৈয়ামের মনে সন্দেহের অবকাশ জাগে একটি হাদিসের মাধ্যমে তা হল, 'লা সালাতা ইল্লা বি হুজুরীল কাল্ব' অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির সালাত হয়নি যে ব্যক্তি প্রেমোমত্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে পারেনি।'

তাই খৈয়ামের এই সুরা আস্বাদন রূপকার্থে মদ হলেও সুফির দৃষ্টিতে তা খোদার প্রেম উপলব্ধির পরম বস্তু। কিন্তু মুসলিম সমাজের জন্য সুরা আস্বাদন হারাম হয়ে যাওয়ার কারণে ওমর খৈয়াম কোন্ প্রকার শরাব হারাম হল এমন বিষয়ে মুসলমানদের প্রিয়নবী (সা.)-কে তাঁর রুবাইয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

কার সায়ীদ হাশমী চিরা দওগ তুরাশ
দার শরা হালাল আস্ত দার শরাবে হারাম

অর্থাৎ হাশমী বংশের সরদার নবী মুস্তফার কাছে খৈয়ামের সালাম পৌঁছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করো, তিনি টক বা বাসি শরাকে (ইসলামের বিধি বিধান) হালাল করেছেন আর শরাবকে (পরম প্রেমের মত্তবস্তু) কেন হারাম করেছেন? শরা ও শরাব, পার্থক্য শুধু একটা ব বা 'বে' যুক্ত হওয়া, সুফি রিসালায় 'বে' অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিবিম্ব। সুফি পানপাত্রে তাই পান করা হচ্ছে আল্লাহর দিদার অর্জন করা।

অন্যদিকে কট্টরপন্থী আলেম ও বকধার্মিকদের ধর্মজ্ঞান ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে খৈয়াম বলেন, 'যারা ধর্মের সত্য জ্ঞানের ধারক তারা নবীর সত্যিকার অনুসরণকারী, তারাই প্রকৃত ধার্মিক, তাদের বিশ্বাস জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত কিন্তু গোঁড়া ধার্মিক মানুষের বিশ্বাস পাষাণপ্রায়, চরিত্র

www.pathagar.com

বিকারগ্রস্ত, মৃত্যুও হয় তো তাঁদের বিশ্বাস স্বভাব খসিয়ে নিতে পারে না। অন্য ধর্ম কিংবা ধর্মে উদাসীনতা সম্পর্কে তাদের মনোভাব চেতনারিক্ত অহিষ্ণু, তাদের সামান্য মঙ্গলও কামনা করতে পারে না। বিধর্মী কারও মৃত্যু হলে 'ফী নারে জাহান্নামা' বা জাহান্নামে জ্বলার বদদোয়া সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করে, সামান্য সমবেদনা ভুলেও দিতে পারে না। অন্য ধর্মের গোঁড়াদের মনে যাই থাক কিন্তু প্রকাশ্যে মুখে এমন উচ্চারণ হয়তো তাদের নেই।

হিন্দুধর্মে ছোঁয়াছুয়ির সমস্যা আছে সেটা অন্য কথা। সে যুগের অন্ধবিশ্বাসী, বকধার্মিকেরা দার্শনিক, কবি ও সুফিদের প্রতি নির্যাতন, নিগ্রহ এমনকি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। বহু আল্লাহওয়ালা সুফি এতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন মিথ্যে অজুহাতে। মনসুর হাল্লাজ তাদের মধ্যে অন্যতম।

ধর্মের কট্টরপন্থীরা এমন রীতি ও কৃষ্টির সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের মতের বিরুদ্ধ হলে মুহূর্তে গর্দান কেটে নিতে দ্বিধা করত না। কিন্তু তা প্রকৃত অর্থে নবীর শিক্ষা ও ধর্মের বিধানের বিরুদ্ধ ছিল না বরং তাদের মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধ হলেই তারা শিরকের ফতোয়া আরোপ করতো।

কিন্তু তাদের এমন হিংস্র হবার কারণ কি? মৌলবাদ অকস্মাৎ সৃষ্টি হয় না, আশৈশব পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক অসুস্থ শ্রুতিলব্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার বদ্ধপরিকর করার পরিস্থিতি হলে, ভয় ভক্তি ভরসার জায়গা অন্ধসংস্কারে আবদ্ধ হলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে শাস্ত্রশাসিত জীবন যদি কড়া শিকল প্রথায় বেঁধে বেঁধে বৃদ্ধি পায় সেখানে মৌলবাদ গড়ে ওঠে। সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি অনুভূতির জায়গায় এমন এক গণ্ডি স্থান করে নেয় যা জ্ঞান নামের অন্ধত্ব ও অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ অধর্ম অবিদ্যা শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে নেয়। ফলে এমন এক বিশ্বাসের জন্ম নেয় যা নিজেকে বাধাগ্রস্ত করলে সমস্ত কিছুকে ও পারিপার্শ্বিকতাকে ধ্বংসের জন্য প্রলুব্ধ করে। এটা থেকে যে কট্টরতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাই মানসিক বিকারগ্রস্ত মৌলবাদী চেতনা। যে কেউ এ ধারণাকে সত্য বলে ধারণায় বদ্ধমূল করে নেয়। একটা বয়সের পর তাকে আর সুস্থ আলোবাতাসে মৌলবাদের বাইরের আর কোনও চেতনা দিতে পারে না। এই বিকৃত অনুভূতি থেকে শাস্ত্র বাক্য বা প্রতারণা বিশ্বাস ভক্ষিত করে করে সে তখন গোড়া ধার্মিক হয়, কিন্তু এটা নবীর আদর্শের অনুসারী প্রকৃত ধার্মিক নয়। বকধার্মিকের আপন বিষ আপনাতে স্থিত রাখলে তার জন্য অন্যের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এমন ব্যক্তি যদি রাজনৈতিক কিংবা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় তখনই বিপত্তি দেখা দেয়। গোড়া ধার্মিক মানুষরা দম্ভ ভরে নিজের তরক্কি দাবি করতে থাকে। কিন্তু সুফি দর্শন ও নবীর শিক্ষা তার সম্পূর্ণ বিপরীত এমনকি কুরআনিক শিক্ষাও এই নীতি আদর্শের বিপরীত। আমিত্বের বিনাস করে আল্লাহতে আত্মসমর্পনই ইসলাম ও মুসলমানের প্রকৃত শিক্ষা।

www.pathagar.com

কিন্তু গোড়া ধার্মিকরা ক্ষমতা, প্রতিপত্তি তথা অর্থ সম্পদ লিপ্সু হয়ে থাকে, যা বাইরে প্রকাশ করে না। কোনও প্রকার কর্তৃত্ব হস্তগত হলে নিরীহ অসহায় মানুষের ওপর সে প্রভাব খাটায়, ধর্মের প্রয়োজন ভেবে তাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। এ ছাড়া তাদের দুনিয়া দেখার আর কোনও মওকা থাকে না, দুষ্কর্ম সেরে এসে পুনরায় তারা ধার্মিকের লেবাস পড়ে মিথ্যে মুসল্লির খাতায় নাম লেখায়। খৈয়াম অনেক সময় এমন ধার্মিক লোকের দ্বারা নিগৃহীত ছিলেন, তারা খৈয়ামকে নাস্তিক-কাফির বলে নিন্দা করে কিন্তু তিনি জানেন তাদের চরিত্র কত ভালো, তাই রুবাইতে প্রকাশ করলেন—

বা মান তু হার আনচে গোয়ী আয দীন গোয়ী
পীওয়াস্তে মারা মালহদ বেদীন গোয়ী;
মান মা বরফম হর আনচে হাস্তম লেকিন
ইনসাফ বাদে তুরা রসীদ দীন গোয়ী

অর্থাৎ

নাস্তিক আর কাফ্রি বলো তোমরা লয়ে আমার নাম
কুৎসা গ্লানির পঙ্কিল স্রোত বহাও হেথা অবিশ্রাম।
অস্বীকার তা করব না যা ভুল করে যাই, কিন্তু ভাই
কুৎসিত এই গালি দিয়েই তোমরা যাবে স্বর্গধাম?

—ভাবার্থ : কাজী নজরুল ইসলাম

খৈয়াম নাস্তিক বা কাফির কিনা এই ফতোয়া দেওয়ার অধিকার কোন মোল্লা-পুরুতকে দেওয়া হয়নি। কেননা তারা অন্তর্যামী নয়। তাঁর অন্তরের খবর একমাত্র খোদাই জানেন।

বিশ্বনবী (সা.) মানবজাতিকে শুধু আনুষ্ঠানিকতা শিক্ষা দিতে আসেননি, তিনি এসেছেন মানুষকে তার আপন পরিচয়ে পরিচিত করতে, সচেতন করতে আল্লাহ ও মানবতার প্রতি তার দায়িত্ববোধকে সজাগ ও জাগ্রত করতে। তাই পবিত্র ইসলাম হচ্ছে—দুটি দায়িত্বের সমন্বয়। একটি হচ্ছে হক্কুল্লাহ অর্থাৎ বান্দা হিসেবে আল্লাহর প্রতি বান্দার কর্তব্য, অপরটি হচ্ছে হক্কুলএবাদ অর্থাৎ আল্লাহর খলিফা হিসেবে সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব। এ দুইটি দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করার মধ্যে একজন মানব সন্তানের একজন খাঁটি মুমিন বান্দা তথা 'খলিফাতুল্লাহ' হবার যোগ্যতা নিহিত। কিন্তু প্রচলিত ধর্মীয় ব্যবস্থায় হক্কুল এবাদ বা মানবতার প্রতি কর্তব্য আমাদের সমাজের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। প্রিয়নবী (সা.) যেখানে তাঁর জীবদ্দশায় কাফের ও মুশরিকদের অধিকার পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছেন, সেখানে আমরা মুসলমান হয়ে মুসলমানকে হত্যা করছি,

www.pathagar.com

কাফের, মুরতাদ, বলে ফতোয়া দিচ্ছি। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, মহামারি ও দুর্ভিক্ষে যখন লক্ষ লক্ষ আদম সন্তান মারা যায়, গৃহহীন সহায় সম্বলহীন অবস্থায় এক ফোঁটা পানি ও এক মুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করে তখন মানবতার নবী (সা.)-এর 'ওয়ারিশ' বলে দাবিদার তথাকথিত নায়েবে রাসুলদের সেখানে দেখা যায় না, উল্টো যারা মানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন তাদের সমালোচনা করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে আন্দোলন করে। তারা কি জানে না ইসলাম ধর্মের প্রাণ হচ্ছে মানবতার সেবা? তারা মহানবী (সা.)-এর এ মহান আদর্শের অনুসরণ বা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা তো করেই না বরং জব্বা জোব্বা পড়ে ইসলামের নামে মানুষ হত্যা করছে। ফতোয়াবাজীর মাধ্যমে উম্মতকে শতধাবিভক্ত করে আত্মকলহে লেলিয়ে দিয়েছে। ধর্মের নামে সম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়াচ্ছে, সভ্যতা ও মানবতাকে করছে কলুষিত। তাই ফতোয়াবাজী সম্পর্কে প্রতিটি মুসলমানকে সতর্কে করতে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়ের স্বার্থকতায় বুখারীর নিম্নোক্ত হাদিসটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—হযরত আবুজর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

> *কোন ব্যক্তি যদি, অপর ব্যক্তিকে ফাসেক অথবা কাফের বলে দোষারোপ করে, অথচ উক্ত ব্যক্তিটি যদি ওই দোষে দোষী না হয়ে থাকে তাহলে ওই উক্তি দোষারোপকারী ব্যক্তির ওপর ফিরে এসে অর্পিত হবে। অর্থাৎ দোষারোপকারী নিজেই ফাসেক এবং কাফের হয়ে যাবে।*

ওমর খৈয়ামের উপরোক্ত রুবাইয়ে যদিও কাজী নজরুল ইসলাম ভাবানুবাদ করেছেন, তবুও তিনি অনুবাদকালে যথার্থভাবেই মূল ফার্সির সঠিক চরিত্র প্রকাশ করেছেন। তবে তা ভদ্রতাসুলভ শব্দের সুবিন্যস্ত ছন্দের মূর্চ্ছনায় কিন্তু যদি আরও গভীরে যাই, প্রকাশ করতে চাই, এই রুবাইয়ের আসল চরিত্র। ওমর খৈয়াম ঠিক সাধারণ কথায় যেভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন—
'তোমাদের অভিযোগ মেনে নিলাম, আমি তো বেদীন আছি কিংবা শরাবসেবী বটে, কিন্তু তোমরা যে হাজারটা কুকর্ম কর যা কোনও কুকুরেও করে না।'
খৈয়ামের সাক্ষাৎ ধারণা, গোঁড়া ধার্মিক যারা আসলে তারা সকলেই কঠোর মৌলবাদী, ভণ্ড ও কঠিন হৃদয় তাদের। যখন তারা গরিবের হক হরণ করে মিনার গড়ে তখন তাদের চিত্তে কী ধর্ম বসবাস করে? সেটা ধর্ম নয় ভণ্ডামি।
পবিত্র কুরআনের সুরা মাউনে বর্ণিত 'ফাওয়াই লুল্লিল মুসল্লিন' নামের ঐসকল ভণ্ডদের আসল চরিত্র খৈয়াম আরও কতগুলো রুবাইতে প্রকাশ করেছেন—

আন কওম কি সাজ্জাদাহই পরহেযতান্দ খারন্দ
খীরা কি বাখীর বার সালুশ ফারান্দ

www.pathagar.com

ব'ইন আয হাজা তর যাহ্ তুরা কি দার দিদার যে হুদ
এসলাম ফরুসান্দ ওয়ায ব' কাফের বাতারান্দ ॥

অর্থাৎ

ভণ্ড যত ভড়ং করে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামায
চায় না তারা খোদায়—লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ;
দিব্যি আছে মুখোশ পরে সাধু ফকির ধার্মিকের
ভিতরে সব কাফির ওরা, বাইরে মুসলমানের সাজ ॥

—ভাবার্থ : কাজী নজরুল ইসলাম

খৈয়াম অবশ্য তাদের কাফির বলেননি, বলেছেন কাফিরের নিকট মুসলমানিত্ব বিক্রয় করে। এসব ভণ্ডদের চরিত্র উদঘাটন করা অবশ্যই দুঃসাহসিক কর্ম। সে যুগে খৈয়াম যে স্বাভাবিক চিত্র স্পষ্ট করে গেছেন, বর্তমান যুগেও তার হেরফের দেখি না। গোড়া ধার্মিক ও ধর্মান্ধরা নবীর আদর্শ ও কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে অন্ধ। তারা শাস্ত্র পাঠ করে জ্ঞানান্ধই থেকে যায়, আলোর পথে যেতে পারে না। কারণ তাদের মস্তিষ্ক অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ। অধর্ম ও অন্ধত্বকেই তারা ধার্মিক হবার উপায় মনে করে, তাই তারা পাষণ্ড-বর্বর প্রকৃতির হতে পারে, কারণ সে জ্ঞানপাপী। যে পড়াশুনার দরুণ বিবেক প্রাপ্তি ও বুদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে সে দরওয়াজা বন্ধ করে তারা জ্ঞান চর্চা করে, তখন সঠিক জ্ঞানপ্রাপ্তি তাদের ভাগ্যে জুটে না। কিন্তু এমন কলাকৌশল তাদের আয়ত্বে আসে যাতে ভণ্ডামি দিয়ে অন্যদের সহজে ভোলাতে পারে। তখন নিজের জন্য ধর্মের খোলসটা রাখে, অন্যকে কেবল বিশ্বাসের মাল গছাতে থাকে। আর নিরক্ষর ও স্বল্পবুদ্ধির মানুষ সহজে প্রতারণার শিকার হয়ে বিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে তাদের বিশ্বাস ও মানসিক সোবলে ধর্মপ্রাণ হয়ে যায়। ধর্মকেই তখন জীবনের একমাত্র হিত এবং জীবনের পরে মৃত্যুতেও ধর্মের পরম শান্তির আশ্রয় বিবেচনা করে নিশ্চিন্তে মরে যায়। অথচ এটাই নবীর প্রচারিত ধর্মের সঠিক চিত্র নয়। তাদের এ ধর্মজীবন অতিবাহিত করার দরুণ জগতের কোনও উপকার হয় না। বরং এ শিক্ষা সমাজকে একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখে।

মৌলবাদ কোনও নতুন উদ্ভাবন সমর্থন করে না, অথচ জীবন জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়ে, প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটিয়ে পৃথিবীকে প্রগতির হাওয়ায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে তাদের অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি হল উটের মতো, ঝড়ের সময় বালিতে মুখ গুঁজিয়ে থাকা। শরীরের ওপর দিয়ে যা কিছু করে যাক দৃষ্টিতে যেন তা সহিষ্ণু না থাকে। অথচ মৌলবাদের নষ্টামি হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রগতিকে তারা বেদাত বলে নাকচ করছে অথচ বিজ্ঞান

www.pathagar.com

প্রযুক্তির সুফলগুলো ভোগ করতে পরান্মুখ তারাই। যানবাহনের জন্য উটের সাহায্য নিচ্ছে না মটরগাড়ি কিংবা বিমান ব্যবহার করছে, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে তারাই ব্যবহার করছে, ওয়াজ নসিয়তের জন্য মাইক ব্যবহার করছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমাজ মঙ্গল এবং জীবনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। মারণাস্ত্র সংগ্রহ করে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। খৈয়াম সে যুগেও মৌলবাদের এ সমস্যার নিষ্পত্তি খুঁজে পাননি কেবল রুবাইতে তাদের জন্য আক্ষেপ করে রেখে গেছেন :

বা মরদুম পাক ব' আহল ব' আকেল আযীম
ব'য না আহলান হেযার ফরসঙ্গ গরীয

অর্থাৎ

এই মূঢ়দল–স্থূল তাহাদের অজ্ঞানতার ঘোর মায়ায়
ভাবে মানব জাতির নেতা তারাই জ্ঞান ও গরিমায় ॥

কিন্তু জ্ঞান ও গরিমায় তারা কোথায় পড়ে আছে সেটা তো জানে না; তাদের কখন বলা হয়েছিল ধার্মিক, সে গরিমায় এখন বালির ভেতর মুখ গুঁজে জগতের ঘূর্ণিঝড়কে পার করে দিতে চায়। তাদের এ দৃশ্য দেখে কাজী নজরুল ইসলাম বলেন—

দেখে দেখে ভণ্ডামি সব হৃদয় বড় ক্লান্ত, ভাই
দুরন্ত, শরাব আনো, ভণ্ডের মুখ ভুলতে চাই ॥

—কাজী নজরুল ইসলাম।

কেন এ সব ভণ্ড বা পাষণ্ড স্বঘোষিত ধার্মিকদের মুখ খৈয়াম দেখতে চান না? এরা যে কেবল গোঁড়া অসহিষ্ণু বলে নয়, তারা আন্তরিকভাবে নবীর আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষাকেও গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বুকে ধারণ করেছে ইয়াজেদি আক্বিদার রাজতন্ত্রবাদী আগ্রাসী চরিত্র। ক্ষমতাধর ও সম্পদশালী হওয়ার নেশায় ধর্মকে যারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। সঠিক পথের দিশারীরা আজ নানাভাবে আক্রান্ত।

ওমর খৈয়াম শুধু দার্শনিক কিংবা কবি নন তিনি একজন প্রেমিক। তাই তার বহু রুবাইতে কাব্যের ঔজ্জ্বল্যের চাইতে প্রেমের প্রকাশ জীবন্তরূপে ফুটে উঠেছে। কেবল সুখান্বেষী চিন্তা এখানে ভিড় করেনি। জীবনের শ্রেয় ও প্রিয় জিনিসটি কী, সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি কী, এ তত্ত্বের গ্রন্থির উন্মোচন ঘটেছে। সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি কী কেউ হয়তো সঠিক বলতে পারে না, 'যেখানে

www.pathagar.com

যেমন তেমন' ধারণা মতে কেউ বলবে অর্থবিত্ত, কেউ মান মর্যাদা, কেউ বলবে ধর্ম সুকৃতি, কম বয়সি মা বুকে সন্তান চেপে বলবে, এটি। প্রেমিক-প্রেমিকা বলবে প্রেম হল সেরা আকাঙ্ক্ষার ধন, রাজার কাছে রাজত্ব, কারও দাসত্ব দুঃখ থেকে মুক্তি। কিন্তু এসব কোনও কিছু সঠিক উত্তর নয়, কারণ এসব হল জীবনের জন্য। তাহলে জীবনই হল সবচেয়ে মূল্যবান, অন্য কিছু হারিয়ে গেলে ফিরে পাবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু জীবনের জন্য সে কথা খাটে না। ওমর খৈয়াম জীবনের মূল্য বার বার উচ্চারণ করেছেন, জীবনকে সার্থক করতে শরাব খাও। কিন্তু সে কবিতায় তিনি জীবনের আনন্দকে লক্ষ্যার্থক করেছেন। ইমানুয়েল কান্ট জীবনের সারবস্তু উদ্‌ঘাটন করেছেন অন্যরকম। তাঁর আদর্শে নৈতিক মূল্যবান হচ্ছে একটাই প্রার্থিত অর্থ স্বাস্থ্য, যশ এসব কোনটার সত্যিকারে কোনও মূল্য নেই, সম্পদের মূল্য তখনই স্বীকৃত হয় যখন তাদের শুভ উদ্দেশ্যে শুভ কাজে নিয়োজিত করা হয়। তাই তিনি আরও বলেন :

There is nothing in the world even out of it that cannot be called good without qualification, expect a good will. It shines like a gem in its own light. E. Kant : Critique of Practical Reason. P-56.

ওমর খৈয়াম এখানে প্রিয়াকে সাথে নিয়ে নির্জনে বসে শরাব, রুটি আর কবিতার ভেতর জীবনের শ্রেয় অনুভূতি খুঁজে পেয়েছেন। যা সারাজীবন মানুষ মরুভূমিতে দগ্ধ হয়ে তালাস করে। জীবনের সত্য প্রিয় অনুভূতি আর জীবনের মূল্যবান কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই অল্প কথায় এভাবে প্রকাশিত আর কোনও দর্শনে পাওয়া যায়নি।

জীবনের জন্য এসব সত্য হলেও ধর্মের নীতির ওপর প্রবল আঘাত রয়েছে। এমনকি শুচিতাবাদী ও কৃচ্ছ্রতাবাদী ইউরোপের এ নতুন সত্য মতবাদ অনুভব করে চমকে উঠে গির্জার ওপর বোমা পড়ল, উচ্চারিত হতে লাগল, কী আছে জীবনে কী আছে দুনিয়াতে?

পাওয়ার কথা সবই তো বাকি সবই তো ফাঁকি।
যা চাই, তা এখনই লুফে নাও।

এতদিনের জীবনাদর্শ, সংবর্ধনা সব ভেঙেচুরে নতুন করে রচিত হতে লাগল। কেউ কেউ খৈয়ামের এসব মতবাদকে প্রাচীন গ্রিক দর্শনের ইপিকুরীয় মতবাদের শিকলে বাঁধতে গেল, কেউ বললেন, লুক্রিটিয়াসের মতবাদ সম্পৃক্ত। কেউ হেডেনেষ্টিক, কিন্তু সব আভাস মাত্র, কারণ ওমর খৈয়াম তাদের সাক্ষাৎ পাননি, তাঁর দর্শনকে তাঁদের দর্শনের সমগোত্রীয় করা কষ্টকল্পনা মাত্র।

www.pathagar.com

এমনকি ভারতীয় চার্বাক লোকায়ত্ত দর্শন কিংবা চীনের লাও-ৎস, এসব ভোগ দর্শন প্রকৃতি দর্শন যার যার নক্ষত্রের আলো যেখানে।

সেখানে প্রাচীন গ্রিক সুকৃতি মুসলিম ফালসোফদের ঔজ্জীবিত করেছিল। খৈয়াম সে সূত্রে ইপিকুরাসের ভোগ নীতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকতে পারেন। প্রত্যেক খৈয়াম বিশেষজ্ঞ এ মত পোষণ করেন। তবে ইপিকুরাসের নীতির সঙ্গে খৈয়ামের বক্তব্যের যে পার্থক্য তা হল, জীবন উপভোগের সঙ্গে জীবনের সাফল্য বা আমলের সার্থকতা থাকা চাই। জীবনের আমল বা কর্মফলই কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট থাকে, মৃত্যুর পরও তা হারিয়ে যায় না, সে চলতে থাকে রেখে যাওয়া আমলের সঙ্গে। শরীর তুচ্ছ মৃত্যুর পর তা ধুলো হয়ে যায় এবং তার অবস্থিতি আর কিছু থাকে না, কিন্তু সাফল্য আমল থাকে চির অম্লান। খৈয়ামের এ সকল সুফি রহস্য হয়তো ইউরোপ ধরতে পারেননি। তারা কাব্যিক অর্থ করে তাকে দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষে ধারণ করেছে কিন্তু তার সুফি কাব্যের রূপক ভঙ্গিকে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়নি।

ওমর খৈয়ামকে যখন তখনকার গোড়াপন্থীরা কাফির উপাধীতে ভূষিত করল তখন তাঁর লেখাটা ছিল, গোড়া ধার্মিকদের লক্ষ্য করে, যারা বেহেশতের লোভে আল্লাহর ইবাদত করে থাকে। তিনি বললেন, যারা বেহেশতের লোভে দুনিয়ার প্রেমের আস্বাদন থেকে বিরত থেকে খৈয়ামকে নারীর সঙ্গ ও প্রেমেমত্ত দেখে দোযখের ইন্ধন বলে ঘোষণা দেয়। হাশরের ময়দানে তাদের অবস্থার কথা ভেবে ওমর খৈয়ামের দুঃখ হয়। খৈয়াম এখানে হাশরের দিনও বোগলে নারী আর শরাব নিয়ে খোদার সম্মুখে হাজির হতে চেয়েছেন তাঁর রচিত একটি রুবাইয়ে—

গোয়েন্দ্ কসানীকে যে মেই পরহীযান্দ
যে ইনসান কে বীরন্দ্ চুনান বরখীযান্দ্
মা বা মেই ব' মাশুকে আয আনীম মুকীম
বাশদ কে বাহাশর মান চুনান আন গীযান্দ্ ॥

অর্থাৎ যাঁদের মদ ও প্রেমে প্রবল অনীহা এবং খুব পরহেজগার তাঁরা হাশরের দিন এইসব সুকৃতি আমল নিয়ে তো জিন্দা হবেন, আমি তো সুরা ও রমণী সঙ্গ ভোগে মত্ত আছি, ভাগ্য বলে আমার সেদিন একই দশা যদি হয়! তবে এখানে সুরা বলতে প্রেম এবং রমণী বলতে খৈয়াম অন্যত্র খোদার অবয়বকে রূপকভাবে প্রকাশ করেছেন। যদিও শাব্দিক অর্থে মদ ও রমণীকে বুঝানো হয়ে থাকে। বাহ্যিক অর্থে যদি তাও ধরে নিই, তবুও তো এহেন ব্যক্তি কেমন করে বিয়েশাদি না করে সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন? তাঁর নিন্দুকেরা যাই বলুন,

www.pathagar.com

তাঁর পরম ভক্তরাও স্বীকার করেন যে, খাজা ওমর নারীসঙ্গ খুব পেয়ার করতেন আর তিনি তো ছিলেন চুম্বক কাঠি সদৃশ, যেখানেই যেতেন রমণীবৃন্দ বোরখা ছেনে দৃষ্টি ফেলতেন তাঁর ওপর, পরে মৌকা মত তাঁকে পেয়ে তাঁদের শুভ্র নাজুক হাত পেতে দিতেন তাঁর সামনে, কেউ দোয়া, কেউ বা তাঁর মুখের একটু ফুঁ চাইতেন। খাজাও কোমল হাত তাঁর এক হাতে নিয়ে তাতে রুবাই লিখে দিতেন চার লাইনের, আর সেসব রুবাইর ভেতর যদি এমনটি থাকে :

খৈয়াম আগর যে বাদে মাস্তী খোশবাশ
বা মা হরখী আগর নিস্‌তী খোশবাশ্‌
চুন আকাবাত কারে জাহান নাস্তী আস্ত্‌
এনগার কে নীস্তী চু-হাস্তি খোশবাশ ॥

অর্থাৎ খৈয়াম যদি তুমি মদ্যপান করে আনন্দ পাও তবে তাই কর, যদি গোলাপতুল্য রমণী বুকে রেখে উপভোগ পাও তবে তাই কর, জানি তো জগতের ব্যবসা হচ্ছে আখেরে ফের মারা, তুমি কেন নারী বিহনে জীবন শূন্য করে রাখবে?
খৈয়াম পরক্ষণে একটা সমাধান এমনভাবে ফেলে রাখেন যে, সে ক্ষোভ চেপে রাখা ছাড়া উপায় নেই, যেমন—

মুসলমানের তরে হারাম শরাব নাকি, সবাই কয়
বলতে পারে তাদের কেহ্ আছে কি আর মুসলমান?
—কাজী নজরুল ইসলাম

সে ওমরকে যারা ভোগবাদী, খোদাদ্রোহী কিংবা সমাজধ্বংসী দৈত্য বলে নিন্দা করে তারা যদি এ রকম ধারণার প্রান্ত সীমায় উপনীত হয়ে উদ্যত সাপের ফণা চুপসে নেয় কিংবা নিজের আমলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবে কিছুটা সমাধান পেতে পারে। কেউ কেউ তাকে সুফি কবি বলে মত দিয়েছেন, এ দলে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও রয়েছেন। খৈয়াম সুফির সুরে সুর মিলিয়ে যে রুবাইটি উদ্ধৃত করেছেন তা হল :

দার মসজিদ আগর নিয়াম আমাদে আম
হক্কা কী না আয বহর নামায আমাদে আম
রোয়ী ইনজা সাজ্জাদাহ-ই দাম দীহুন
আন কুননাহ্ শুদে দোবারে কায আমাদে আম ॥

www.pathagar.com

ওমর খৈয়ামের এ কাব্যে সুফিতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়—কেননা সুফিরা লোক-দেখানো নামাজের পক্ষপাতি নন— তারা নির্জনে ইবাদত করতে পছন্দ করেন। তবে আলোচ্য রুবাইয়ে ওমর খৈয়াম নিজেকে রূপকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে ফাওয়াইলুল্লিল মুসল্লিন নামক নামাজীদের ইঙ্গিত ব্যক্ত করেছেন। যারা লোকের ভালো কথা শোনার জন্যে কিংবা ধার্মিকের তকমা গায়ে লাগানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় তারা যেন প্রতিবারই একটা জায়নামাজ চুরির জন্য মসজিদে যায়- ইবাদতের জন্য নয়। একথাটি তিনি কসম দিয়ে স্বয়ং নিজের উপরেই খেদ প্রকাশ করেছেন। রুবাইটির ব্যাখ্যা হতে পারে এভাবে—

অর্থাৎ মসজিদে নামাজ পড়তে যাই, কিন্তু সত্যি করে সেটা নামাজ নয় খোদার কসম বলছি সেটা একটা ভাণমাত্র, আসলে মসজিদ থেকে একটি জায়নামাজ চুরি করতে যাই। যখন সেটা জীর্ণ হয়ে যায়, ফের একটা চুরি করতে যাই।

এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হল, অনেকে স্বেচ্ছায় কিংবা আল্লার দিদার লাভের জন্য মসজিদে যায় না, যায় জোরজবরদস্তির কারণে অথবা অনেকটা লোক দেখানো অভ্যাসের বশে। মোল্লার ভয়ে তারা আল্লাহর জন্য একটা বাধ্যবাধকতায় ভোগে। নামাজ প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ফরজ, সে কারণে এই এবাদত চুরিতে প্রকৃত নামাজের তাৎপর্য বহন করে না।

প্রেম এবং বিয়ে নিয়ে ওমর খৈয়ামের জীবনে ঘটে যাওয়া মজার ঘটনা রয়েছে। নিঃসন্দেহে ওমর খৈয়াম ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ প্রেমিক, দার্শনিক ও মরমী তত্ত্বের মহান আদর্শ পুরুষ। তবে এটা অবিসংবাদিত সত্য যে ওমর খৈয়াম জীবনে বিয়ে করেছিলেন কিংবা অবিবাহিত ছিলেন এমন তথ্য পাওয়া যায়নি, ফেরদৌসী, সাদি ও হাফিজের স্ত্রীপুত্র কন্যাদের কথা রয়েছে পুস্তকে কিন্তু ওমর খৈয়ামের তা নেই। তিনি হয়তো বিজ্ঞান সাধনায় এমন মগ্ন-মশগুল ছিলেন যে, বিয়েশাদি করার কোনও সুযোগ ও সময় করে উঠতে পারেননি। তাঁর পিতা ইব্রাহিম খৈয়ামের হয়তো বা এমন সংগতি ছিল না যে, বিয়ের বয়সে তাঁর জন্য যৌতুকসিদ্ধ একটা বউ এনে দিতে পারেন পছন্দ মত। কিন্তু এ সব হল ধারণামাত্র। আমরা জানি তৎকালীন সময় স্রোতে ওমর খৈয়াম পারস্যের গৌরব মণিমালার মূল্যবান মণি ছিলেন। খ্যাতি যশ এমনকি অর্থের অপ্রতুলতার কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাহলে কেনই বা খৈয়াম বরবেশে ঘোড়ায় চেপে শ্বশুরালয়ে যাননি? নাকি কোনও নারীকে তৃপ্তি প্রদান করার মত কোনও পৌরুষদীপ্ত জৌলুস তাঁর ছিল না? সে কথা অবশ্য ঠিক নয়। তাহলে তিনি এমন একটি কবিতা রচনা করতে পারতেন না—

www.pathagar.com

বা ইয়ার চু আরমীদে বাশী হামে উমর
লজ্জতে জাহান চেশীদে বাশী হামে উমর
হাম আখেরকার রেহলাতত খাহেদ বুদ
খোয়াবী বাশদকে দীদা বাশী হামে উমর ॥

অর্থাৎ ওহে ওমর! সত্যিকার ভালবাসার একটি প্রেমিকা যদি জোটে তবে মনে করবে জীবনে সবচেয়ে অমৃত জিনিসটি আস্বাদন করতে পেলে, সে হবে তোমার সারা জীবনের আস্বাদনের ধন, মৃত্যু এলেও স্বপ্নের রঙ বেহেশতের গালিচা বিছানো পথে তার হাত ধরে থেকো। ওহে ওমর! এটা তোমার জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ভেবে নিও।

যে কারণেই হোক, আমাদের হৃদয়ে ওমর খৈয়ামের বাণী ও কবিতা খুব জীবন্ত, মূল রুবাইয়াতের কাব্যমূল্য যাই থাক, কিন্তু দর্শন সূত্রের ধারা দুনিয়া ছড়িয়েছে, সে রহস্য উন্মোচন, সত্যকে জানার আগ্রহ দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাঁর কবিতার বিস্তর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায় ও এ যাবৎ প্রায় ১০২ জন খৈয়াম প্রেমী এ কাজ করেছেন দেড়শত বছর ধরে। কিন্তু বাংলায় খৈয়াম দর্শনের গ্রন্থি উন্মোচন ঘটেনি। কাজী নজরুল ইসলামের সুবাদে আমরা হয়তো ওমর খৈয়ামের তত্ত্ব দর্শনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে জানতে পেরেছি কিন্তু সেটা আমাদেরকে এই বিশ্বখ্যাত মরমী কবির জীবন ও দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার ক্ষুধাকে বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপি খৈয়ামের কাব্য অনুবাদ ছাড়াও হ্যারেল্ড ল্যাম্ব ওমর খৈয়াম নামে উপন্যাস লিখেছেন; ওমর জীবনী নিয়ে হলিউড থেকে কমপক্ষে তিনটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। 'দি পারসিয়ান গার্ডেন' নামে ওমর খৈয়াম দর্শন ঘরনার সুরও সৃষ্টি হয়েছে— শতাধিক চিত্রকরের আঁকা খৈয়াম চিত্র রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে, এমনকি 'ফ্রান্স ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি'তেও অনেকগুলো চিত্র স্থান পেয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত কবিদের মতো বাংলায় রবীন্দ্রনাথ নজরুল প্রমুখ ওমর খৈয়াম কাব্য বৈশিষ্ট্য অনুরূপ কবিতা রচনা করেছেন। বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির মৃত্যুকালীন স্তোত্র ছিল ওমর খৈয়াম রুবাইয়াত :

Oh, thou, who men of baser Earth did'st make
And who with Eden derise the snake...

বিশ্বের এই বিশাল সৃষ্টিতে আমি এক ক্ষুদ্র মানব
তোমার নিজের বুদ্ধি কি অবুদ্ধির ক্ষমতা থেকে আমাকে সৃষ্টি করে
সকল কাজে নিয়োজিত করেছ...

www.pathagar.com

খৈয়ামের দর্শন শুধু জীবনে নয়, মৃত্যুকে ছুঁয়ে দিয়েছে এমনি করে। ওমর খৈয়ামের পুরোনাম গিয়াসুদ্দিন আবুল ফতেহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল খৈয়াম। এতে তাঁর পিতার নাম যে ইব্রাহিম তার উল্লেখ রয়েছে। মাতার নাম আরজুমন্দ। তাঁর বাবা ভাগ্যান্বেষণে তুর্কিমেনিস্তান (বদখসান) থেকে খোরাসানে আসেন, জাতে তাঁরা তুর্কি খানদান। খৈয়াম তুর্কি শব্দ। সেনাবাহিনীর কোন্ পদে ছিলেন তা জানা না গেলেও ধারণা করা যায় তাঁর পিতা সেনা আধিকারিকদের তাঁবু নির্মাণ করতেন। বদরে জাজরোমির 'মোয়ান্নেসুল আহরার', ৭৪১ হিজরিতে রচিত গ্রন্থে তীব্র গালাগাল ও কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, 'বেটা তাঁবু দরজির পো' তাতে যে তাঁর পিতা সেনাবাহিনীর কেবল তাঁবু তৈরি করতেন এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আসলে ধর্মান্ধরা না বুঝে এমন গালবাজ করতেন। গোড়াপন্থীরা বলতেন যার বন্দেগী নেই তার দিনদুনিয়া কী? কোথাও তাঁর ঠাঁই নেই। আজ এখানে তাঁবু ফেলে, কাল তাড়িয়ে দিলে অন্যত্র ছোটে। এরা যাযাবর হীন জাতের ন্যায়, নিষ্ঠার প্রতি তাদের কোনও অঙ্গীকার নেই।'

সে যাই হোক, পিতা তাঁবু তৈরি করলেও খৈয়ামের কোনও দিন তা করার ফুসরৎ ছিল না। তবে তাঁবু তৈরির স্মৃতি তাঁর মনে জাগরুক ছিল, এ সম্বন্ধে মধুর একটি রুবাই তাঁর আছে :

খৈয়াম কে খামীহ হায়ী হুকুমতে মী দুখত
দার করাহ গাম ফাতাদ ব' নিগাহ বিসুখত্
মফরাজে আযল তনাবে উমরুশ চু বরীদ
ফররাশ কজা বরা য়্যাগনিশ বাফরুখত্ ॥

অর্থাৎ দর্শনের তাঁবু সেলাই করে খৈয়াম শেষকালে দুর্ভাগ্যের অগ্নি কটাহে নিক্ষিপ্ত হল, তারপর অকস্মাৎ দগ্ধ হল; মৃত্যুক্ষণের কাঁচি তার জীবনরজ্জু কেটে দিল, দালাল অদৃষ্ট তাকে বিনামূল্যে বিক্রি করে দিল।

এ কথা থেকে মনে হয় খৈয়াম আসলে তাঁবু সেলাই বা তাঁবু নির্মাণের সঙ্গে কোনও না কোনও দিন জড়িত ছিলেন এবং তাঁর জীবন যে খুব নিশ্চিন্ত ছিল তাও নয়। রুশ পণ্ডিত অধ্যাপক শুকোভস্কি 'তারিখ-ই আলিফ' নামক গ্রন্থে খৈয়ামের তাঁবু ব্যবসা এবং তরিকায় তিনি মুতাকাল্লিম সুফি ছিলেন বলে উল্লেখ করেন। এঁরা সাধারণের বাইরে জীবন যাপন করেন, তাঁরা কারও মুখাপেক্ষী নন। কঠোর শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা এবং নিজেদের তরিকা মতে চলা এবং অন্যের ওপর নির্ভর না করা, কোনওভাবে অন্যের নিকট তা ফাঁস না করাকে খুব আমল দেন। তাঁরা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস

www.pathagar.com

করেন, দেহের বিভিন্ন অবস্থা ধারণ এবং ইচ্ছামৃত্যু দ্বারা দেহত্যাগ করতে পারেন।

ওমর খৈয়ামের অধঃস্তন বংশধর বলে দাবিদার ইরানি সুফি কবি ওমর আলি শাহ খৈয়ামের একটি দুষ্পাপ্য পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেছেন, যা নাকি তাঁদের পরিবারে 'মহৎতম আলামত'—অন্যের নিকট প্রকাশযোগ্য নয় যা অধ্যাপক রবার্ট গ্রেভসের সহযোগিতায় প্রথম বার ১৯৬৭ সালে সম্পাদন করার পর পেঙ্গুইন প্রকাশ করেছে। ওমর আলি শাহ তাঁদের খানদানের গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তরিকা ভঙ্গ করে সাধারণ্যে প্রকাশ করে তার মানে বের করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সুফিরা আল্লাহর লোক, জনতার জবানে কথা বলা তাঁদের অভ্যাস নয়। শাব্দিক অর্থে খৈয়াম শব্দ তাঁবু নির্মাণকারী হলেও সুফি অর্থে অন্য কিছু, খৈয়ামও সে কথা, খানদানে তা বরং 'শেখ'। তিনি খৈয়ামের নাম করেন শেখ গিয়াসুদ্দিন আবদুল ফতেহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম। খৈয়ামের পিতামহ তুর্কি নন, বলখের সুফি সম্প্রদায়ের লোক; তিনি শাহরাজুরি মতানুসারী কাদেরিয়া তরিকাভুক্ত।

তিনি বংশলতিকা বা কোষ্ঠী যাচাই করে খৈয়ামের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রস্তুত করেন, তাতে তিনি দাবি করেন খৈয়াম ১১৫ বছর বেঁচে ছিলেন এবং ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম, তখন গজনির সুলতান মাহমুদ বিশ্বকে আলো দিচ্ছেন, কবি ফেরদৌসিও বেঁচে। তাঁর বক্তব্য হল, ওমর খৈয়াম পারস্যের শ্রেষ্ঠ সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, বাল্যকালে তাঁর অন্য দু'সহপাঠী নিযামূল মূলক ও হাসান সাব্বাহ সহ বিখ্যাত উসতাদ ইমাম শেখ মোয়াফিককারউদ্দিনের ছাত্র ছিলেন। এই শেখ মোয়াফিক কেবল আমির-রইস সেনাপতি পুত্রদের শিক্ষা দিতেন—যারা পরবর্তীকালে দেশের কর্ণধার হতেন। ওমর খৈয়াম নিতান্ত তাঁবু নির্মাতার পুত্র বা সাধারণ পরিবারের সন্তান হলে কখনও এই বিখ্যাত উসতাদের কাছে যেতে পারতেন না। কিংবা তাঁর শিষ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ থাকত না। তিন স্কুল বন্ধুর গল্পের সঙ্গে এখানে একটু মিল পাওয়া যায়, নাকি সেটাও চাপান একটি গল্প খোদা মালুম।

খৈয়াম কথাটার অর্থ বটে তাঁবু নির্মাতা। এটা খৈয়ামের কাব্যনাম বা তখল্লুস। এই তখল্লুস থাকার পেছনে সুফি ধারণার ইঙ্গিত বহন করছে। সাংকেতিক এ নামের অর্থ যদি উদ্ধার করা হয় তবে 'আবেজাদ' পদ্ধতি অনুসারে 'আল সাকী' অর্থ হল 'জিনিসের অপচয়কারী' আর 'আল খৈয়াম' অর্থ হল 'তাঁবু নির্মাতা।'

'আবেজাদ' পদ্ধতি হচ্ছে, বর্ণমালার কোনও অক্ষর দিয়ে সংখ্যাবাচক চিহ্ন বা অর্থ প্রকাশ করার কৌশল। এটা ঠিক যে প্রাচীনকালে বর্ণমালা দিয়ে গণনার নিয়ম ছিল। সংখ্যাবাচক অক্ষর বা ডিজিটে সংখ্যা ছিল না। গণনা পদ্ধতিতে আরবি ও গ্রিক বর্ণমালা এখনও প্রাচীন হিসেবে পদ্ধতির স্মারক হিসেবে

www.pathagar.com

ব্যবহার হচ্ছে। আধ্যাত্মিক মূল্যমানেও এক একটি সংখ্যা এক একটি গূঢ় শব্দে প্রকাশ করার কৌশল তৎকালে ছিল যা কোনওক্রমে সাধারণের জানার ব্যাপার ছিল না। 'জিনিসের অপচয়কারী' এ কথাটার সুফি ব্যঞ্জনা হচ্ছে এই, 'যে ব্যক্তি পার্থিব অর্থ সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করেছে। যার ফলে সুফি তরিকা রাহে এসব পার্থিব সম্পত্তি তাঁর বোঝা হয়ে থাকেনি।' সুফি শেখ বা উসতাদরা ঠিক একইভাবে কাব্যনাম বা তখল্লুস গ্রহণ করতেন, অন্যদের সে সুযোগ ছিল না। তা থেকে তাঁদের সাধনপদ্ধতির গূঢ় আভাস এ নাম থেকে পাওয়া যেত। তেমন শেখ ওমরের জন্য তখল্লুস 'খৈয়াম বা তাঁবু নির্মাতার রূপক পদ্ধতি গৃহীত ছিল। তিনি সাধারণ তাঁবু নির্মাণ করেন না, দর্শনের তাঁবু সেলাই করেন।

খৈয়াম সত্যিকারের যে তাঁবু দর্জির পুত্র ছিলেন, বাল্যকালের এ পেশা তাঁর জীবনে পরবর্তীকালে প্রভাব ফেলেছিল, সে জীবন অনুষঙ্গ আরও একটি কবিতায় এসেছে যেমন—

খৈয়াম তন্‌তে বাশীমে মী মান্দ রাস্ত
সুলতানে রূহ আস্ত ব' মনজিলশ দার ফরাস্ত
ফরাশ আজল যে বহর দীগর মনজিল
আয পাফগান্দ খীমাহ কে সুলতান বরখাস্ত ॥

অর্থাৎ, খৈয়াম তোমার শরীর ঠিক তাঁবুর মতো, আত্মা হচ্ছে সুলতান। তার বিশ্রামস্থল হচ্ছে এ নশ্বর দেহ, মরণরূপ ভৃত্য তোমাকে অন্য বিশ্রামাগারে নিয়ে যাবার জন্য যে তাঁবু উপড়ে ফেলেছে, দেখছ না সুলতান কখন চলে গেছেন। একজন তাঁবু নির্মাতার পুত্র এমন দর্শনের তাঁবু দুনিয়াতে নির্মাণ করে গেছেন যাতে প্রবেশ করা মাত্র নর্তকীর নৃত্য কবির কণ্ঠ আর দর্শনের সূক্ষ্মদান যে কোনও মনের জন্য স্নিগ্ধ শান্তি ও মুক্ত চিন্তার যথার্থ আশ্রয়স্থল করেছে।

ইংরেজ কবি-অনুবাদক এডওয়ার্ড ফিটসজেরাল্ড এর ইংরেজি থেকে :

১. *And Devid's Lips are lockd, but in Divine*
High piping Pehlevi, with Wine! Wine! Wine!
Red Wine!--the nightingale cnis to the Rose
That yellow cheak of hers to in carnanine.--Fitz

লাউনে দাউদ কণ্ঠ ছিড়ে তবু আকাশে বাজে সুর
সলোমন গান তম্বুরায় রোষে প্রেম মধু প্রেম মধুর;

www.pathagar.com

এসো দেব প্রেম বুলবুল যাচে গোলাপ পানে
হলদে তার লালচে গলায় পশে বেবিলন নিশাপুর।

শব্দ টীকা

লাউনে দাউদ:

দাউদের গানের সুর; হযরত দাউদ (আ.)-এর কণ্ঠস্বর এতই সুমধুর ছিল যে, শুধু মানুষ কেন, বরং পশু-পাখিরাও তা শোনার জন্য ব্যস্ত থাকত, বিশেষ করে তাঁর কণ্ঠনিসৃত খোদার মধুর গীত শোনার জন্য সৃষ্টিজগত মাতোয়ারা থাকত। এই সুর ছিল বেহেশতে, 'কুরআনীয় ভাষায়, আমরা দাউদকে ফজল দিয়েছিলাম', তাই দাউদ তাঁর তম্বুরার তারের ঝঙ্কার দিয়ে বেহেশত থেকে সুরকে মর্ত্যে নামিয়ে আনলেন। দুই তারের প্যাঁচ দিয়ে বেঁধে ফেললেন, সুর আর বেহেশতে ফিরে যেতে পারল না। মিশরীয় রানি ক্লিওপেট্রা সে সুর দিয়ে প্রেমিক চিত্ত বাঁধতে পারলেন, পরে এ তম্বুরাকে ইরাকি বীণা বলা হয়। পরবর্তীকালে আমির খসরু হিন্দুস্থানে এনে তাকে অন্য একটি তার জুড়ে 'সেতার' নাম রাখেন এবং সঙ্গত করার জন্য এস্রাজ আবিষ্কার করেন।

সলোমন গান:

বাইবেলের সংগ অব সংগস

Let him kiss me with the kisses of his mouth;
For thy love is better than wine...

Roosist Khush wa hawa na goram wa na sard

২. *Saki, if an idol with ruby lips were in my arms;*
And if instead of juice of grape I had Khizir's water of life;
If Venus was my minstrel and Isa my companion,
If my heart were not in its place, this world not mean joy to me.

-Rosen.

সাকি ! আমার ওষ্ঠে তোমার ওষ্ঠ কণ্ঠলগ্ন গুলবদনি
মদের মদির ছাড়তে পারি খিজির জীবন পানি;
ভেনাস প্রিয়া ঈশা দোস্ত হলেও আমার
চিত্তে আমার নেই তাদের ঠাঁই বিশ্বকে তাই মানি।

www.pathagar.com

শব্দ টীকা

খিজির:

হযরত খাজা খিজির (আ.), তাঁকে খোঁয়াজ খিজিরও বলা হয়ে থাকে, পবিত্র কোরআনের সুরা কাহাফে তার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সেখানে তাঁর পরিচয় রহস্যাবৃত। মুসা নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইলমে মারেফত জ্ঞান লাভের জন্য এই খাজা খিজিরের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

একজন নবীর হঠাৎ কেন ইলমে মারেফত জ্ঞানের প্রয়োজন হল, কারণ নবী তো নবুওয়াত লাভের মাধ্যমে সকল মর্যাদার শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তি, সরাসরি আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি সবসময় আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকেন। তবু কেন তাঁর এমন জ্ঞানের প্রয়োজন, যে জ্ঞান একজন সাধারণ স্তরের অলির কাছেও পাওয়া যায়? সেই নবুওয়াতের উচ্চ পদাধীকারী একজন নবীকে কেনই বা আল্লাহ্ একজন অলির মর্যাদায় অভিষিক্ত খিজিরের কাছে প্রেরণ করলেন। এটা জানার জন্য নবুওয়াতধারা ও বেলায়াতধারার গুপ্তভেদ নিয়ে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তা অধ্যয়ন করা আবশ্যক। বইটি সালমা বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের নাম, *'নবী ও অলীদের গুপ্তজ্ঞান'* এই মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করে সকল নবী ও অলীদের গুপ্তভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

খিজির তত্ত্ব:

খিজির নামক শব্দটি নানা রহস্যে রহস্যাবৃত। খিজির ব্যক্তি আবার খিজির শব্দের অর্থ চিরসবুজ, অর্থাৎ যিনি আবে হায়াত নামক ঝর্ণার পানি পানের দ্বারা চিরজীবন লাভ করেছেন এবং ফেরেস্তার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, নির্জর মরুভূমির বুকে পাথরের নিচে চিরপ্রবাহমান এক কুদরতি ঝর্ণাধারা যার নাম আবে হায়াত। আল্লাহর দেওয়া মারেফত জ্ঞানের অবিমিশ্রিত উৎসারণ সুধা, মাত্র একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই এমন আবে হায়াত প্রাপ্ত হন, যিনি খাজা খিজির নামে পৃথিবীতে নানা গল্প সাহিত্য ধর্মগ্রন্থ ও লোকের মাঝে জীবন্ত হয়ে আছেন। অন্যদিকে খিজির নদী ও সমুদ্র শাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষ, জীবন পানির উৎস রক্ষাকারী (ফেরেশতা); আবার খিজির দ্বারা খোদার ইশ্কের শরাব পানকারীকেও বুঝানো হয়েছে।

ইশার:

অমর হওয়ার জন্য তাঁর শরণাপন্ন যখন মৃত্যু আসন্ন হয়, ইশার ইলি ইলি লামা সাবাকতানি? কুরআনীয় নির্দেশ– মদ্য ও জুয়া 'এ দুই বড় গুনাহ' কিন্তু

www.pathagar.com

বেহেশতে পরম আস্বাদনীয় মদ্য। এটাকে ইশ্‌কের নিবারণ বারিও বলা হয়ে থাকে।

ভেনাস প্রিয়াঃ
রোমান বিশ্বাসে প্রেমের দেবী ভেনাস।

Saki be barm garbut yakut labast

আল্লামা ইকবাল অধ্যাপক আরনল্ড এর থেকে খৈয়ামের ইউরোপ জয় ও দর্শনের কথা জেনেছিল। ইকবাল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন ওমর খৈয়ামের সুফি রহস্য ও কাব্য দর্শনের নানা দিক।

ইকবালের অধ্যাপনা
এ বছরই তিনি লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবী বিভাগে সাময়িকভাবে প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভ করেন। মাত্র তিন বছর সেখানে অধ্যাপনা করার পর লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এর কিছুদিন পর টমাস আরনল্ড লন্ডন চলে যান। সেখানে তিনি ক্যামব্রিজ ইউনির্ভাসিটিতে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ইকবাল তাঁর বিদায় উপলক্ষে 'নালায়ে ফিরাক'-বিচ্ছেদের আর্তনাদ' কবিতাটি শ্রদ্ধাঞ্জলী হিসেবে পেশ করেন। কবিতাটি মাসিক মাখযানে প্রকাশিত হয়।
শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ইকবাল ছাত্রদেরকে যে কোন বিষয়ে অনায়াসে শিক্ষা দিতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি দর্শক শাস্ত্রে এম.এ.পাশ করার পর আরবী বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। ছাত্ররা তাঁর জ্ঞান-গর্ভ আলোচনায় পরম তৃপ্ত হতো। তাঁর প্রখর জ্ঞান ও গবেষণা যে কোন বিষয় সহজবোধ্য করে দিত। ফলে কিছুকালের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের পরম আস্থাভাজন শিক্ষক হয়ে যান।

আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভায়
ইকবাল তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'নালায়ে ইয়াতীম' অর্থাৎ 'ইয়াতীমের আর্তনাদ' কবিতাটির অঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলামের সভায় সর্বপ্রথম আবৃত্তি করেন। এ কবিতাটি শ্রোতাদের কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল। শ্রোতারা ইকবালের আবৃত্তির সাথে সাথে মুহুর্মূহু তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললো। কবিতাটির ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের অর্থানুকূল্যে দুই লক্ষ কপি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়।

www.pathagar.com

এ সময় ইকবাল মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশার বিশদ বর্ণনা দিয়ে কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা 'হিমালাহ' ও 'হিন্দুস্তা হামারা' প্রভৃতি আঞ্জুমানের সভায় আবৃত্তি হয়েছিল। সর্বসাধারণের কাছে তার এ কবিতাগুলোও বিপুল সমাদর লাভ করে। কবির হৃদয় নিংড়ানো আকুতি সবার প্রাণ স্পন্দন জাগায়।

এক সভায় আল্লামা আলতাফ হোসাইন আলী, ড. নজীর আহমদ, মীর্যা রাশেদ গারগানী, মিয়া মুহাম্মদ শফী, স্যার আবদুল কাদের, স্যার ফজলে হোসাইন, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, খাজা হাসান নিজামী প্রমুখ মনীষী উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় ইকবালের কবিতা আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে আল্লামা হালী তাঁকে দশ টাকা পুরস্কার দিলেন। তখন হাজার-হাজার লোকের মুহুর্মূহ ধ্বনিতে সভাস্থলে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল।

কিছুদিনর পরের কথা। এক সভায় আল্লামা হালীর কবিতা আবৃত্তির কথা ছিল। লাহোরের সর্বত্র প্রচারিত হলো এ খবর। খবর পেয়ে হাজার হাজার ভক্ত-অনুরক্ত ছুটে এল। বার্ধক্যের কারণে আল্লামা হালীর তখন পূর্বের সেই আবেগময়ী কণ্ঠস্বর নেই। আওয়ায এতই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল যে, পাশে বসেও তাঁর বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হতো। তবুও ভক্তদের একান্ত অনুরোধ তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে হলো। এটা যেন তাঁর অন্তিম আবৃত্তি। কিছুক্ষণ আবৃত্তি করার পর তিনি অপারগ হয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর স্যার আবদুল কাদের সাহেব মাইকে ঘোষণা করলেন–তাঁর অবশিষ্ট কবিতাটুকু তরুণ কবি ইকবাল আবৃত্তি করে শুনাবেন। তখন শ্রোতারা তাকবীর ধ্বনি দিয়ে সভাস্থলে মুখরিত করে তোলে।

এবার ইকবাল হালীর কবিতা আবৃত্তির জন্য দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চার লাইনের একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন। এটা তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল। কবিতাটির সারমর্ম ছিল এই :

'আল্লামা হালী এ যুগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁর পাত্র (কবিতা) সত্যে সমৃদ্ধ। আমি একজন কিশোর, নবীর মতো (নবীরা যেমনি আল্লাহর ওহী নিয়ে কথা বলেন তেমনি) আমার কণ্ঠ থেকে কবি হালীর কথাই বেরুচ্ছে।'

'মলফুজাতে ইকবাল' গ্রন্থে আল্লামা শেখ আবদুল কাদের লিখেছেন, 'আঞ্জুমানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে ইকবাল মর্মস্পর্শী সুরে 'শেকওয়া' পাঠ করলেন। উপস্থিত হাজার হাজার লোককে তিনি আবেগময়ী অজস্র ফুল বর্ষণ করতে লাগলো।

ইকবালের বর্ষীয়ান পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ এ কবিতানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছেলের এই কৃতিত্ব দেখে তাঁর দু'নয়নে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। খুশিতে তিনি আত্মহারা হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

বিখ্যাত হেকিম হাসান কারশী লিখেছেন : এক মজলিসের ঘটনা। ইকবাল তাঁর আবেগ জড়িত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করলেন। কবিতার নাম ছিল 'দরবারে রিসালাত মেঁ অর্থাৎ 'নবীর দরবারে আবেদন'। দেখা গেল, শ্রোতা-সাধারণ তুমুল তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলো। লাহোর শাহী জামে মসজিদের বিশাল প্রাঙ্গন জনসমুদ্রের এ ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। পরবর্তীতে লাহোরের যে কোন ইসলামী জলসায় ইকবাল ছিলেন প্রধান আকর্ষণ- মধ্যমণি। দলে দলে ভক্তরা তাঁর কবিতা শোনার জন্য ছুটে আসতেন।

www.pathagar.com

ইউরোপে ইকবালের শিক্ষা ও অধ্যাপনা জীবন

একাধারে কয়েক বছর অধ্যাপনা করার পর জ্ঞান-সাধক ইকবালের মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন– যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিতে হবে। ১৯০৫ সালে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের চাকুরী ইস্তফা দিয়ে তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে জার্মানী গেলেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রার ব্যাপারে তাঁর ভাই ইঞ্জিনিয়ার আতা মুহাম্মদ সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন। যাত্রাপথে তিনি দিল্লীর প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মাজার যিয়ারত করেন। জার্মানীতে পৌঁছে তিনি মিউনিক ইউনির্ভাসিটির অধীনে উচ্চতর দর্শন শাস্ত্রের গবেষণায় নিয়োজিত হন।

মজার ব্যাপার! দীর্ঘদিন পর পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্যার টমাস আরনল্ডের সাক্ষাৎ পেলেন। ইকবাল তাঁর পরামর্শক্রমে 'পারসিক মরমীবাদ' নামে একটি অনন্য গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা করেন। এ সময় তিনি অধ্যাপক আরনল্ডের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরামর্শে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের উচ্চতর জ্ঞান অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯০৭ সালে জার্মানীর মিউনিক ইউনির্ভাসিটি তাঁর Development of Metaphysics in persia থিসিসের জন্য P.H.D ডিগ্রী প্রদান করে। এটা তাঁর জন্য বিরাট ভাগ্য ও মুসলিম বিশ্বের জন্য গৌরবের ব্যাপার ছিল। তাঁর উক্ত থিসিসটি লন্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশনী ১৯০৮ সালে প্রকাশ করে। এছাড়াও পরবর্তীতে উক্ত থিসিসটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ভাষায়ও এটি অনূদিত হয়েছে।

আইনশাস্ত্রে ডিগ্রী

ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের পর ইকবালের মনে আরেকটি নতুন সাধ জাগলো। বলতে গেলে এটাই ছিল তাঁর অধ্যয়নের সর্বশেষ পদক্ষেপ। এবারও স্যার টমাস আরনল্ডের পরামর্শক্রমে লন্ডনের লিঙ্কনস্ ইন-এ এসে আইন শাস্ত্রের উচ্চতর অধ্যয়নের নিমিত্ত ভর্তি হলেন। দেখা গেল জীবনের সর্বশেষ

www.pathagar.com

পরীক্ষায়ও তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০৮ সালে 'বার-এট-ল' (লন্ডন) ডিগ্রী লাভ করেন।

লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা

১৯০৭ সালে আল্লামা ইকবাল পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের পর জানতে পারলেন, লন্ডন ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক, ইকবালের অন্যতম শিক্ষক স্যার টমাস আরনল্ড বিশেষ প্রয়োজনে এক বছরের ছুটিতে যাচ্ছেন। তিনি ইকবালকে তাঁর অনুপস্থিতি কালীন সময়ে তাঁর স্থলে অধ্যাপনা করার জন্য অনুরোধ জানালেন। স্যার টমাস ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে যোগ্য ছাত্র ইকবালকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন। তাঁর এ ব্যবস্থা অনুসারে ইকবাল ১৯০৭-১৯০৮ সাল পর্যন্ত এক বছরের জন্য উক্ত ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সালে বার-এট-ল ডিগ্রী লাভ করার পর ব্যরিস্টারী করার উদ্দেশ্যে তিনি স্বদেশ ফিরে আসেন। লন্ডন থেকে ফেরার পথে আলীগড়ে এসে তিনি সংস্কৃত ভাষা শেখেন।

স্বদেশ ফেরার পর তিনি আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১১ সালে লাহোর সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। তাছাড়াও লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

www.pathagar.com

জার্মানী ও লন্ডনে ইকবালের আলোকিত জীবন

উচ্চতর শিক্ষার জন্য জার্মানী ও লন্ডনে অবস্থানকালে ইকবাল সেখানকার লেখক সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবি ও গবেষক মহলে সুপরিচিতি লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সবার আপনজন হয়ে ওঠেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমায় সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সবার সাথে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ইকবালের প্রবাসী জীবন অত্যন্ত সুখেই কাটে। তাই দূর বিদেশের নিঃসঙ্গতা তাঁকে কাবু করতে পারেনি।

জার্মানী পৌঁছে ইকবাল ক্যান্টন হলে 'ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য' এবং 'বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনের সার্বজনীন শিক্ষার মাহত্ব' বিষয়ে ছয়টি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতাগুলো এতো জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বমূলক ছিল যে, শত-শত ইংরেজ বুদ্ধিজীবীর মনে তা গভীর রেখাপাত করে। তাঁর বক্তৃতায় তিনি প্রথমত ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করেন এবং ইসলাম ও বিশ্বনবী (সা.) সম্পর্কে দীর্ঘ জ্ঞানগর্ব বক্তৃতা দিতে শুরু করেন : *'আল ইসলামু দ্বীনুল ফিতরাত'* অর্থাৎ ইসলাম হচ্ছে *স্বভাবসুন্দর ও প্রকৃতিগত ধর্ম*।

ইসলাম বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতির এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শাশ্বত আদর্শের প্রতীক। মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির দিকদর্শন রূপে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মই হল ইসলাম। এ বিশ্বজনীন ধর্মের মূলমন্ত্র তাওহীদ, রিসালাত ও ইবাদাত।

সৃষ্টির আদিতেও এ ধর্ম ছিল এবং বর্তমানেও আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারণ নবী মুহাম্মদ (সা.) হলেন এ ধর্মের সর্বশেষ সংস্কারক। তাঁর পূর্বে আরও বহু সংস্কারক এ ধর্মের তাওহীদ, রেসালত ও ইবাদতের গুরুত্ব বোঝাতে দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহর দূত নবী ও রাসুল হিসেবে স্ব স্ব কিতাব কিংবা সহিফা নিয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভূত। বনি ইসরাইল গোত্রে ইহুদীদের নবী হযরত মুসা (আ.) এর উপর তাওরাত কিতাব এবং খৃস্টানদের নবী হযরত ইসা (আ.) এর উপর ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ হয়। তাঁরা উভয়েই আল্লাহর দূত হিসেবে

www.pathagar.com

তাওহীদী দ্বীনের প্রচারক ছিলেন। তাঁরা তাওহীদ, রেসালত ও ইবাদতের গুরুত্ব বর্ণনা করেছিলেন। তেমনিভাবে তাওহীদী দ্বীনের সর্বশেষ সংস্কারক ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবী ও রাসুল হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন।

আল্লামা ইকবাল এভাবে যখন ইহুদী ও খৃস্টানদের নবী ও ইসলামের বিশ্বনবী (সা.)-এর গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন তখন লন্ডন ও জার্মানী জুড়ে ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক তাঁর ভক্ত অনুরক্ত হয়ে যান। তাঁরা মনপ্রাণ ভরে ইকবালের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনতাত্ত্বিক আলোচনা শোনার জন্য ক্যান্টন হলে ও লন্ডনের অভিজাত হলগুলোতে জমায়েত হতেন। দ্বিতীয় বক্তৃতাকালে ইকবাল যখন তাওহীদী দ্বীনের প্রচারক প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)-এর গুণবৈশিষ্ট্য ও বিশ্বনবী (সা.)-এর আদর্শ ও প্রবর্তিত ইসলামের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন তখন ক্যান্টন হল আসনপূর্ণ হয়ে শত শত খৃস্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনছিলেন। ইকবাল বলছিলেন যে *ইসলাম হল পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ও সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম* কেননা সকল নবী রাসুলগণ ইসলামের তাওহীদী দ্বীনের প্রচারক ছিলেন। যেমন পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)।

আদম (আ.) এর ভাষা ছিল হিব্রু, ধর্ম ছিল তাওহীদী দ্বীন এবং জ্ঞান ছিল উৎকৃষ্ট। ফলে তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আশরাফুল মাখলুকাত। তিনি আরও ছিলেন প্রথম নবী। নবী হিসেবে প্রাপ্ত নবুয়াত তথা খিলাফত। এই খিলাফত তিনি লাভ করেন ৫০০ বছর বয়সের সময়। তাই তিনি ফিল আরদি খলিফা। তাঁর কালিমা ছিল '*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আদম সফিউল্লাহ।*'

হযরত আদম (আ.) কে আল্লাহ তিনটি মৌলিক গুণ দিয়ে পয়দা করেছেন। সুতারং একজন মানুষের তিনটি মৌলিক বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন। তাহলো অহি বা ভাষা, দ্বীন বা ধর্ম এবং জ্ঞান বা বিবেক বুদ্ধি। এ তিন দিয়েই মানুষের আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি থেকে সকল গুণের উৎপত্তি।

তিনি আল্লাহর দেওয়া আমানতের গুরুভার বহন করেন, যার খিয়ানত করলে আদম জাত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত আদম (আ.) হতে একত্ববাদের সূচনা আর আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ে এসে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমরা পাই আত্মসমর্পণ করার শক্তি, আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ আর নিয়ামত উপভোগ করার কৌশল। আমাদের নবী দোজাহান হচ্ছেন সেই উৎকৃষ্ট নিয়ামত যিনি আমানতের সংরক্ষক। ইংরেজিতে ইসলাম ৫টি অক্ষর বিশিষ্ট তথা *Islam*। *I* অর্থ আমি, *s = shall* অর্থ বে ব বা, *L = Love* অর্থ ভালবাসা, *a = all* অর্থ সমস্ত এবং *m= men* অর্থ মানব সম্প্রদায় এবং পুরো বাক্য *Islam* অর্থ শান্তি। তাহলে সার্বিক

www.pathagar.com

অর্থ দাঁড়ায় 'আমি সমস্ত মানব সম্প্রদায়কে ভালবাসা ও ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করে আল্লাহর রাহে আত্মসমর্পণ করলাম। এখন বিশ্লেষণে যা পাই তা তুলে ধরতে চাই।

আমরা মুসলমান আর আমাদের দ্বীন হলো ইসলাম। মুসলমান অর্থ আত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ *Surrender* আর ইসলাম অর্থ শান্তি অর্থাৎ *Islam is yeld*। *Islam is to be taken and Muslimship should be aquired* অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করতে হবে আর মুসলমানিত্ব অর্জন করতে হবে। মুসলমান শব্দটি হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর দেয়া নাম। তিনি মুসলমান জাতির পিতা এ কথা পবিত্র কোরান শরিফে উল্লেখ আছে। *'মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিম হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিমিন'* অর্থ হযরত ইব্রাহিম (আ.) তোমাদের জাতির পিতা এবং তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন। অনেকে বলে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর পিতা একজন মূর্তি পূজক এ কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? অনেকে বলে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর পিতার নাম আজর, এ কথা সত্য সঠিক নয়। আরবীতে আবুন অর্থ পিতা বা চাচা উভয়ই। এ বিষয়ে অনেকেই আজরকে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর পিতা বলে জানে। আসলে আজর হলো ইব্রাহিম (আ.) এর চাচার নাম। আর হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর পিতার নাম ছিল তারিক (আ.)। মুসলমান জাতির পিতার পিতা কখনও মূর্তির সেবক, ধারক এবং বাহক হতে পারে না।

হযরত আদম (আ.) এর উপর যে পুস্তিকা নাজিল হয়েছিল তার নাম ছিল সহিফা। এ সহিফাতে যে ধর্মের উল্লেখ ছিল তা ছিল 'তাওহীদী দ্বীন' বা *একত্ববাদের ধর্ম*। ইতিহাস হতে জানা যায় দুনিয়ার প্রথম ভাষা ছিল হিব্রু। এই মতে হযরত আদম (আ.) এর ভাষাও ছিল হিব্রু। ইহুদীনের নবী মুসা (আ.) এর কিতাব তাওরাতও ছিল হিব্রু ভাষায় এবং খৃস্টানদের নবী ইসা (আ.) এর গ্রন্থ ইঞ্জিলের ভাষাও ছিল হিব্রু। এই হিব্রুরাই হলো একত্ববাদের উদ্ভাবক, ধারক এবং বাহক। এভাবে হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.) এ সমস্ত আম্বিয়াগণও হিব্রু ভাষী ছিলেন। এ হতে বুঝা যায় হযরত আদম (আ.) হতে 'তাওহীদী দ্বীন' তথা 'ইসলাম' শুরু আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এসে পূর্ণতা লাভ করে। কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, *'আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'ইমাতি ওয়া রাদিতুলাকুমল ইসলামা দ্বীনাও (সুরা মায়িদা)।'*

অর্থাৎ 'অদ্যকার দিবসে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অসীম অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য আমি ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে মনোনীত করলাম।'

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআন শুধু মুসলমানদের জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এ গ্রন্থে সকল নবী রাসুলগণের কাওম, তাওহীদ ও কিতাবের বর্ণনা সন্নিবেশিত আছে। সকল কিতাবী সম্প্রদায়ের ইতিহাস এতে লিপিবদ্ধ আছে। ইহুদী নাসারা খৃস্টান এবং মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নবী রাসুলগণের ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, তাওহীদ, রেসালত ও ইবাদতের সার্বজনীন বিধান ও খোদার রহস্য জ্ঞানের ভাণ্ডার আল-কুরআন। তাই বিশ্বের সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে কুরআন থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমৃদ্ধ জাতি ও আদর্শ মানব হওয়ার জন্য আল্লাহপাকের অমোঘ নির্দেশ কুরআনেই উচ্চারিত হয়েছে :

ওয়ালাক্বাদ্ ইয়াস্সার্নাল্ কুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মুদ্দাকির।

—সুরাঃ ক্বামার : ১৭,৩২

উপদেশ গ্রহণ করার জন্য আমি কুরআন সহজ করেছি—কে আছ উপদেশ শোনার?

ওয়ালা ক্বাদ্ দ্বারাব্না- লিন্না-সি ফী হা-যাল্ কুরআ-নি মিন কুল্লি মাছালিল্ লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন।

—সুরা যুমার : ২৭

মানুষের জন্য এ কোরআনে প্রত্যেক প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি তারা উপদেশ গ্রহণ করার জন্য।'

ওয়া আ-তাইনাহুম আয়াতিনা ফাকানূ 'আন্হা মু'রিদ্বীন্।

—সুরা হিজর : ৮১

ইহা লোকের জন্য এক বার্তা, যাতে এ দ্বারা মানুষ সাবধান হতে পারে।

হাযা বাছা-ইরু লিন্নাসি ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহমাতুল লিক্বাওমিঈঁ ইউক্বিনূন।

ইহা (আল-কুরআন) মানবজাতির জন্য জ্ঞানমূলক উপদেশ, আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়ত ও রহমত।

—সুরা জাছিয়াহ : ২০

ওয়া লাক্বাদ্ ছার্রাফ্না লিন্নাসি ফী হাযাল কুরআনি মিন কুল্লি মাছালিন্, ফাআবা আকছারুন নাসি ইল্লা কুফূরা।

—সুরা বনি ইস্রাইল : ৮৯

www.pathagar.com

'আমি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি লোকদিগের জন্য সকল বিষয় (মিছলে) কিন্তু অল্প সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশ লোক তা অস্বীকার করে।'

উপরোক্ত আয়াতে কারিমা থেকে বুঝা যায় এ মহান গ্রন্থ নির্দিষ্ট কোন ধর্ম কিংবা জাতিগোষ্ঠীর জন্য অবতীর্ণ হয়নি বরং সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের দিকদর্শন রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। এই নির্দেশিত আয়াতে কারিমার দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, কুরআন হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহর তরফ থেকে জীবন দর্শন। এ দর্শন থেকে বিধান নিতে হয়। বিধান দিয়ে থাকেন নবী-রাসূলগণ।

আরও সুস্পষ্ট যে এ গ্রন্থের দ্বারা মানবজাতির জন্য আল্লাহর তরফ থেকে অফুরন্ত নেয়ামত অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। মানুষের বিচার-বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, সবগুলো আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা ন্যায়, অন্যজনের কাছে তা অন্যায়। আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া ছাড়া মানুষ পরিপক্ক হয় না। তাই মানুষকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত, আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হওয়ার নির্দেশ পবিত্র কোরআনে বারবার দেওয়া হয়েছে। মানুষের নৈতিক জাগতিক, পরলৌকিক যাবতীয় বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহর তরফ হতে অফুরন্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মানুষ সৃষ্টিলগ্নে ফেরেস্তাগণ পরওয়াদিগারের নিকট প্রশ্ন তুলেছিল যে, এই মানব পৃথিবীতে তাদের নৈতিকতা হারাবে, ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফাসাদ ও কলহে লিপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ বললেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না।' আল্লাহপাক হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে স্বীয় 'রূহ' ফুঁকে দিলেন, স্বীয় জ্ঞানে জ্ঞানী করে ফেরেস্তাদের কাছ থেকে সিজদা নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

الانسان سوری وانا سرہ.(حدیث قدسی)

আল ইনসানু সিরবি, ওয়া আনা সিররুহু। [হাদিস কুদসি]

অর্থ : মানুষ আমার রহস্য আর আমি মানুষের রহস্য।

خلق آدم علی صورة الرحمن.(حدیث قدسی)

খুলিফা আদামু আলা ছুরাতির রহমান। [হাদিস কুদসি]

অর্থ : আল্লাহ নিজ সুরতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। হাদিসদ্বয়ের সমর্থনে পবিত্র কোরআনের আয়াত হচ্ছে—

ফিত্বরাতাল্লা হিললাতি ফাত্বারান্নাছা আলাইহা।

—সুরা:রূম : ৩০

www.pathagar.com

অর্থ : আল্লাহর প্রকৃতিই সেই প্রকৃতি যার থেকে মানব প্রকৃতি গঠিত হয়েছে।

من عرف نفسه فقد عرف ربه.

মান আরাফা নাফ্ছাহু ফাকাদ আরাফা রব্বাহু। [হাদিস]

অর্থ : যে নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে।এ চেনা ও জানাটাই হচ্ছে জ্ঞান। এ জ্ঞান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ চেনা ও জানার জ্ঞানে ভরপুর পবিত্র কুরআন। সুতরাং নিজেকে জানার জন্য, চেনার জন্য, তথা আল্লাহকে জানা ও চেনার জন্য পবিত্র কোরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
শুধু আরবি ভাষা জানলেই পবিত্র কুরআন বুঝা যাবে এমন কোনো কথা নেই, আর আরবি ভাষা না জানলেই পবিত্র কুরআন থেকে হেদায়াত পাবে না, এমনো কোনো কথাও নেই। কারণ আল্লাহ্ পাক বলছেন,

ইয়াখতাচ্ছু বিরাহমাতিহী মাইয়্যাশাউ।

—সুরা: আলে ইমরান:৭৪

অর্থ : যাকে ইচ্ছা তিনি নিজ গুণে বাছিয়া লন।

ইয়াহ্ দি আল্লাহ লি নূরীহী মাঁইয়াশ্যা য়্যু।

—সুরা: নূর:৩৫

অর্থ : আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর নূর যোগে হেদায়ত করেন।

ওয়া আললাম নাহু মিন্ লাদুনান ইলমা।

—সুরা:কাহ্ফ::৬৫

অর্থ : আমি তাঁকে আমার তরফ থেকে 'এলমে লদুন' বা খাস এলম দান করিলাম।
যেমন পবিত্র কোরআনের সুরা আর-রহমানের প্রারম্ভে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করছেন—

আর রহমান। আল্লামাল কুরআন। খালকাল ইনসানা।

অর্থ : রহ্মান প্রভু পবিত্র কোরআনের জ্ঞান দান করেন। (এবং) মানুষ সৃষ্টি করেন। কোরআনের জ্ঞান দান করার মাধ্যমে মানব নামের জীবগুলোকে 'ইনসানে' পরিণত করেন।

www.pathagar.com

ইন্না জাআলনাহু কুরআনান আরাবিয়্যাল লাআল্লাকুম তাকিলুন ওয়া ইন্নাহু ফী উম্মিল কিতাবিব লা দাইনা লা আলীয়্যুন হাকিম... ।

—সূরা: যুখরুফ:৩-৪

অর্থ : নিশ্চয় আমরা ইহাকে আরবি কুরআন করেছি (অর্থাৎ আরবি ভাষায় নাজিল করেছি) যাতে তোমরা বুঝতে পার। এবং নিশ্চয়ই উহা আসল কিতাবের মধ্যে (উম্মুল কিতাব) আমার নিকট উচ্চ বিজ্ঞানময় অবস্থায় রয়েছে।

পবিত্র কোরআনের জ্ঞান আল্লাহর কাছে সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। প্রিয়নবী (সা.)-এর নিকট তা আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন এই জন্য, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে। যেহেতু প্রিয়নবী (সা.)-এর মাতৃভাষা ছিল আরবি সেহেতু পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে এবং তিনি তা আরববাসীদের মধ্যে প্রচার করেছেন। প্রিয়নবী (সা.) যদি ভারতবর্ষে আবির্ভূত হতেন তাহলে ভারতের ভাষাই হতো কোরআনের ভাষা। সুতরাং একমাত্র আরবি ভাষা আল্লাহর নিজস্ব ভাষা বলার কোনো যুক্তি নেই। যদি তাই হতো তাহলে পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব ও সহিফা আরবি ভাষায়ই নাজিল হতো। সব নবী যেমন আরববাসী ছিলেন না তেমনি সব কিতাবও আরবি ভাষায় নাজিল হয়নি, একথা ধর্মীয় ও ঐতিহাসিকভাবে সত্য। উপরোক্ত আয়াতে করিমে বর্ণিত হয়েছে, মানুষের বুঝার জন্য পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল করা হয়েছে। এতে একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, পবিত্র কোরআনে ভাষার চাইতেও বুঝার গুরুত্ব বেশি। যেহেতু আরববাসীদের ভাষা ছিল আরবী তাই কোরআনের ভাষা আরবী করা হয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে প্রত্যেক নবীর মাতৃভাষায় আল্লাহপাক কিতাব নাযিল করে থাকেন।

মূলত আল্লাহপাকের নির্দশনগুলোর মূল দর্শন হলো পবিত্র কোরআনের সমস্ত কালামউল্লাহ। যেখানে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ায় পূর্ববর্তী অন্যান্য আসামনী কিতাবগুলো বাতিল হয়েছে, এমন কথা বলা যাবে না (অবশ্য আমাদের ওলামারা না বুঝেই এমন কথা বলে থাকেন) সেখানে পবিত্র কোরআনের একটি বাক্য অন্য একটি বাক্যের দ্বারা বাতিল হয়েছে তাও বলা যাবে না। কারণ পবিত্র কোরআনে মুসা নবীর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাওরাত এবং ইসা নবীর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ইঞ্জিলের অনুসরণের কথাও বলা হয়েছে। যেমন কোরআনের আয়াত—

কুল ইয়া আহ্লাল কিতাবি লাস্‌তুম 'আলা- শাইয়িন হাত্তা তুকীমুত তাওরাতা ওয়াল ইনজীলা ওয়ামা উন্‌যিলা ইলাইকুম মির রাব্বিকুম।

www.pathagar.com

অর্থাৎ বল হে আহলে কিতাব! তোমরা কোন পথের উপরই নও যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তৌরাত, ইঞ্জিন ও তোমাদের রব হতে অবতীর্ন কিতাবের অনুসরণ কর।

—সুরা মায়িদা : ৬৮

আহলে কিতাবদের একথা বলা হয়নি যে, তোমরা তোমাদের রব হতে অবতীর্ণ তৌরাত, ইঞ্জিন, যবুর ইত্যাদি কিতাব ছেড়ে দিয়ে অন্যকোনো কিতাব অনুসরণ কর। তাছাড়া পূববর্তী সকল কিতাব যে বাতিল বা রহিত হয়েছে তাও পবিত্র কোরআনের কোনো আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। কারণ পবিত্র কোরআনের ভাষ্যমতে একথা বুঝতে আমরা অক্ষম হয়েছি যে, আল্লাহর নাজিল করা প্রতিটি কিতাবই 'কিতাবুন মাকনুন' তথা রক্ষিত গোপন কিতাব থেকে আগত এবং তার প্রত্যেক অনুসারীই পবিত্র কোরআনের ভাষায় মুসলমান।

ইসলামী জ্ঞানের মহাপণ্ডিত ও বিখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম রাজী তাঁর তফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, যুক্তিবাদী ভাষ্যকার আবু মুসলিম ইস্পাহানীর মতে পবিত্র কোরআনের কোনো আয়াত মনসুখ বা খণ্ডিত হয়নি।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করছেন— *সুন্নাতাল্লাহি লা তাবদিলা অথবা লি সুন্নাতাল্লাহি তাবদিল* অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন হয় না বলে যেখানে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, সেখানে আমাদের ওলামাসমাজ নস্খ ও মনসুখ ইত্যাদি বিভ্রান্তিকর মসায়লা এনে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করতে চায়।

মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বিশারদরা নস্খ ও মনসুখ বিষয়টার উপর যে ধর্মনীতি রচনা করেছেন তা এত বেশি জটিল ও ব্যাপক যে তাকে হিমালয়ের মত একটি বিরাট মিথ্যার বোঝা উম্মতের মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে কয়েকশ পৃষ্ঠার একখানা পুস্তক রচনা করতে হয়। কিন্তু এখন তো তা সম্ভব নয়। তবে আমরা পবিত্র কোরআনের উদ্বৃতি দিয়ে একথা সংক্ষেপে পাঠকের কাছে তুলে ধরছি যে, আল্লাহপাক নিজেই স্পষ্টভাবে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করছেন যে,

লা তাবদিলা লি কালিমাতিল্লাহ।

—সুরা ইউনুস : ৬৪

অর্থ : আল্লাহতায়ালার কালাম বা কথার কোনো পরিবর্তন হয় না।

লা মুবাদ্দিলা লি কালিমাতিহ

—সুরা: আন'আম : ১১৫

www.pathagar.com

অর্থ : কেহ নেই যে, আমার বাণীর পরিবর্তন করে। আল্লাহর কালাম, কথা বা বাক্যের প্রধান উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন। পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেই আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদের সাথে কালাম বা কথা বিনিময় করেছেন। আল্লাহর প্রতিটি আদেশ এবং নিষেধ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেই মানুষের নিকট পৌঁছেছে বা অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'আয়াত' শব্দের অর্থ বাক্য নয়, আয়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বা নির্দশন আর 'কালাম' শব্দের অর্থ হচ্ছে বাক্য বা কথা (দেখুন আরবি লওগাত)। সুতরাং আল্লাহপাক যেখানে নিজেই ঘোষণা করছেন যে, তাঁর কালাম, বাক্যের বা কথার (পবিত্র কোরআনের বাক্য), কোনো পরিবর্তন হয় না। এ পবিত্র কুরআন লওহ মাইফুজে উম্মুল কিতাবের মধ্যে উচ্চ বিজ্ঞানময় অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে এবং যুগে যুগে বিভিন্ন নবী (আ.)দের মারফত তাদের নিজস্ব ভাষায় যুগোপযোগী হেদায়েত পদ্ধতিসহ নাজিল হয়েছে।

একথা পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আসলে যুগে যুগে পবিত্র কুরআনই বিভিন্ন কিতাবের নামাকরণে বিভিন্ন ভাষায় নাজিল হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত লওহ মাহফুজে সংরক্ষিত উম্মুল কিতাব-ই হচ্ছে পবিত্র কুরআন। ওই উম্মুল কিতাব বা কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী (সা.)-এর উপর পূর্ণাঙ্গভাবে নাজিল হয়েছে। তাই বর্তমানে যারা পবিত্র কোরআনের অনুসারী তাঁরা যেমন মুসলমান তেমনি যুগে যুগে পবিত্র আসমানী কিতাবের জ্ঞান বা হেদায়েত নিয়ে যেসকল নবী রাসুলগণ তাদের স্ব স্ব কিতাবের মাধ্যমে যা নাজিল হয়েছিল তাঁদের অনুসারীদের নামও মুসলমান। মুসলমান মানে সত্যপথের অনুসারী।

তাই পবিত্র কোরআনে মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তারা যেন মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ না করে। তেমনি হযরত ইব্রাহিমের জাতি এবং অনুসারীদেরকেও মুসলমান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ওয়া জ্বা-হিদূ ফিল্লা-হি হাক্কক্বা জ্বিহা-দিহী; হুওয়াজ্তাবা-কুম ওয়ামা-জ্বা'আলা 'আলাইকুম্ ফিদ্ দীনি মিন্ হারাজিন; মিল্লাতা আবীকুম ইব্রা-হীমা; হুওয়া সাম্মা-কুমুল মুসলিমীনা মিন্ ক্বাবলু ওয়া ফী হা-যা লিয়াকূনার রাসুলু শাহীদান 'আলাইকুম ওয়া তাকূনু শুহাদা-আ 'আলান্ না-সি, ফাআক্বীমুছ ছালা-তা ওয়া আ-তুয যাকা-তা ওয়া'তাছিমূ বিল্লা-হি; হুওয়া মাওলা-কুম, ফানি'মাল মাওলা- ওয়া নি'মান্ নাছীর।

—সূরা: হাজ্ব ;৭৮

এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে করা উচিত, তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। দ্বীনের বিধান তোমাদের জন্য কঠোর করেননি। এই দ্বীন তোমাদের

www.pathagar.com

পিতা ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুরূপ। আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন– 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও করেছেন। যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় এবং তোমরাও সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।
আরো দেখা যায় আল্লাহপাক ইহুদি খ্রিস্টানদের তাদের দ্বীনের অনুসারী হবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন—

কুল ইয়া আহ্লাল কিতা-বি লাস্তুম 'আলা- শাইয়িন হাত্তা- তুক্বীমুত তাওরা-তা ওয়াল ইনজীলা ওয়ামা উন্যিলা ইলাইকুম মির রাব্বিকুম; ওয়ালা ইয়াযীদান্না কাছীরাম মিন্হুম মা উন্যিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা তুগইয়া-নাওঁ ওয়া কুফ্রান, ফালা- তা'সা 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

—সূরাঃ মায়িদাহ : ৬৮

বলুন (হে নবী!) হে আহলে কিতাব! তোমরা সঠিক পথে অবস্থান করবে না যে পর্যন্ত না তোমরা তৌরাত, ইঞ্জিল ও তোমাদের রব হতে অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ কর । তবে তোমরা কিছুর উপর নও এবং নিশ্চয় আপনার রব হতে যা আপনার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও অবিশ্বাস বাড়বে, অতএব আপনি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।
পবিত্র কোরআনে খৃস্টানদের অনেককেই আল্লাহপাক মুমিন ও মুসলমান বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন :

ফালাম্মা আহাস্সা ঈসা- মিনহুমুল কুফ্রা ক্বা-লা মান আনছা-রী ইলাল্লা-হি; ক্বা-লা হাওয়া-রিইয়্যূনা নাহ্নু আনছা-রুল্লা-হি, আ-মান্না- বিল্লা-হি, ওয়াশহাদ বিআন্না-মুসলিমূন।

—সূরা; আলে ইমরানঃ ৫২

যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল, তখন সে বলল, 'আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী?' শিষ্যগণ বলল, 'আমরাই আল্লাহর পথে আপনার সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস এনেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী মুসলিম, তুমি সাক্ষী থাক।'

আল্লাহপাক আরও বলেন,
ওয়া লাও আ-মানা আহ্লুল কিতা-বি লাকা-না খাইরাল্ লাহুম; মিনহুম মু'মিনূনা ওয়া আকছারুহুমুল ফা-সিকুন।

—সূরা; আলে ইমরানঃ ১১০

www.pathagar.com

যদি আহলে কিতাবগণ বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে অবশ্যই তাদের মঙ্গল হত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসী এবং তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী।

তাই দুনিয়ার সমস্ত মানুষই ইসলামের ছত্র ছায়ায়। আল্লাহ দান করলেন ইসলামের পরিপূর্ণতা। তাহলে আমাদের ব্যর্থতা কোথায় যে, আমরা ফেৎনা ফ্যাসাদে লিপ্ত আছি। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও নবীগণের আদর্শের অনুসরণ আমাদের সকল প্রকার দ্বন্দ্ব কলহ ও জাতি সম্প্রদায়ের হানাহানি কাটাকাটি মারামারি থেকে হেফাজত করে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি দিতে পারে।

ইকবালের এ আলোচনা উপস্থিত মুসলিমদের মুগ্ধ করার পাশাপাশি জার্মানীর নানা সম্প্রদায়কে বিশেষ করে খৃস্টানদের মুগ্ধ করেছিল। কিছু কিছু ইহুদিও এ আলোচনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রে এমন আধুনিক ও জ্ঞানী মুসলমান পেয়ে তারা রীতিমত অবাক বনে গেছেন। কিন্তু সত্যিই ভাবার বিষয় ইকবালের এই জ্ঞান জগতের পথিকৃত জার্মানী ও লন্ডনের অধিবাসী শিক্ষকদের মাধ্যমেই।

ইকবালের তৃতীয় বক্তৃতার আসর ছিল লন্ডনের এক অভিজাত অডিটরিয়ামে। সেখানের মুসলিম কমিউনিটির এক সেমিনারে ইকবাল বিশ্বনবী ও ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষা সম্পর্কে বলছিলেন। ইকবাল এখানে মুসলমানদের নৈতিক গুণাবলি, কুরআনের শিক্ষা ও বিশ্বনবীর অনুসরণীয় আদর্শ গ্রহণের জন্য বিশ্ব মুসলিম মিল্লাতের প্রতি জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন।

ইকবাল বলেন, আমরা মুসলমানরা আজ নবীর আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছি। মুসলিম জাতি ভুলে গেছে তার অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জল ইতিহাসের কথা। বিশ্ব এগিয়ে চলছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাত ধরে। আজ সমগ্র বিশ্বে সকল সম্প্রদায় উন্নতির শিখরে আরোহন করছে অথচ মুসলমান সম্প্রদায়ের তেমন অগ্রগতি নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেমন নেই তেমন আল্লাহকে স্মরণ ও নবীর প্রতি মহব্বতের ক্ষেত্রেও আমাদের উদাসীনতা চোখে পড়ে। আমরা এত অলস যে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়েও কৃপণতা করছি। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ইকবালের ঘোষণা :

ওয়াদিয়ে নজদ মেঁ ওহ শোরে সালাসেল না রাহা
কায়েস দেওয়ানায়ে নাজারায়ে মাহফিল না রাহা ॥

হাওসালে ওহ না রাহে, হাম না রাহে দিল না রাহা
ঘর ইয়ে উজড়া হয়ে কে তূ রওনকে মাহফিল না রাহা ॥

আয় খোশ আঁ রোয কে আয়ী ওয়া বসদ নায আয়ী!
বে হেজাবানা সোয়ে মাহফেলে মা বায আয়ী ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ আজ নজদের মাঠে উট পালের ঘন্টার ধ্বনি নেই, আজ কায়েস ও মজনু তার প্রিয়া লায়লা ও শরারীর হাওদাখানি দেখতে ব্যস্ত নয়। ঐ সাহস নেই, আমরা নেই, অন্তরও নেই যখন তুমি আমাদের মাহফিলে নেই এখন এ ঘর বিরাণ হয়ে গেছে। সুখের ঐ দিন কবে হবে যেদিন তুমি আমাদের মাঝে সেজে-গুঁজে আসবে।

এখন মুসলমানের মধ্যে রাসুলের প্রেমের ঐ জযবা দেখা যাচ্ছে না, এখন মুসলমান ইসলামের উপর কুরবানও হচ্ছে না। এখন আর মুসলমানের সাথে পূর্বের ন্যায় মুহাব্বতও নেই। বাস্তব কথা হলো এখন আমাদের মধ্যে বড় হিম্মতও নেই। হে প্রভু! শেষ মুহূর্তেও যদি তুমি আমাদের উপর আবার মেহেরবানী করতে এবং আমাদের অসহায়ত্বের উপর ইহসান করে আমাদের মাহফিলে তাশরিফ আনতে। আমরা আবার তোমার প্রেমের ঝান্ডাকে সমুন্নত করার জন্য জীবন বিসর্জন দিতাম।

ইকবাল দুঃখ করেছেন মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে। কারণ মুসলমান আজ আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়াও আদায় করতে পারছে না আর নেয়ামতের অধিকারীও হতে পারছে না। তাই খোদার কাছে তাঁর ফরিয়াদ হল তিনি যদি আবার অতীতের ন্যায় মুসলমানদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে দুনিয়ার গৌরব ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতেন তাহলে প্রয়োজনে তারা খোদার জন্য নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে দিতেন। কিন্তু কুরআনের ঘোষণা হল আগে তোমরা অতীতে প্রাপ্ত আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর। যেমন :

ইয়া আইয়্যাহান্নাছু জকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম।

অর্থাৎ : হে মানবগণ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর (প্রদত্ত) নেয়ামতকে (দানসমূহকে) স্মরণ কর।

—সুরা ফাতির : আয়াত : ৩

এ আয়াতের কথা স্মরণের দ্বারা ইকবাল মুসলমানদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'আগে তোমরা নেয়ামতের যোগ্যতা অর্জন কর, মুসলমানিত্ব অর্জন কর, তবে আল্লাহও তোমাদের প্রতি সদয় হবেন। অর্থাৎ আল্লাহপাক কারও ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার ভাগ্যের পরিবর্তনে এগিয়ে না আসে।

উক্ত আয়াতে 'ইয়া আইয়্যুহান্নাছ' বলে আল্লাহ সকল মানব সন্তানকে এই হুকুম দিয়েছেন। এ ছাড়াও আল্লাহতায়ালা ঈমানদারদের ওপর হুকুম দিয়েছেন—

ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানুজকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম।

www.pathagar.com

অর্থ : হে যারা ঈমান এনেছ তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর (প্রদত্ত) দান সমূহের স্মরণ কর। [সুরা আহজাব : ৯, সুরা মায়েদা : ৭, সুরা বাকারা : ২৩১]

আল্লাহর নেয়ামতের স্মরণ বা জিকির সকল মানব সন্তানকে করতে হবে, ঈমানদারদের বেলায় তো অবশ্যই করতে হবে। ঈমানারগণ তো আল্লাহর নেয়ামত প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে পারেন কিন্তু যারা আল্লাহয় বিশ্বাস করে না তারাও কোনো-না-কোনো ভাবে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে হলেও আল্লাহর নেয়ামতের কথা কিছু-না-কিছু অবশ্যই স্মরণ করে থাকে। তারা মৌখিকভাবে স্বীকার না করলেও তাদের অন্তর-আত্মা পরোক্ষভাবে আল্লাহর নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে থাকে। এভাবে কোনো সৃষ্টিই আল্লাহর জিকির থেকে বিরত নেই। মানুষকে আল্লাহপাক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর এ সমস্ত নেয়ামত প্রত্যক্ষ করতে পারে। মানুষের মনে প্রথমে যে চিন্তাটি আসে তাহলো, এ বিশ্বচরাচরের একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন এবং তিনি তা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে একটি অপরটির প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যখন আরো প্রত্যক্ষ করবে যে, তাকে সৃষ্টিকর্তা আদম অজুদ তথা সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তারই সেবা করছে। সূর্য তাকে তাপ দিচ্ছে, চন্দ্র আলো দিচ্ছে, নদীর মিষ্টি পানি তার পিপাসা নিবারণ করছে, গাছের ফলমূল তার ক্ষুধা নিবারণ করছে ইত্যাদি। মানুষ তখন আল্লাহর এ অফুরন্ত নেয়ামত গুণে শেষ করতে পারবে না এবং স্বাভাবিকভাবে তখন তার অন্তর-আত্মা মহান রাব্বুল আলামীনের কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়ে পড়বে।

আল্লাহপাকের নির্দেশ অনুসারে তিন প্রকার জিকির করা ওয়াজিব। আল্লাহর নেয়ামতের জিকির, আল্লাহর নামের জিকির ও আল্লাহর জাতের জিকির। আল্লাহতায়ালা তাঁর নেয়ামতের জিকিরের হুকুম আল কোরআনে অনেক স্থানে দিয়েছেন। কিন্তু যারা লোক দেখানো জিকির করে তাদের জিকির আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়না। সেজন্য আল্লাহর জিকিরের উত্তম সময় হল নিভৃতে নির্জনে গভীর রাতে। আল্লাহর ঘোষণা হল :

আল্লাজিনা ইয়াজকুরুনাল্লাহা কিয়ামাও অকুউদাও ওয়া আলা জুনুবিহীম ওয়া ইয়াতাফাক্কারুনা ফি খালকিছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি রাব্বানা মা খালাকাতা হাজা বাতিলান সুবহানাকা ফা কিনা আজাবুন নার।

—সুরা আলে ইম্রান : ১৯১

অর্থ : যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহর জিকির করে এবং আকাশ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে

www.pathagar.com

চিন্তা করে (এবং বলে) হে আমাদের প্রভু! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি করনি তুমি পবিত্র এবং আমাদেরকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা কর।

উক্ত আয়াতে করিমা থেকে বুঝা যায় যে, দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে তথা যে-কোনো অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা যায় তথা স্মরণ করতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং এ বিস্ময়কর সৃষ্টি অবলোকন করে অবিভূত হয়ে পড়াও আল্লাহপাকের এক উৎকৃষ্ট জিকির।

আল্লাহপাক আমাদেরকে অতি সুন্দর আকৃতিতে গঠন করেছেন। তাই কুরআন বলছে, তোমাদের চেহারাকে সুন্দরতম আকৃতিতে গঠন করা হয়েছে। [৪০:৬৪, ৬৪:৩, ৯৫:৪]।

আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের রূপ (বাহ্যিক) দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। মনে হয় আমার মতো সুন্দর মানুষ বুঝি দুনিয়াতে আর একটিও নেই। সুন্দর চেহারা, সুন্দর মন—সে মনে প্রেম, ভালবাসা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা দিয়ে কত নিপুণভাবেই না আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ আমি মানুষটি এতই অকৃতজ্ঞ যে, সে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে তার এ অফুরন্ত নেয়ামতের জন্য একটিবারও শোকরিয়া আদায় করলাম না। তারপরও আল্লাহতায়ালা আমাকে দিয়েছেন মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন। দিয়েছেন তাদের মধ্যে আমার জন্য প্রেম, ভালবাসা। আল্লাহ আরো ধন্য করেছেন আমাদেরকে এমন এক মহান নবী (সা.)-এর উম্মত করে, যিনি আল্লাহতায়ালার পেয়ারা মাহবুব এবং যাঁকে সৃষ্টি না করলে খোদাতায়ালা তাঁর খোদায়ী প্রকাশ করতেন না। আরো দিয়েছেন আমাদেরকে পীর-মুর্শিদ বা আধ্যাত্মিক পিতা যিনি আমাদেরকে সত্যপথের দিক নির্দেশনা দেবেন, পবিত্র কুরআন থেকে হেদায়ত দেবেন সর্বোপরি মহান আল্লাহর সাথে জিকির বা সংযোগ স্থাপন করে দেবেন। কিন্তু আমরা মানুষ এতই হতভাগা, অকৃতজ্ঞ যে, আল্লাহর এ সমস্ত মহান নেয়ামতের জন্য তাঁর শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তো করিইনা বরং দম্ভ অহংকারে আল্লাহর এ সমস্ত নেয়ামতকে অস্বীকার করি এবং তার নির্দেশিত সিরাতুল মোস্তাকিমের পথে নিজেদেরকে পরিচালিত না করে ইবলিশ শয়তানের নির্দেশে পরিচালিত হই। তাই আল্লাহপাক কোরআনে বলেন,

লাক্বাদ খালাক্বনাল ইনসানা ফী আহসানি তাক্বভীম, ছুম্মা রাদাদনা হু আছফালা ছাফিলীন। [ত্বীন : ৪-৫]

অর্থ : আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে (সুরত, জ্ঞান-প্রজ্ঞা সবদিক থেকেই) সৃষ্টি করেছি অতঃপর তাকে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম স্থানে নিক্ষেপ করি।

www.pathagar.com

আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করা এবং তার জন্য শোকরিয়া আদায় না করার জন্য মানুষকে এ শাস্তি দেওয়া হয়। আল্লাহর নামের জিকির করার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম হলো,

লিল্লাহিল আছমাউল হুছনা ফাদ উ'হু বিহা [সুরা আরাফ : ১৮০]

অর্থ : আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে। সে নাম সহকারে তার জিকির করো। ধর্মীয় সাহিত্যে আমরা আল্লাহর নিরানব্বই নামের উল্লেখ দেখতে পাই। আসলে আল্লাহর গুণ বা সিফত অফুরন্ত তা গণনার মধ্যে আনা অসম্ভব। পৃথিবীতে যতগুলো ভালো নাম এবং গুণ আছে সবগুলোর মূলে আছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সৃষ্টির সেরা হিসেবে এ সমস্ত গুণাবলি মানুষের নিকট অর্পিত হয়। আল্লাহর গুণে, আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত হবার জন্য পবিত্র কোরআনে বারবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—

ছিবগাতাল্লাহ অ মান আহছানু মিনাল্লাহি ছিবগাতাউ অ নাহ্ন লাহু আবিদুন।

—সুরা বাকারা : ১৩৮

অর্থ : আমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত—আল্লাহর রং অপেক্ষা কার সৌন্দর্য উত্তম? আমরা তাঁরই ইবাদত করি।

আল্লাহর এই সুন্দর সুন্দর নামগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ইছমে আজম। এই ইছমে আজমের মাধ্যমে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। এই 'ইছমে আজম' যে কোনটি তার সঠিক উত্তর দিতে আরবি বিদ্বানরা অক্ষম। তাই 'ইছমে আজম' শিখতে হয়, জানতে হয় আল্লাহর অলিদের কাছ থেকে। 'ইছমে আজম' কঠিন সাধনার ফল। 'ইছমে আজম' হলো আল্লাহপাকের আদি নাম—যে নামে সকল সৃষ্টি আল্লাহর জিকির করে। এ নাম তারা চিল্লাচিল্লি করে স্মরণ করে না। মুমিন হতে গেলে এ নাম স্মরণ থেকে গাফেল থাকা চলবে না। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে হুকুম করেন—

ওয়াজকুর রাব্বাকা ফিনাফ্ছিকা তাদার রুঁয়াও ওয়া খীফাতাঁও ওয়া দুনাল জ্বাহরি মিনাল কাওলী বিল গুদুওয়্যি ওয়াল আছালি ওয়ালা তাকুম মিনাল গাফেলিন। [সুরা আরাফ : ২০৫]

অর্থ : তোমার প্রতিপালক প্রভুর স্মরণ করো তোমার নিজের মধ্যে ভক্তি মহব্বত ও বিনত অবস্থায় এবং ভয়ের সহিত এবং বাহ্যিক কোনরকম শব্দ

www.pathagar.com

উচ্চারণ না করে—সকাল-সন্ধ্যায় এবং (এ জিকির থেকে) অলসদের (গাফেলদের) অন্তর্গত হয়ো না।

এ ইছমে আজমের জিকিরকে পাঁচ আনফাছের জিকিরও বলা হয়। আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক, (মাটি), বাদ (বাতাস) এবং রুহ (আত্মা)। এ পাঁচ জিনিসের একত্র সমন্বয় ঘটলে এ জিকির জারী হয়ে যায়। অন্যান্য সৃষ্টিরা তা না জেনে না বুঝে প্রকৃতিগতভাবে এ জিকিরে রত। কিন্তু মানুষকে এ জিকিরের হাকিকত সম্পর্কে অবগত হতে হয়। জিকিরে রপ্ত থাকার তাগিদ আল্লাহপাক যেভাবে দিয়েছেন অন্যকোনো ইবাদতের ব্যাপারে এত জোর তাগিদ দেননি। মূলত সমস্ত ইবাদতের মূল রুহ হচ্ছে—'জিকিরুল্লাহ'। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করছেন—

ওয়ামানআরাদ্বা আন জিক্‌রী ফাইন্নাল্লাহ্ মায়ীশাতান দ্বানকাও ওয়া নাহ্‌শুরুহু ইয়াউমাল ক্বিয়ামাতি আ'মা। [সুরা ত্বাহা : ১২৪]

অর্থ : যে আমার স্মরণে (জিকিরে) বিমুখ, তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাব।

আল্লাহর নাম এবং নেয়ামত-এর জিকির ছাড়াও স্বয়ং আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যও আল্লাহপাক হুকুম করেছেন—

ফাইজা আফাদ্ তুম্ মিন্ আরাফাতিন্ ফাজকুরুল্লাহা ইনদাল মাশ'আরিল হারামি ওয়াজ্‌করুহু কামা হাদাকুম ওয়া ইন্‌কুনতুম মিন কাব্‌লিহি লামিনাদ দাল্লীন।

—সুরা বাকারা : ১৯৮

অর্থ : তোমরা যখন আরাফাতের ময়দান হতে ফিরে আস তখন *মাশ্‌আরিল হারামের (পবিত্র স্মৃতিস্থানসমূহ) গিয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর।* আর তাঁকে স্মরণ কর যেমন তিনি তোমাদেরকে হেদায়ত করেছেন এবং যদিও তোমরা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্টগণের অন্তর্গত ছিলে।

উপরোক্ত আয়াতে হাজীগণকে আল্লাহপাক নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁরা যেন নবী (আ.)দের স্মৃতি বিজরিত পবিত্র স্থানসমূহে গিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে। পথভ্রষ্টদের আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে যেভাবে হেদায়েত করেছেন সে মতে স্বীয় জীবনব্যবস্থা পরিচালনা হুকুমও উক্ত আয়াতের মধ্যে বিদ্যমান। নবী (আ.) দের অনুসৃত বিধান অনুসরণের তাগিদ রয়েছে।

ফাজকুরুল্লাহা কামা আল্লামাকুম মা লাম তাকুনু তা'লামুন (সুরা বাকারা : ২৩৯)

অর্থ : তোমরা আল্লাহকে সেভাবে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তাঁকে স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা কখনো অবগত ছিলে না।

www.pathagar.com

সুতরাং আল্লাহর এ জিকিরের পদ্ধতি নিয়ম-কানুন জেনে নিয়েই আল্লাহর জিকির করতে হয়। এ পদ্ধতি বা নিয়ম একজন হক্কানি রব্বানী পীর ও মুর্শিদে কামেল থেকে জেনে নিয়ে আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হতে হয়।

এরপর ইকবাল উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলছেন, আমরা কি ইসলাম হতে দূরে সরে যাচ্ছি না সঠিক রাস্তায় আছি? হয়তো বলবেন, আমরা মুসলমান, তাই ইসলাম তো আমাদের অন্তরে আছেই। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা যায় আমরা নানা দলমতে বিভক্ত হয়ে নবীর দ্বীন থেকে দূরে সরে গেছি। কিন্তু আল্লাহর বাণী কি আমাদের অন্তঃকরণে পৌঁছায়নি? আল্লাহপাক বলেন, '*ওয়াতাছিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়াও ওয়ালাতাফাক্কারু' (সুরা আল ইমরান: ১০৩)* অর্থাৎ 'এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রুজ্জু শক্ত করে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।'

আমরা কি শক্ত আছি না ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছি? এটাই কি ইসলাম? মানলাম কি মানলাম না। ইসলামের নামে হিংসা, মারামারি, কাটাকাটি, লাঠালাঠি দেখতে পাই। ইসলাম হবে নিরপেক্ষ ও নির্ভেজাল। পক্ষপাত দুষ্ট হলে আমরা কি অতল তলে তলিয়ে যাব না?

কথা হলো আমরা কি আল্লাহর রুজ্জু শক্ত করে ধরেছি না কোন ফাঁক ফোকরে আছি? কথায় আছে *Unity is strength* অর্থ একতাই বল। আর একতাই হচ্ছে সকল উন্নতির চাবিকাঠি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন একতা নেই। আমরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে গেছি। নবীজী (সা.) বলেন, '*নিশ্চয়ই বনি ইসরাইলেরা ৭২টি জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩টি জনগোষ্ঠী হবে তার একটা মাত্র দল জান্নাতে যাবে।*'

আল্লাহপাক বলেন, '*তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না। করলে সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে (সুরা আনফাল)*।'

রাসুল (সা.) বলেন, '*আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি যথা— জামাআত বদ্ধ জীবন, নেতার নির্দেশ শ্রবণ, নেতার আনুগত্য, হিজরত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ।*'

আল্লাহর পথে জিহাদ অর্থে এখানে নাফসানী জিহাদকে বুঝানো হয়েছে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে *Many men many mind* অর্থাৎ নানা মুনির নানা মত বা যত মত তত পথ। কিন্তু মতের বিরুদ্ধে মত আমাদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করেছে। আজ আমরা নবীর আদর্শ, কুরআন ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের শিক্ষা ভুলে জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব সংঘাতের বীজ বুনে চলেছি। অথচ কুরআনের ঘোষণা ছিল, 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালীয়া দ্বীন অর্থাৎ 'যার যে ধর্ম সে তা পালন করবে।' কিন্তু আজ ধর্মে ধর্মে জাতিতে জাতিতে হিংসা-বিদ্বেষ বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা নবী

www.pathagar.com

রাসুলদের শান্তির পথ, মিশন ও শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। এখন ভাবার সময় হয়েছে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মনীতি ও নবী রাসুলগণের আদর্শের অনুসরণ ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য অপরিহার্য।

'হে কিতাবী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নবীগণের আদর্শের পথে নিজেদের পরিচালিত কর। কারণ তাদের পথই সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ।'

আমাদের বিধান দাতা এক আল্লাহ। কুরআরের ঘোষণা, *'সুন্নাতাল্লাহি লা তাবদ্বীনা'* অর্থ আল্লাহর আইন বদলায় না। *I am to become a Muslim* অর্থাৎ আমাকে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। কিন্তু কিভাবে মুসলমান হওয়া যাবে? মুসলমান ছিল আমার বাবা আর আমিও এই সূত্রে মুসলমান। এই মাপে কি মুসলমান হওয়া যাবে? পঞ্চবিনা জানা লোকগুলো পূর্ণাঙ্গ মুসলমান কিনা? মুসলমান হওয়া লাগবে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে কোরান পাকে আল্লাহপাক বলেন, *'ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন' (সুরা বাকারাঃ ১৩২)* অর্থ– 'তোমরা মুসলমান না হয়ে মর না।' এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় মুসলমান হতে হবে। আল্লাহর নবীদের কাছে মানুষ তাওহীদী দ্বীন গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে। আল্লাহর নবী ভারতবর্ষে যাননি। তবে তাঁর উত্তরসূরীদের হাতে আমরা তাওহীদী দ্বীনের পথে দাখিল হয়েছি, তাদের অন্যতম হলেন, 'দাতা গঞ্জে বকস লাহোরী, হযরত খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি (রা.), নিজামুদ্দীন আউলিয়া, হযরত খানজাহান আলী (রা.), হযরত শেখ ফরিদ (রা.), হযরত শাহ জালাল (রা.), হযরত শাহ পরান (রা.) প্রমুখ অলি আউলিয়ার অবদান অপরিসীম।

আল্লাহপাক মানুষ তথা নূরময় আদম সন্তানের নিকট গিয়ে আত্মসমর্পণ করে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দান করেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত কখনও মুসলমান হওয়া যায় না। রাসুল (সা.) বেসাল হওয়ার পর তার আওলাদে রাসুল হতে নূজুলকৃত কালিমার দাওয়াত গ্রহণ ও তাওবাতুন নসুহা পাঠ করে সমগ্র বিশ্বে আজ মুসলমানের বাস। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ভিন্ন প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। পরিপূর্ণ মুসলমান হতে হলে তাকে বায়াত গ্রহণ করে দ্বীনে রাসুল (সা.) প্রদত্ত বিধান শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের বিধান জেনে অহেদিয়াত পর্যন্ত জয় করতে হবে। তবেই পূর্ণ মুসলমান হওয়া যাবে।

একজন মুসলমান হবে পূর্ণ ঈমানদার। তার হাত ও মুখ হতে অন্য মানুষ হবে নিরাপদ। হাদিস শরিফে আছে, *'কোন ব্যক্তি মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ সে হৃদয় ও বাক্যে মুসলমান না হয়। অর্থাৎ বাক্য শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন নির্মল আত্মাধারী হতে না পারলে মুসলমান হওয়া যাবে না।'*

www.pathagar.com

হাদিসে আরও আছে, 'যার হাত ও মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ না সে মুসলামান না।'

একজন পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তিকে অবশ্যই ঈমানের পঞ্চ শাখা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান রাখতে হবে। আর ঈমানের এ শাখাগুলো হলো (ক) হুয়াল একিন (খ) হাক্কুল একিন (গ) আইনুল একিন ঘ) ইলমুল একিন (ঙ) বিল গায়েব একিন। এ প্রসঙ্গে যিনি উদাসীন তিনি মুমিন তথা মুসলিম নন। অন্য এক হাদিসে আসে, *'মুমিনই সুখী; কারণ তার মঙ্গল ঘটিলে সে আল্লাহর প্রসংশা ও কৃতজ্ঞতা জানায়; আর দুর্ভাগ্য ঘটিলেও সে আল্লাহকে প্রসংশা করে ধৈর্যের সাথে সহ্য করে। অতএব মুমিন প্রতি অবস্থাতেই পুরস্কার অর্জন করে। এমনকি তার স্ত্রীর মুখে একগ্রাস আহার তুলে দেবার জন্য। আর এ ধৈর্য শক্তি তাকে মুক্তি দান করে।'*

মুসলমানের অন্য এক অর্থ হলো বিনয়ী, নিষ্ঠাবান, ভদ্রলোক। চেহারা সুন্দর হলে, গায়ের রংটি ফর্সা হলে, কোকরানো চুল, পটল চেরা আঁখি দেখলে কাউকে বিনয়ী, নিষ্ঠাবান ও ভদ্রলোক মনে করা যায় না। হাদিসের ভাষা অবলোকন করলে পাওয়া যায়, 'আল্লাহ নিজে কোমল তাই তিনি কোমল স্বভাবের লোককে ভালবাসেন। আর কোমল স্বভাবের লোককে যা দিবেন তা কঠোর স্বভাবের লোককে দিবেন না।' আল্লাহর নবী বলেন, *'আল বিররু হুসনুল খুলুকি'* অর্থ— 'সুন্দর ব্যবহারই পুণ্য।' আমরা পুণ্যের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই অথচ পুণ্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই। অন্য এক হাদিসে আছে, 'নম্রতা ও সৌজন্য পুণ্য কর্ম।'

কাউকে গালি গালাজ ও অভিশাপ দেয়া ইসলামে নাজায়েজ। গালি দেয়া প্রসঙ্গে হাদিসে আছে, 'কোন মুসলমানকে গালি দেয়া আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তার সহিত বিবাদ করা মন্দ কর্মের চেয়ে নিকৃষ্ট।' যদি কেউ কাউকে গালি দেয় বা অভিশাপ দেয় তাহলে ঐ ব্যক্তির প্রতি ফেরেশতারা মুখ বিবর্ণ করে থাকে এবং সাথে সাথে আল্লাহও নাখোশ হয়। সুতরাং তখনই ঐ ব্যক্তির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর নবী তায়েফে মুমূর্ষ অবস্থায়ও তায়েফবাসীকে অভিশাপ দেননি এবং তাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছিলেন। একজন মুসলমানকে এ দৃষ্টান্ত অবশ্যই অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে। স্বভাব বলতে আমরা মানব চরিত্রকে বুঝি। আর চরিত্র মানব মুকুট। তাই ইংরেজিতে আছে, *Character is the crawn and glory of a man* । চরিত্র যার পুত পবিত্র সেইতো মানব শ্রেষ্ঠ।

একজন মুসলমান হবে সৎ চরিত্রবান। চরিত্র মানবের অমূল্য সম্পদ। তাই চরিত্রের মাধুর্য অনুধাবন প্রয়োজন। হাদিসে আসছে, *'হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রশ্ন করা হলো ইসলাম কি? তিনি বললেন সংযম ও আনুগত্য। তখন*

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করা হলো সর্বোত্তম ঈমান কি? তিনি বললেন নম্র স্বভাব।' স্বভাবের অভাব আছে বলে মানবের মানবত্ববোধ নেই। ইংরেজিতে আছে, *Money is lost, nothing is lost; health is lost, something is lost, but character is lost everything is lost.*

অর্থ— 'তোমার টাকা হারিয়ে গেছে, কিছুই হারিয়ে যায়নি। তোমরা স্বাস্থ্য হারিয়েছে, কিছু হারানো গেছে। কিন্তু তোমার চরিত্র হারিয়েছে তাহলে তোমার সবই হারিয়ে গেছে।'

নবী (সা.) বলেন, *চরিত্র হচ্ছে সকল নেক কাজের মূল কথা*। নবীর আদর্শ গ্রহণ একজন মুসলমানের অবশ্যই প্রয়োজন। নবীর আদর্শ অনুকরণ, অনুসরণ ও কুরআনের শিক্ষার বাস্তবায়ন একজন মুসলমান হিসেবে রূপায়ন করা দরকার। নবী ছিলেন আল-আমিন। এ উপাধি কোন মুমিন মুসলমান তাকে দান করেননি। বিধর্মীরা তাকে আল-আমিন খেতাব দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান সম্প্রদায় এ উপাধী অর্জন করতে পারেননি। ইংরেজিতে আছে, *Truth is beauty and beauty is truth,* অর্থাৎ সত্যই সুন্দর আর সুন্দরই সত্য। এ কথা নবীজী তার জীবনে বাস্তবায়ন ও রূপায়ন করে গেছেন। সত্যই মানব জীবনের ফলপ্রসূ। তাই ইংরেজিতে আছে, '*Truth is fruitfull for our life*। রাসুল (সা.) বলেছেন, '*আল কাজিবু লা উম্মাতি*।' অর্থাৎ 'মিথ্যাবাদী আমার উম্মত না।' তাহলে তার উম্মত হতে হলে সত্যবাদী হওয়া প্রয়োজন। উম্মত হলেই কেতাবের বিধান তার উপর আসে, তার আগে না। আমি কি হলফ করে বলতে পারি আমি সত্যাশ্রয়ী মুসলিম। আল্লাহ তার নিজ জবানে বলেন, '*লানা তুল্লাহি আলাল কাজেবিন*' অর্থাৎ 'মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লানত।' তাই আল্লাহপাক যার উপর রুষ্ঠ তার কপালে কষ্ট একথা স্পষ্ট করে বলা যায়। এহেন অবস্থায় কোন মুসলমান কি মিথ্যা কথা বলতে পারে? এ বিষয়ে ভাবা দরকার। শুধু ইবাদত নির্ভর হওয়ায় কি মুক্তি পাওয়া যায়?

উৎকৃষ্ট পথ পিছে রেখে আল্লাহকে ডেকে কি লাভ আছে? মুসলমান হবে সত্য পথের দিশারী, অনুসারী ও সত্যের পূজারী। সত্যের সাধনা বিনা আরাধনা, উপাসনা কাজে আসবে না। আমিন শব্দের অর্থ বিশ্বাসী। আমাদের মাঝে কি বিশ্বাস ভাব আছে? যদি থাকতো তাহলে আমরা আল-আমিন খেতাব পেতাম। কিন্তু তা পাইনি।

মুসলিম জাতিকে মিথ্যা, অলসতা ও হিংসা গ্রাস করেছে। মিথ্যার তুল্য মন্দ নেই, হিংসার তুল্য পাপ নেই, দয়ার তুল্য ধর্ম নেই। হাদিস শরিফে আছে 'মিথ্যা হলো সকল পাপের মা' অর্থাৎ মা যেমন সন্তান জন্ম দেয় তেমনি মিথ্যা সকল পাপের জন্ম দেয়। তাহলে পাপ কি? উত্তরে বলা যায়, যে কর্মে অন্তরের অন্তরস্থলে অনুতাপ, অনুশোচনা ও ভয় সঞ্চার হয় তাই পাপ বা বিবেকের

www.pathagar.com

দংশন। আর কিসে পাপ মাফ হয় এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত আদম (আ.) এর পাপ মাফ হয়েছিল আউয়াল কালিমা তৈয়্যবা দর্শনে। কোরআনে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেন, *'আমি তওবাকারীর পাপ মাফ করে দিই।'* আরও বলেন, যৌবনে তওবাকারীর চেয়ে নিকটতম বন্ধু আর নেই। তাই আসুন আমরা সবাই তওবা করে পাপ মাফ করাই। হাদিসে আছে, এক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন চিহ্ন দ্বারা মানুষ তার ঈমানের প্রকৃত পরিচয় জানবে?' তিনি বললেন, *'সুকর্মে আনন্দ পেলে ও কুকর্ম করে দুঃখ বোধ করলে তুমি প্রকৃত ঈমানদার।'* সে আরও বলল, *'কিসে দোষ আছে বলে জানব?'* তিনি বললেন, *'যখন কিছু তোমার বিবেককে দংশন করে তা পরিত্যাগ কর।'*

—আল হাদিস

একজন মুসলমানকে হতে হবে আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সাধক। হেরা পর্বতের ঘটনা অবলোকন করলে আমরা দেখতে পাই নবীজী (সা.) এর দীর্ঘ ১৫টি বছর কেটেছে আধ্যাত্মিক সাধনায়। যে সাধনায় মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্ তার উপর পাক কোরান নাজিল করেন। হাদিস হতে জানা যায় এক মুহূর্তের ধ্যান একশ বছরের নফল ইবাদত হতে উত্তম। তাহলে ধ্যান সাধনা জানা ও মানা এবং অনুকরণ ও অনুসরণ করা অতি প্রয়োজন।

একজন মুসলমান হিসেবে ধ্যান সাধনা করা যাবে না এমন কোন বর্ণনা হাদিস হতে পাওয়া যায় না। তাই আধ্যাত্মিক সাধনা ব্যতীত কোন মুসলমান মুক্তি পাবে না। নবীয়ে মহান এর উদারতার একটা বিবরণ দেয়া প্রয়োজন মনে করি। এক বুড়ি নবীজীর চলার পথে কাঁটা দিত। হঠাৎ একদিন নবীজী দেখলেন পথে আর কাঁটা নেই। তিনি ভাবলেন নিশ্চয়ই বুড়ির কোন অসুখ হয়েছে। তাই তিনি বুড়ির বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। গিয়ে দেখলেন সত্যিই বুড়ির অসুখ হয়েছে। নবীজীর উপস্থিতিতে বুড়ি ভয় পেলেন। নবীজী তাকে সান্তনা দিয়ে রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করলেন। বুড়ি ভাল হলো। এ শিক্ষা আমরা বিশ্বনবীর থেকে গ্রহণ করতে পেরেছি কি?

আমার কথা হলো একজন মুসলমান হিসেবে এহেন কার্যাবলি আমাদের মাঝে থাকা প্রয়োজন কিনা? একটু ভাবা দরকার। শুধু পঞ্চবিনা নির্ভর হলেই কি মুক্তি পাওয়া যাবে? না নবীর চরিত্র বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে? অন্য এক বুড়ির গাঠুরী নিজের মাথায় করে নিয়ে বুড়িকে গন্তব্যস্থলে পৌছে দিয়েছিলেন। এমন ঘটনা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন কিনা? নবী জীবনের শেষ অলৌকিক ঘটনা মেরাজ। আর একাজ মুসলিম সমাজের জন্য করণীয়

www.pathagar.com

কিনা? যার হয় নেই মেরাজ বৃথাই তার নামাজ। নবীজী (সা.) হাদিস শরিফের ভেতরে বলেন, 'আস সালাতু মিরাজুল মুমিনিন' অর্থাৎ নামাজ মুমিনের মেরাজ বা সাক্ষাত। একাজ সহজে হাসিল হয় না। নামাজ বিষয়ে নবীজী (সা.) আরও বলেন, *'আস সালাতু কোরবায়ে আইনি ফিচ্ছালাত'* অর্থাৎ নামাজে আমার চক্ষু শীতল হয়। এ হাদিস হতে বুঝা যায় নামাজ দর্শনীয় বস্তু। আমি শুধু পড়া সমাপ্ত করলাম, আসলে এর বাস্তবতা কোথায়? বিষয়টি একটু ভেবে দেখা দরকার।

আল্লাহর নবীর কিশোর সময়ের এক ঘটনা হতে জানা যায়, ঐ সময় মক্কার কাবাঘর সংস্কারের প্রয়োজন হয়। এ সময় হাজরে আসওয়াদ তথা কৃষ্ণপাথর স্থানান্তরিত করা হয়। যখন কাবাঘরের সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে যায় তখন হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপন নিয়ে নানা গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব হতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সৃষ্টি হয়। তখন ওয়ালিদ বিন মুগীরা বললেন আগামী কাল ভোরে যে প্রথমে কাবাঘরে প্রবেশ করবে তার উপর মীমাংসার ভার ন্যস্ত করা হবে এবং তার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হবে। সেই মোতাবেক দেখা গেল ভোরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্ব প্রথমে কাবাঘরের ভেতরে প্রবেশ করেছেন। তখন সবাই নবীজীর উপর মীমাংসার ভার ন্যস্ত করেন। নবীজী (সা.) একটা চাদর বিছিয়ে চাদরের উপরে পাথরটি রেখে চাদরের কোনা চারটি গোত্রের প্রধানদের ধরতে বললেন। তারপর তিনি নিজ হাতে পাথরটি প্রতিস্থাপন করলেন। ফলে এতে দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান হলো, উদ্ভুত সমস্যার সমাধান হলো। এতে আল্লাহর হাবীবের সম্মান আরও বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে হাদিস হতে জানা যায় আল্লাহ বলেন, *'আমি কি এমন উৎকৃষ্ট কাজের কথা বলিব না যা সালাত ও রোজা হতে উত্তম? আর তা হলো পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা।'*

একজন মুসলমান হবে জ্ঞানী, গুণী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। বিষয় মোহ, লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ হতে তার অন্তর হবে ক্লেশ মুক্ত। প্রেম, পিরীতি, ভালবাসা তার মধ্যে থাকবে বিরাজমান। তাকে হতে হবে উদার, ন্যায়-নিষ্ঠাবান, হৃদয়বান, পরকল্যাণময়, ধৈর্যশীল, মিষ্টভাষী, নম্র, ভদ্র, দয়া, মায়া, স্নেহ, ক্ষমা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সর্ব জীবের কল্যাণ তার মধ্যে থাকবে বিরাজমান। এ সমস্ত মানবীয় গুণাবলিসম্পন্ন হবে একজন মুসলমানের আদর্শ। তার বিত্তের চেয়ে চিত্ত হবে বড়। আর এসব গুণের অধিকারী মুসলমান হবে অলি-আউলিয়া। এদের গুণে মুগ্ধ হয়ে মানুষ মুসলমান হবে। উল্লেখিত গুণগুলি আল্লাহর নবীর মধ্যে বিরাজমান ছিল। আর আমরা এ গুণগুলি হতে সরে ইসলাম হতে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। হুজুর (সা.) বলেন, *'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না যে, কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? শান্ত*

www.pathagar.com

মেজাজ, নরম কোমল স্বভাব, মিশুক হৃদয়, নেক খাসিলত লোকের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম।' সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজন প্রীতি নিবৃত্তি মুসলমানের অতি প্রয়োজন। হাদিসে আসছে, সুদ দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই হারাম। হিংসা, নিন্দা অহংকার, বড়াই, তাকাব্বুরী হতে আত্মরক্ষা দরকার। মনের কু-কামনা, বাসনা, কু-ধারণা একজন মুসলমানের জন্য মানা। ছল-চাতুরী, ফেৎনা-ফ্যাসাদ ইসলামে নেই। হাদিসে আছে, *'যে ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।' 'ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর' (আল কোরান- সুরা বাকারা)।* বান্দার হক নষ্টকারীকে আল্লাহ্ মাফ করবেন না। পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, জেদ, ক্ষেদ, ক্রোধ প্রতিরোধ প্রয়োজন। রাহাজানি, ছিনতাই, চুরি, মারামারি, খুনাখুনি ইত্যাদি মুসলমানের জন্য হারাম। চুরি সম্পর্কে নবীজী (সা.) বলেন, '*সে ব্যক্তি মুমিন মুসলমান নয় যে ব্যক্তি চুরি করে কিংবা মদ পান করে অথবা লুণ্ঠন করে বা পরের ধন আত্মসাত করে, সতর্ক হও, সতর্ক হও।*' উপরে উল্লেখিত অপরাধ হতে নিজেকে বাঁচাতে পারলেই কেবল মুসলমান হওয়া যাবে। *নিশ্চয়ই মুসলমান ভাই ভাই, (সুরা হুজুরাত)*।

এক মুসলমান বিপদে পড়লে অন্য মুসলমানের তাকে সাহায্য করা ঈমানী দায়িত্ব। হাদিসে আছে, '*দুনিয়াবাসীদের প্রতি সদয় হও, তাহলে আসমানের প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবে।*' হুজুর পাক (সা.) আরও বলেন, '*হিংসা কর না পরস্পরকে, ঘৃণা কর না পরস্পরকে এবং হও খোদার বান্দা সব ভাই ভাই।*' নবীজী (সা.) আরও বলেন, '*আল্লাহ দয়া করে না তাকে যে দয়া করে না মানুষকে।*' মুসলমান নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করতে হবে, নচেৎ সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না। '*তারাই আল্লাহর সবচেয়ে বড় শত্রু যারা ইসলাম গ্রহণ করে ও অবিশ্বাসীর কর্ম তথা মানুষের রক্তপাত করে' (আল হাদিস)।* কুরআন শরিফে আছে, '*ওলা ইয়াগতাব বায়াদুকুম আইউ হিব্বা আহাদুকুম আই ইয়া কুলা লাহমা আখিহি মাইতান ফাকারিহু তুহুম।*' অর্থ– আর গীবত করিবে না একে অন্যের, যদি কেহ গীবতে দৃষ্টি রাখে অর্থাৎ গীবত করে, সে তার মৃত ভ্রাতার গোস্ত খাইল, অতএব গীবতে বিরত থাক।'

মুসলমানগণ অলস, ভিক্ষাবৃত্তি তাদের পছন্দনীয় অথচ নবী ভিক্ষা বর্জন করে পরিশ্রমী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি। দ্বীনের নবীর সাফল্যের আদর্শের মধ্যে এর সফল বাস্তবায়ন দেখা যায়। কুরআন শরিফে আছে, '*ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল আবদাল মুহতারিফ।*' অর্থ: 'আল্লাহ উপার্জনশীল বান্দাদের পছন্দ করেন।'

নবীর আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষা সমানভাবে গ্রহণের জন্য আল্লাহপাক আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সুরা ফাতাহ তে আছে, '*ইন্নাল্লাজিনা ইউ*

www.pathagar.com

বায়িউনাকা ইন্নামা ইউ বায়িউনাল লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আহদিহিম ফামান নাকাছা ফাইন্নামা ইয়ানকুছু আলা নাফছিহী অমান আওফা বিমা আহাদা আলাইহুল লা হা ফাছা ইউতিহী আজরান আজীমা।' অর্থ- 'নিশ্চয়ই যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারাতো আল্লাহ্‌র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর। আর যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে সে তা করবে নিজের অনিষ্টের জন্যে। আর যে ব্যক্তি কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করবে আল্লাহ্ অচিরেই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।'

তাদের হাত এখানে বহুবচন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই রাসুলের হাতের বাইরেও হাত আছে। আর এ হাতগুলো নিশ্চয়ই অলি-আউলিয়া তথা বুজুর্গগণের হাত। তাই আসুন নবীর অবর্তমানে তাঁর নায়েবে রাসুলের হাতে হাত রেখে তাঁর আদর্শ, মহব্বত ও কুরআনের নির্দেশ মতে জীবন গড়ে তুলি।

আর এক বক্তৃতায় আল্লামা ইকবাল বস্তুবাদের অসারতা প্রমাণ করেন। সাথে সাথে সমগ্র মানবজাতিকে একটি সত্যের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তৃতার সারাংশগুলো জার্মানীর জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলোতে ফলাও করে প্রচারিত হয়।

www.pathagar.com

ইকবাল অনুরাগী পাশ্চাত্য মনীষী ও দার্শনিক ড. আর. এ নিকলসন

লন্ডনের বুদ্ধিজীবি মহলে আল্লামা ইকবাল তাঁর ধর্মতত্ত্ব, দর্শন জ্ঞান ও কাব্য প্রতিভার দরুণ বিপুলভাবে সমাদৃত হন। অনেক জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষাবিদের সাথে তাঁর আশাতীত বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে প্রাচ্য ভাষা ও কলাবিদ বিখ্যাত মনীষী ড. আর. এ নিকলসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইকবালের গুণ মাধুর্য, অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রভাবে ভীষণভাবে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন।

ড. আর. এ. নিকলসন ইসলামের সুফি দর্শন ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তিনি ইলমে তাসাওউফ তত্ত্বের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ গবেষণার পাশাপাশি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তিনি ইকবালের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ধর্মতত্ত্বের প্রজ্ঞা, দর্শনের পাণ্ডিত্য ও কাব্য প্রতিভা দেখে তাঁর একান্ত অনুরাগী বনে যান। এ সময় ইকবালের সাথে তাঁর ইসলামের তাসাওউফতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণার সম্পর্ক তৈরি হয়। উভয়ের মাঝে নিয়মিত যোগাযোগ ও একান্ত আলোচনার দ্বারা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ড. নিকলসন এমন জ্ঞানী গুণী ও নিষ্ঠাবান বন্ধু পেয়ে অত্যন্ত আবেগ প্রবণভাবে তাঁকে কাছে টেনে নেন। ইতোমধ্যে তিনি পারস্যের বিখ্যাত সুফি সাধক আল্লামা ফরীদুদ্দীন আত্তারের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'মানতিকুত তোয়ারের' অর্থাৎ 'পাখিদের সম্মেলন' নামক গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে গবেষণা কর্ম শেষ করেছেন। ইকবাল তা জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ও খুশী মনে তাঁর ভূইসী প্রশংসা করেন। তখন উভয়ের মধ্যে এই গ্রন্থের তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক রহস্য নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। এ সময় ইকবাল তাঁর লেখা অনুরূপ গ্রন্থ 'আসরারে খুদী' সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পেরে নিকলসন অত্যন্ত মুগ্ধ ও পুলকিত হন।

একদিন ইউরোপে জনপ্রিয় মুসলিম সুফি কবিদের কাব্য ও দর্শনতত্ত্ব নিয়ে নিকলসনের সাথে ইকবালের তাত্ত্বিক ও রহস্যপূর্ণ আলোচনা চলছিল। নিকলসন মহাকবি হাফিজের সুফি কাব্য ও দর্শনের ভক্ত ছিলেন। হাফিজের

www.pathagar.com

দিওয়ান ও সুফি রহস্য সম্পর্কে ইকবালের সীমাহীন আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে ইউরোপে হাফিজের জনপ্রিয়তার বিষয়টি নিয়ে ইকবাল বেশ কৌতূহলী ছিলেন। নিকলসন হাফিজ দিওয়ানের জ্ঞানডুবুরী ও কাব্য রহস্যের নানা দিক নিয়ে গবেষণা করে আসছিলেন। তিনি ফার্সি সাহিত্যের আলোচিত দর্শন, সুফিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক রহস্য নিয়ে গবেষণা কর্ম ও অনুবাদের ক্ষেত্রে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন। ইকবাল তাঁর সংস্পর্শে এসে দর্শনতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, প্রজ্ঞাতত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা, পারসিক সুফিতত্ত্ব ও ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারেন। এবং নিকলসনও ইকবালের কাছ থেকে কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান, হাদিসের বিভিন্ন দিক ও বিশ্বনবীর অনুসরণীয় আদর্শ সম্পর্কে ইসলামের শাশ্বত ও সার্বজনীনতার বিষয়ে জানতে পারেন। এক সময় নিকলসন ইকবালের ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতূহল দেখে হাফিজের দিওয়ান ও তাঁর কাব্যের জাদুকরী আকর্ষণের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বর্ণনা করছিলেন ইউরোপে হাফিজের জনপ্রিয়তার কথা।

হাফিজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও দর্শনকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে একমাত্র ওমর খৈয়াম ভিন্ন আর কোন কবির পক্ষেই এমন কৃতিত্বের দাবিদার হতে দেখা যায়নি। আর সেই সুবাদে ইয়োরোপে হাফিজের প্রথম অনুবাদ লেটিনে ১৬৮০ সালে মেনিনস্কি। ইংরেজিতে স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৯২ সালে, জার্মান ভাষায় ওয়াহল ১৭৯১ সালে, বিভিস্কি ফরাসি ভাষায় ১৭৯৯ সালে। ইংরেজি ভাষায় অসংখ্য অনুবাদকদের মধ্যে থেকে বাছাই করে ব্রাউন তিনজনকে নিয়েছেন, হারম্যান বিকনেল, ১৮৭৫ সাল; মিস গারট্রুড লেথিয়ান বেল, ১৮৯৭ এবং ওয়াল্টার লিপ ১৮৯৮ সাল। তবে বিখ্যাত তিনজন তুর্কি গবেষক 'হাফিজ মাস্টার' সুরফি, শেমি এরা সুদি তাঁদের বিশ্ব চমকিত হাফিজ সমালোচনা প্রকাশিত হলে ডাবলিও এইচ লোয়ি ১৮৭৭ সালে ক্যাম্ব্রিজ থেকে তার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৯১ সালে কর্নেল এইচ ডাবলিও ক্লার্ক গদ্যে হাফিজের দিওয়ান প্রকাশিত করলে তা খুব আদরনীয় হয়। এঁদের সকলের আলোচনার লক্ষ্য ছিল দুনিয়া মাতানো হাফিজের একটি বয়াত হল :

আগর আঁ তুর্কই শিরাজী বদস্ত আরজ দিলে মারা
বখালে হিন্দওয়াশ বখশম সমরকন্দ ওয়া বুখারারা

অর্থাৎ

সিরাজের চিত্তকাড়া তুর্কি মেয়ে ফেরৎ যদি দেয় দিল বেচারা।
তবে তার গালের লাল তিলের লাগি দিই সমরখন্দ আর বোখারা ॥

www.pathagar.com

এ বয়াতটি যেন ইয়োরোপকে ও ইয়োরোপের চিত্তকে ঝলসে দিয়েছে। ইয়োরোপের হৃদয়কে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে যা আগে কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি একমাত্র খৈয়াম ছাড়া। নিজের ভেতরে এ নব প্রেম সঞ্চার করে ইয়োরোপ যেন জীবন্ত ও প্রাণান্তরূপে হাঁটতে শিখেছে।
এ বয়াতটি শতাব্দীর পর শতাব্দী লোকের মুখে মুখে শোনা গেছে। হাফিজ যেন তাদের প্রতিদিনের আনন্দ-আহ্লাদের সঙ্গী হয়ে আছে। প্রাসঙ্গিকভাবে ইংরেজি অনুবাদের রসও কত গভীর তা তাঁর আরেকটি কাব্যে জীবন্ত রূপে ফুটে উঠেছে:

মিস বেলের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ থেকে সংকলিত—

(i) The rose has flushed red, the bud has burst,
And drank with joy in the nightingle.
Hail, Sufi's, lover wine, all hail!
For wine is Proclaimed to a world athirst.

(ii) Like a rock your repentance seemed to you,
Behold the mavel! of what a vast
Was your rock, for a gobbet has chift it in two.

(iii) Bring wine for the king and the slave at the gate!
Alike for all is the banquet spread,
And drink and sober are warmed and fed.

(iv) When the feast is done and the night grows loth.
And the second door of the taugh gapes wide.
The low and the mighty must bow the head
'Neath the archway of Life, to meet what... out side?

(v) Except thy road through affection pass
None may reach the halting station of mirth;
God's treaty; Am I not Lord of the earth?
Man sealed with a sigh : Ah yes, alas!

www.pathagar.com

(vi) Nor with is nor is NOT let thy mind contend
Rest assured all perfection of mortal birth
In the great is NOT at the last shall end.

(vii) For assaf's pomp, and the steeds of the ' ind,
And the speach of birds down the wi? nave fled.
And he that was Lord of them all is ad;
Of his mastery nothing remains be .d.

(viii) Shoot not thy feathered arrow ast .y!
A bow—shot's length through th air it has sped,
And then.., dropped down in th dusty way.

(ix) But to thee, oh Hafiz, to thee oh tongue
That speak through the mou h of the slender reed,
What thanks to thee when thy verses speed
From lip to lip and the song thou hast sung?

ফার্সিতে মূল দিওয়ান :

মূল-শেগুফতা সুদ গুলে হামরা ওয়া গাসত এ বুলবুল মাস্ত
শলায়ী সর খোশী আয়ে আশেকানে বাদাহ্ পরাস্ত
আসাস তোবাহ্ কেহ্ দর মহ্কমী চুর রঙ্গ নবুদ
বীন কেহ্ জাম যে জাজী চগুনাহ্ আশ বশিকস্ত
বয়ার বাদাহ্ কেহ্ দরবারগাহ ইস্তাগানা
চেহ্ পাসবান চেহ্ সুলতান চেহ্ হুশিয়ার ওয়া চেহ্ মাস্ত
আয ইন রবাত দো দর চুন জরুর তস্ত রহীল
রোয়াক তাকে মায়ীশত কেহ সর বুলন্দ ওয়া চেহ্ মাস্ত
মোকামে ইশক মীসর নহী শুদ ওয়া বী বনবাহ্
বাণীআ বহুকুম বালা বস্তাহ আন্দ রুখ আলস্ত
বেহ্ হাস্ত ওয়া আয়ীস্ত মরাজান জমির ওয়া খোশময় বাশ
কেহ্ নীস্ততস্ত সর আনজাম হর কামাল কেহ্ হাস্ত
শিকুহে আসেফী ওয়া আসপে বাদ ওয়া মনতেকে তায়ের
ববাদ রাফত ওয়া আস আন খাজা হীচ তরফ নাহ্ বস্তে
ববালো পর মরো আয রাহ্ কেহ তীরে পরতাবী

www.pathagar.com

হাওয়া গেরেফত যমানী ওয়ালী বখাক নিশসত
জবানে ফালক তু হাফিজ চেহ্ শকর আন গুয়ীদ
কেহ্ তোহফা শখনশ ময় বরন্দ দাস্ত বদস্ত

এ দিওয়ানের সরজ তরজমা হল:
কুঁড়ি থেকে লাল গোলাপ বিস্ফারিত, তুরামন্দে বুলবুল গাইছে আর।
পানে মত্ত আশেকান সুস্বাগতম, বল শরাবই হল প্রেরিত তৃষ্ণা দুনিয়ার ॥
শোন বন্ধু, পাথর হৃদয় ভিত্তি তোমার মার্বেল বুক যদি আরও।
চৌচির তবু এক চুমুকে হবে, কাচের উপমা দিই কষ্টি সুরা, নিতে পারো ॥
বাদশা গোলাম এক তাকিয়ায় দান রাখে যে শরাব অভাব হারা।
পানে প্রশান্ত নিরাময় চিত্ত তেজে ও ওমে গৃহ খুশির ফোয়ারা ॥
পানের শেষে গভীর ঘুমে রাত কাবার যাবার যারা তাদের রেখে যায়।
দৌলতবান মিনারে মিসকিন মাটিতে শয়ান সমান শয্যায় ॥
কেবল তোমার জন্য যন্ত্রণা, যে কেউ পৌঁছতে পারে না সে উল্লাসে ॥
আলাস্তুতে বন্দি সবাই সে কি প্রেম, কি অভিজ্ঞান, প্রথম সৃষ্টি হাসে ॥
কী হবে না হবে চিত্ত বিকোবে না মগজে থাক স্থির তাক সম্মুখে।
দুর্লভ এ জন্ম ও জীবনের বিশাল প্রার্থনা ফেল, বিনাশ দাও রুখে ॥
সাহসের ফস্কোর আস্ফালন হাউই ঘোড়া পাখির বচন ওড়া হাওয়া চঞ্চল।
বাহন সব গেছে মরে টিকিয়ে রাখে নি কিছুই কি শিরের অঞ্চল ॥
পাখার তীর মেরো তাই বিপথে তূন না যেন উল্লাফে কেঁপে।
ধুলিতে তবে খাবি খায় আর শেষ নিশানা না টলে মেপে ॥
হাপিজ, কলম ওষ্ঠের চুম্বনে পেলো জবান গেঁথে রবে।
সাধুবাদ সেই দিওয়ানে ওষ্ঠে ওষ্ঠে ধ্বনিত সবখানে অমৃত হবে ॥

প্রত্যেক ভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রেও হাফিজের হৃদয়ানুভূতি কত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। এর ভাব ও অন্তর অনুভূতি এত গভীর ও মর্মস্পর্শী যে যে-কেউ হাফিজের প্রেম বাগানের মালি হওয়ার জন্য নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে। বিকনেলের ইংরেজি অনুবাদ সংকলন গ্রন্থ থেকে সংকলিত—
শেষের বয়াত—

What words of gratitude, o Hafiz.
Shall thy reed's tongue express anon
As its choice gems of composition
From hands to other hands pass on?

www.pathagar.com

লিপেরের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ থেকে সংকলিত—

শেষের বয়াত—

What thanks and praises, O HAFIZ,
Shall yield the tongue of the pen
That all this songs of thy singing
From mouth men sing?

হাফিজের প্রভাব লক্ষ করা যায় বিশ্বের সব খ্যাতনামা ও প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, দার্শনিক ও ভাবুকশ্রেণির মাঝে। হাফিজের জায়গা ছিল অন্তরের অন্তস্থলে। বলতে গেলে যেখানে কারও ভাব মূর্ত কিংবা বিমূর্ত হয়েছে সেখানে হাফিজ অনায়াসেই প্রবেশ করেছে তাঁর দিওয়ানের বদৌলতে। হাফিজ তাই ইয়োরোপের মান-মন্দিরে এক নূতন আলোক বর্তিকাসহ হাজির হয়েছেন। এ যেন কালোত্তীর্ণ সভ্যতাকে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত প্রেম ঢেলে নূতন সাঁচে ঢেলে সাজাবার তাগিদ। প্রখ্যাত মনীষী ব্রাউন মনে করেন মিস গারট্রড নোথিয়ান বেল ইংরেজি ভাষায় সুস্নাত হাফিজ অনুবাদ করেছেন। তবে গ্যাটের বক্তব্যের প্রসাদে পাশ্চাত্য জগতে হাফিজ প্রায় সকলের হৃদয়-নায়ক হয়ে রয়েছিলেন প্রায় দু'শ বছর আগে থেকে। জার্মান-ফরাসি, ইংরেজি, লেটিন, স্পেনিশ, রুশ ভাষায় অজস্র হাফিজ হাতে হাতে হৃদয়ে হৃদয়ে ইয়োরোপের সর্ব সাধারণের গোচরিভূত হয়ে প্রাচ্য মরমী বোধে সনাক্ত হয়েছেন।

ভারতবর্ষও এক সময় ফার্সি ভাষার প্রচলন ছিল। অন্তত সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্সি। হালে সেখানে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বন্ধ হয়ে যায় নানা কারণে। কিন্তু ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের হৃদয়ের দরদ আজও চোখে পড়ে।

হাফিজ যে ভাষাতেই অনূদিত হোক না কেন তার আসল রূপ সকলের হৃদয়ের আয়নায় ছিল। তাই হাফিজের কবিতা প্রায় দেড়শ বছর পর্যন্ত অনূদিত হয়ে নানা ভাষা ও সাহিত্যের ভেতর জায়গা করে নেয়।

মহাকবি আল্লামা হাফিজের অন্য যেগুলো ভাবানুবাদ রয়েছে তাদের ভেতর একটি যেমন—

প্রেমিক পতঙ্গ প্রেম, প্রেম বটে সেই
প্রাণ ছাড়ে প্রিয় হেতু মুখে বাক্য নেই।
অলির প্রণয় নাহি প্রেম বলে গণি
শুধু তার সার মাত্র গুণগুণ ধ্বনি।

www.pathagar.com

হাফিজের দিওয়ানের প্রতি স্তবকে রয়েছে মানব জীবনের চাওয়া-পাওয়া, হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনার উপসমের মহৌষধ। মরমী ও আধ্যাত্মিক প্রেসক্রিপসন দিয়ে হাফিজ সকল ভাবুক ও প্রেমিকশ্রেণির হৃদয় জয় করেছেন। হাফিজের কবিতার ভাষা সহজ কিন্তু এ ভাষা ও ভাব অন্য ভাষায় সঞ্চারিত করা দুরূহ। তবু তাঁর হৃদয় নিংড়ানো জাদুকরী আকর্ষণ সকলকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করে। হাফিজের রুবাই কত সহজ ও সুবিন্যস্তভাবে জাদুকরী ছন্দের মূর্চ্ছনায় হৃদয় কেড়ে নিতে পারে তার আরও উপমা দেওয়া যেতে পারে।

হাফিজ যখন বাগদাদের প্রেম বাগানের কিংবদন্তি তাঁর কবিতা পড়ে বাগদাদের অধিপতি ডেকে পাঠালেন, কবি স্বয়ং এসে যেন কবিতা বুঝিয়ে দিয়ে যান। হাফিজ উলটো বলে পাঠালেন, আমি এখন তৈমুর লঙ্গের মতো, কারও কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এখানে দুর্গম অর্থ খোঁড়া বলে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথবা তৈমুরের মতো শক্তিশালী একজন সুলতান বাগদাদ অধিপতির নিকট যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যদি হারুণ অর রশিদ হতেন তবে না হয় উড়ন্ত ঘোড়া চেপে যেতে পারতেন, অথবা উড়ন্ত গালিচা, আর হাফিজের কবিতা পাঠ কালে উড়ন্ত গালিচায় চেপে বাগদাদ অধিপতি যদি কবির কাছে আসেন তবে তার পান করার অভ্যাস ও তাকত কতটা বুঝবেন। তাছাড়া তিনি এ মসল্লার বনের ঝিরঝির হাওয়া ছেড়ে যেতে পারছেন না। হাফিজ তাঁর দিওয়ানে বলেন—

নহী দাহন্দ ইজামত মারা বেহ সীর ওয়া সফর
নসীমে বাদে মসল্লায়ে ওয়া আবে রুখনাবাদ

অর্থাৎ

ওহে বন্ধুগণ! মসল্লার বনের ঝিরঝির বসন্তের হাওয়া আর
রুখনাবাদের রূপালি স্রোতধারা আর গোলাপের গুলজার ছেড়ে
বাগদাদ কেন বেহেশতেও যেতে আমি পারি না।

এ সংবাদ শুনে বাগদাদ অধিপতি কুপিত হয়ে আদেশ দিলেন, এই দণ্ডে হাফিজ বেটাকে বেঁধে চ্যাংদোলা করে এখানে নিয়ে এসো। শাহী আদেশ পেয়ে কোতোয়াল দলবল নিয়ে কবির রুখনাবাদ তীরে মসল্লার বাগানে উপস্থিত। কবিকে তারা ধরতে গেলে কবি তাঁর শব্দের এক একটা বাণ ছুঁড়ে সবাইকে ধরা শায়ী করল। মতান্তরে কবিও তাঁর দল নিয়ে গজলের হলকা সুর ছাড়লেন, সৈন্য-সামন্তগণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা শুনে শুনে শরাব পান করে ঢলে পড়ল। কবি এ সুযোগে পালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত বাগদাদ অধিপতি শেখ সুলতান

www.pathagar.com

আহমদ ইবনে উবাইস জালাইর হাফিজের কাছে পরাস্ত হলেন এভাবে। কবি হাফিজ তাঁর ধরা ছোঁয়ার বাইরে রইলেন, তাই খেদ করে হাফিজের উদ্দেশ্যে বললেন

হাফিজ *'তারজুমানুল আসরার'* অর্থাৎ রহস্যের ভাষ্যকার, মনের জাদুকর ও ছন্দের মর্মস্পর্শী ভাণ্ডারস্বরূপ। তা না হলে এত সৈন্য সামন্তকে হাফিজ কী করে তাঁর দিওয়ানের জাদুকরী আকর্ষণে মাতোয়ারা করে দেয়। সুলতানের এ ভাষ্যের আগে হাফিজকে লোকে *'লিসানুল গায়েব'* বা অদৃশ্যের প্রকাশক বলে খ্যাত করেছিলেন।

শেগুফতা শুদ গুলে হামরা ওয়া গাস্তে বুলবুল মাস্ত

হাফিজের এ গজল সম্পূর্ণ অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন ভাষার গবেষকগণ শব্দের টীকা টিপ্পনী অনুবাদের শেষে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। সকল অনুবাদের ক্ষেত্রে কমবেশি তা লক্ষ করা গেছে। কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে সিডনি চার্চিল বলেন,

That some of his verses are meainingless of that, if they
have any meaning, it is very far-fetched and enigimatical.

অর্থাৎ যারা বুঝতে পারে না হাফিজের কবিতা, তাঁর কবিতা তাদের কাছে অর্থহীন অথবা দুর্নিরীক্ষ হেঁয়ালি, কিন্তু তা টীকা টিপ্পনী পেলে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এ কবিতার ব্যাপ্তি বিশ্ব ভূবন থেকে বেহেশত, জন্ম থেকে মৃত্যু, পর্বত শিখর থেকে সমুদ্র অতলে প্রবেশ করেছে। মর্মার্থ সন্ধানকারীই কেবল এর গূঢ় রহস্য উদ্ধার করতে পারে। মিস বেল হাফিজকে কবি দান্তের মতো অথবা তাঁর চেয়ে জীবন্ত ভেবেছেন :

The picture that Hafiz draws represents a wider lauds cape though the immediate foreground may not so distinch. It is as if his mental eye, endowed with wonderfut acuteness of Vision, had penetreted into those provinces of thought which we of a later age were distined to inhabit.

অর্থাৎ হাফিজ কবিতায় যে ছবি তুলেছেন তা বৃহৎ পটভূমি জুড়ে যদি তাৎক্ষণিক দৃশ্য খুব স্পষ্ট বোঝা যায়নি, তা যেন অনেকটা তার মানসচক্ষু

www.pathagar.com

জড়িত করে আশ্চর্যজনক সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাতে নিবদ্ধ হয়েছে, যাতে চিন্তা রাজ্য ভেদ করে গেছে পরবর্তী কালে আমরা খুব স্পষ্টভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

তাই হাফিজের উপভোগের মাত্রা যেমন জুড়েছে মরমী-আধ্যাত্মিকতায়। ইতিহাস মনস্কতায় তেমনি শুদ্ধ রস উপলব্ধি এবং শিল্প সম্ভারে শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকা রেখেছে। যদিও মিস বেল বলছেন, *He was the king of his time,* কিন্তু আমাদের ধারণা আধুনিক কালেও হাফিজের কবিতা আধুনিকতাকেও শাসন করছে। বহুক্ষেত্রে আধুনিকতা গেঁড় দিতে গিয়ে হার মেনে বসে আছে। একটু আগে যে কবিতাটির উল্লেখ করা হল তা বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে। পাশ্চাত্য জগত 'আশেকান' শব্দ নিয়ে বিব্রত, এর অর্থ কী? সুরা প্রেমী মাতাল? নাকি, সুফি সাধক? নাকি, শুধুই প্রেমিক? যার যা মন চায় অনুবাদক তা ব্যবহার করেছেন। হাফিজ বলেছেন, গোলাপ ফেটে লালে বিস্ফারিত তাই সুরা পান করতে আসো 'আশেকান'। এ 'আশেকান' হলেন প্রেমিক। প্রেমাস্পদকে কাছে পাওয়ার জন্য যার মন সর্বদা ব্যাকুল থাকে। নিজেকে সমর্পণের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোই বা প্রেমাস্পদকে হাসিল করাই *'আশেকানের'* পরিচয়।

মাওলান রুমি আশেকান সম্পর্কে বলেন,

সবসেহো আযাদ উনকেহো গোলাম
গারমেলে দ্বীনকা মজা তুঝকো তামাম ॥

অর্থ : তুমি যদি দ্বীনের স্বাদ গ্রহণ করতে চাও তা হলে কোনও কামেল অলীর গোলাম হইয়া যাও।

যদি কেহ আপন সত্তা তথা দেহ, চেহারা, অভিব্যক্তি বা মনোদৈহিক বৃত্তিসমূহ আল্লাহতালার জন্য উৎসর্গ করে অর্থাৎ তাঁর নৈকট্যলাভের জন্য সমর্পণ করে তা হলে সে কামালিয়াত প্রাপ্ত আশেকানদের দলভুক্ত হয়ে যায়; সে-ই আল্লাহর গুণে গুণান্বিত, আল্লাহর রঙে রঞ্জিত এবং আল্লাহর চেহারা বা অভিব্যক্তি দ্বারা মণ্ডিত হয়ে যায়। কারণ মুরশিদ বা ধর্মগুরুর মাধ্যমে তাঁর মধ্যে নূরে মোহাম্মদি সত্তা বা রূহ্ জেগে ওঠে। এতে তাঁর অন্তরে সর্বময় আল্লাহিয়াত বিরাজ করে। সে নূরে মোহাম্মদির তাজাল্লি দ্বারা আলোকিত হয়ে ঐশী জীবনের এক নতুন অধ্যায় সূচনা করে। ফলতঃ সে এহসান বা সৌন্দর্য অনুশীলন তথা সালাতসাধনার সুফল লাভ করে। ফলশ্রুতিস্বরূপ সে মরণকে জয় করে এবং যাবতীয় ভয়ভীতি অতিক্রম করে চলতে সক্ষম হয়ে যায়। দুঃখ অথবা আক্ষেপ, অনুশোচনা তাকে এতটুকু প্রভাবিত করতে পারে না। সে দুনিয়ার উর্ধ্বে আদদ্বীন বা বিশেষ বিধানের অনুগামী হয়।

www.pathagar.com

সেহেতু দুনিয়ার অলীক আপাত সুখকর প্রলোভন হতে সে চিরতরে বিরত হয়ে যায়।

মহাকবি হাফিজের কাছে মুসল্লির রূপক প্রতীক হল সুরা পান। অর্থাৎ প্রেমের গভীর স্রোতে ডুব দিয়ে আল্লাহ্‌র জ্যোতির আলোতে জ্যোতির্ময় হয়ে তাঁরই বন্দনাগীতে হারিয়ে যাওয়া। সার্বক্ষণিক স্মরণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখার এ এক উত্তম পদ্ধতি। এ সুরা পান কুরআনীয় অনুভূতি, সেখান থেকে প্রেরণা পেয়ে হাফিজ উচ্চারণ করলেন 'আলাস্ত'-আমার দিকে দেখ। আমি কি স্রষ্টা নই? তাই কবি প্রথম সৃষ্টির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কথা বললেন, আর সে কথাটা কী? প্রথম মানবের কথা কিংবা মানুষের মনে প্রথম প্রেম সৃষ্টির কথা। আমি হাওয়া বেহেশতে কিন্তু বেহেশত থেকে নিষিদ্ধ হলে স্রষ্টা আদমকে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁকে এবং সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যৎ দেখিয়ে বললেন, 'আলাস্তু বিরাব্বিকুম' 'আমি কি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা নই? তোমরা যে দিকে তাকাও না কেন আমাকে দেখতে কি পাও না?'

তারা সবাই বলল, কালু 'বালা'-হ্যাঁ।

সুফিমত এখানে সুস্পষ্ট। স্রষ্টা সর্বত্র, তিনি কেবল আরশ কুরসির ওপর বসে নেই। কিন্তু 'বালা' একই বানানে উচ্চারিত হয় 'বালে' যার যাই পাপ অমঙ্গল, শয়তানের কাজ। আদম কি তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীতে অমঙ্গল বয়ে আনলেন? ভবিষ্যৎ মানব জাতি তাহলে তাদের সৃষ্টিকে অমঙ্গল মনে করছে কেন? অর্থাৎ স্রষ্টার এ কর্মকে বা তাদের পাওয়া এ জীবনকে কেবল কি অমঙ্গলের সূত্রপাত মনে করছে? মানব জন্ম কী উপায়ে হল? তাই কি তারা স্রষ্টার প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলেছে? এই অস্বীকার করার দম্ভ তাদের কে শেখাল? স্রষ্টার আদেশ অমান্য করার মতলব তাদের মনে যেন উদিত হল। বেহেশতে আদম হাওয়া নিরাবরণ নির্দোষ ছিলেন, তাঁদের জ্ঞান-দৃষ্টি ছিল না, চব্বিশ ঘণ্টা স্রষ্টার আরাধনা বা ইবাদত করে কাটাতেন। তাঁরা ভাব ও অভাব শূন্য ছিলেন। বলা হয়ে থাকে তাঁরা প্ররোচিত হয়ে নিষিদ্ধ খাদ্য বা পানীয় আস্বাদনের কারণে পাপে লিপ্ত হন। কিন্তু সে পাপটা কী? হাফিজের মতে সে নিষিদ্ধ আস্বাদন হল শরাব পান। শরাব পানের ফলে তাঁদের চেতনা খোলে। দেহজ ও মিল অনুভূতির আসক্তি জাগে। দৈহিক মিলিত হয়ে পাপে লিপ্ত হন। কিন্তু যে পাপটা কীভাবে ফল ভক্ষণ হেতু জ্ঞানে দৃষ্টি লক্ষ্য করলেন, দেখলেন তাদের নিরাভরণ দেহে লিঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে শরাব পানের ফলে। বেহেশত হলেও শরাব পানের জন্য তাঁরা প্রচুর যৌনতা সম্পন্ন হয়ে যান। তাই তাঁরা একে অন্যের পরিপূর্ণ যৌবনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন এবং সে পাপটা তাঁরা করলেন। বেহেশতে শরাব পান করার পর আদমের সামনে ছিলেন হাওয়া। হাওয়ার অন্য অর্থ নারী লিঙ্গ। তাই সে উপভোগ থেকে বিশাল

www.pathagar.com

যৌনতার নিবৃত্তি হল। তার থেকে সৃষ্টির সূত্রপাত হল। কিন্তু মোমেনগণ যখন এই 'শরাবান তহুরা' পান করবেন তাঁদের এ দশা উপস্থিত হওয়ার আগে তাঁদের সামনে পরিবেশন করা হবে পনেরো-ষোল বছরের সত্তরটি কটা চোখের সুন্দরী হুরি। তাই বেহেশত হবে উপভোগ্য।
শরাব মানব জাতির জন্য তাহলে পাপ কি পুণ্য বা মঙ্গল কি অমঙ্গল? হাফিজ বললেন, এ শরাবের দরুণ গোলাপ কুঁড়ি ফেটে লালে লাল হয়ে গেল। বুলবুলের কণ্ঠে সুমিষ্ট সুর এল। ধনী নির্ধন নির্বিচারে এক চুমুকে তৃপ্ত এবং মিষ্টি আস্বাদন, রাজপ্রাসাদ থেকে জীর্ণ কুটির অবধি সর্বত্র প্রশান্ত চিত্তের সমাধি সুপ্তী প্রদাহ করে থাকে। তাই সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে সেই যে শুরু আজ অবধি এই শরাবের সদগুণ ও মহিমা ঘরে ঘরে সহতাড়িত। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।
এবার 'আসফ' প্রসঙ্গ, তা হল মানুষের প্রেরণা শক্তি, বুদ্ধি ও কৌশলের জয়গান গাইলেন কবি হাফিজ। আসফ ছিলেন বাদশা সুলাইমানের বিশিষ্ট মন্ত্রী অথবা তাঁর হাওয়াই ঘোড়া। বাদশা সুলাইমানের কীর্তি কৌশল বাইবেল এবং কোরআনে বিস্তৃতভাবে রয়েছে। সুলাইমানকে এ আসফ বা শক্তি ও প্রেরণা যোগানো হয়েছিল, তাই তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যেমন হাওয়াই ঘোড়া বা পক্ষীরাজে চড়ে সর্বত্র বিচরণ করতেন সুলাইমান। যেটাকে মুসলমানগণ তখতে সুলাইমান বলে জানেন। লক্ষ করা গেছে এই হাওয়াই ঘোড়া 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লায়' উল্লিখিত উড়ন্ত গালিচা সদৃশ বা একই ধারণাশ্রিত। সুলাইমানি তাবিজে বা বোতলে ভরে দুষ্ট জিনকে শায়েস্তা করা হয়েছিল। তাছাড়া বাদশা সুলাইমান পাখির ভাষাও রপ্ত করেছিলেন, যা থেকে 'মানতিক আত্ তায়ির' তা পাখির বচন বা বিহঙ্গ দর্শন নামে নতুন দর্শনের পত্তন হল। প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক বা মরমী সুফি ভাবাত্মক রচনায় শুকপাখি বা মন্ত্রদাতা একজনকে উপস্থাপন করা হয়। সে দর্শনও এই ধারণা পুষ্প পুঞ্জিত। এই দর্শন বা ধারণা কবি হাফিজ প্রথম 'মানতিক আত্ তায়ির' নামে ব্যবহার করেন, এ কবিতায় তার প্রথম উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে পারস্যের বিখ্যাত সুফি সাধক আল্লামা ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রা.) তাঁর বিখ্যাত 'মানতিক আত্ তোয়ায়ের' এ নাম থেকে আহরণ করে তাসাওউতন্ত্রের আলোচিত গ্রন্থ রচনা করেন। যা বিশ্বপ্রসিদ্ধ এক ইলমে তাসাওউফের কিতাবরূপে বিশ্ব মুসলিম জাতির নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।
মহাকবি হাফিজের সময়কালটা খুব গোলযোগ পূর্ণ ছিল, গোটা ইরান বা পারস্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে ব্যাঘ্র আক্রান্ত গরুর পালের মতো হয়ে গিয়েছিল। যিনি যেখানে পারেন কর্তৃত্ব করার খায়েশে খামচে কিছু ভূমিখণ্ড দখল করে নিজেকে সুলতান বা অধিপতি বলে ঘোষণা দিয়ে সিংহাসন

www.pathagar.com

অধিকার করেছিলেন, হয়তো ঠিক সে সময় অন্য একজন তাঁকে তাড়িয়ে অনুরূপ সুলতান হয়ে বসেন কিছুদিনের জন্য। কয়েকজন শক্তিশালী অধিপতি অবশ্য বেশ কিছু দখলদায়িত্ব বজায় রেখেছিলেন; তার ভেতর শাহ সুজা, আবু ইসহাক অন্যতম। এ দুজন আবার হাফিজের ঘনিষ্ঠতাও পেয়েছিলেন কিছু পরিমাণে হাফিজ তাঁদের জন্য কাসিদাও রচনা করেছেন, তাঁরাও হাফিজের কাব্যের যথেষ্ট সমাদর করেছেন; তাদের ভেতর আবু ইসহাক ঘনিষ্ঠতর ছিলেন। আবু ইসহাক নিজেও কবি ছিলেন, তবে একটি মহা ব্যাঘ্রের আক্রমণ তখনই অপ্রত্যাশিত ও অবধারিত ছিল, সেই মহাব্যাঘ্র হলেন তৈমুর লঙ্গ। এ মঙ্গলবীর সমগ্র এশিয়া তছনছ করার প্রাক্কালে ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে পারস্য আক্রমণ করেন এবং সমস্ত দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। সে সময়ে সমগ্র ইরানে বিভিন্ন নগরে এক একজন অধিপতি গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের মতো গেঁট হয়েছিলেন। বিশেষত ইরজেরোয়াম, ইরজিনজান, মাশ, আখলাত, ওয়ান, সালমাস, উর্মিয়া প্রভৃতি অঞ্চল তৈমুরের হুঙ্কারেই দখল হয়ে গেল। পারস্যের জয়নাল আবেদিন কৃপাণ হাতে তৈমুরকে বাধা দিতে গিয়ে সহজেই পরাস্ত হন এবং প্রাণ হারান। ইস্পাহান দখল হল ভীষণ রক্তপাতে; একদিনেই সত্তর হাজার ইরান সন্তান তৈমুরের নৃশংস বাহিনীর শিকার হয়ে প্রাণ হারায়। নারীরা সহজে ভোগ দখলে পরিণত হয়। সেদিন ছিল সোমবার। জাফর নামা গ্রন্থে উল্লিখিত যে, ১৩৮৭ সালের ১৮ নভেম্বর এই রক্তপাতের ফলে নদী স্রোতের মতো ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। তৈমুর সে রক্তের নদী অতিক্রম করে পরের মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিরাজ নগরীতে পৌঁছেন বিনা বাধায়। শিরাজের মদ্য ছিল তৎকালে ভূবন বিখ্যাত, তার নাম ছিল শিরাজী, এটা লাল মদ। সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা এমনকি ইয়োরোপেও এ মদ্যের খুশবু স্বাদ এবং নেশা গিয়ে পৌঁছেছে। শিরাজের প্রায় ঘরে ঘরে মদ চোলাই হত, তৈমুর বাহিনী শিরাজে প্রবেশ করে বাতাসে মদের গন্ধ পায় আর তাতে তারা নেশায় নিভোর হয়ে হত্যাযজ্ঞের কথা বেমালুম ভুলে গেল। নৃশংস মনও তাদের মৌজে মৌ মৌ টগবগ করে উঠেছিল। সকলে ঘরে ঘরে খুঁজছে কেবল মদ্য আর শিরাজের তুর্কিবালা, মুখে আওড়াচ্ছে হাফিজের কবিতা—

আগর আঁ তুর্কিই শিরাজী বদস্ত আরজ দিলে মারা
বখালে হিন্দয়শ বকশম সমরকন্দ ওয়া বোখারারা।

তৈমুর লঙ্গ জীবনে কখনও কবিতা ছুঁয়ে দেখেননি। কবি, গায়ক ইত্যাদিকে রাস্তায় ডাস্টবিনের কুকুর মনে করতেন। কিন্তু কবিতা ও গান চিত্ত বিভ্রম করে দিতে পারে, সৈন্য বাহিনীর মনকেও নৃশংস থেকে উদাসীন করে দিতে পারে

www.pathagar.com

কিংবা একেবারেই হিংস্রতা শূন্য করে দিতে পারে দেখে তাজ্জব হলেন। তিনি জানতেন কেতাবে যেহেতু কবিদের সমালোচনা রয়েছে; কিন্তু কেন, কোন্ ঘটনার আলোকে তার শানে নুযুল না জেনে অনেকে কবিদের বেদাত সাব্যস্ত করেন। কিন্তু কেতাবের মাঝে কেন কবিদের এবং কোন্ ঘটনাদৃষ্টে সমালোচনা করা হয়েছে তা না বুঝে মোল্লারা যা বুঝতেন তৈমুর লঙ্গও তাই মনে করতেন; কবি মানে বাউরা বা উদ্‌ভ্রান্ত 'উদ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পথে প্রান্তরে ঘুরে যা নয় তা বলে' এ ধারণা তাঁর দৃঢ়মূল ছিল। কিন্তু একি! তাঁর হাতে গড়া হায়েনা ব্যাঘ্র সৈন্যরা এখন প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করছে 'আগর আঁ তুর্কিই শিরাজী, আর তুর্কি সুন্দরীর গালের তিলের বদলে সমরখন্দ ও বোখারা অর্থাৎ তৈমুরের নিজের শহর, প্রিয় নগর এবং রাজধানী বিলিয়ে দিতে চাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। একি আজব দৃশ্যের সৃষ্টি করল হাফিজের দিওয়ানের দুটি চরণ! ক্ষিপ্ত হয়ে তৈমুর হুকুম দিলেন, পাকড়ে আনো সেই কমবক্ত কবিকে, যে এমন কথা লিখেছে, যে আমার বাহিনীতে এই ষড়যন্ত্রের মন্ত্র দিচ্ছে। তাঁর মণ্ডু চিবিয়ে শিরাজের উৎকৃষ্ট মিনায়েন শরাবের সঙ্গে চাট হিসেবে খেতে হবে।

হাফিজও শুনেছেন বিশ্বত্রাস তৈমুর এখন তার প্রিয় নগরের বুকে রক্ত প্রবাহিত করতে প্রবেশ করেছেন। ভয় একটু লাগলেও, মন তার উন্মনা উদাসীন, মাঝে মাঝে দুমড়ে যাচ্ছে বুকের রক্ত। কিন্তু করার তো কিছুই নেই, তাই উদাসীন চিত্তে রুখনাবাদ নদীর তীরে বসে আছেন, ঢেউ শুনছেন আন মনে, সময় যাচ্ছে আর প্রতি ঢেউ এর ভ্রূতে তৈমুরের কুটিল দৃষ্টি খুঁজছেন। হঠাৎ কয়েকটা ঢেউ সূর্যরশ্মিতে জ্বলে বলে উঠল, একটা শিংওয়ালা বলিবর্দ অনেক কিছু তছনছ করে দিতে পারে। গোলাপও চিবিয়ে খেতে পারে। তবে তার চোখের সামনে লাল বনাত ঝুলিয়ে দিতে পারলে হিংস্রতা ঐ বনাতের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে। হাফিজ এমনি ভাবছেন আর মসল্লার গোলাপ বাগানে বসে গুল আর বুলবুলের প্রেম বিনিময় উপভোগ করলেন। পরক্ষণে এ প্রেম যে তৈমুর আঘাতে হারিয়ে যাবে তা অনুভব করে তাঁর মন চৌচির হয়ে গেল। ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়া নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে কেবলই শিরাজের তুর্কি নারীর রূপ সৌন্দর্যের বাখানি ভাব মনে আসছে। এমন সময় তৈমুরের লোকজন এসে 'ঐ তো হাফিজ' বলে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। ইতোপূর্বেও পারস্যের কোনও সুলতানের লোকলস্কর পাঁজা কোলা করে নিয়ে শাহী দরবারে হাজির করতে এসেছিলেন কবিকে; অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন রাজ দরবারে; সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন হৃদয় নিঙড়ানো দু'চরণ কবিতার লাইন। হাফিজ তখন তাদের তাঁর শব্দজালে এবং সুরার জাদুতে কাবু করে দিয়েছিলেন; কিছুই করতে পারেনি তারা। কিন্তু মঙ্গলরা শিংওয়লা গরু। তারা কবিতার শব্দ কী কিংবা সুরের মধু কি কিছুই জানেন না। কারণ গান ও কবিতা

তাদের জন্য হারাম। বলতে গেলে নেকড়ের মতো শিকারের নেশায় তারা মারমুখো, সুন্দর কিছু দেখার মতো সুযোগ তাদের নেই; কেবল রক্তপাত এবং নগ্ন উল্লাসই তাদের প্রিয় প্রসঙ্গ। তাই একটা হরিণ শিশু কিংবা 'রিংডোব' অর্থাৎ চন্দন ঘুঘু তারা সহজে শিকার করতে পারে। পা ধরে টেনে বা দু'ডানা বেঁধে ঝুলিয়ে নিতে থাকে, তেমনি কবিকে নিয়ে হাজির করল নৃশংস নরপতি তৈমুরের সামনে। তৈমুর তাঁকে দেখে রেগে মস্ত হাঁক ছাড়তে পারতেন কিন্তু বর্তমান দুরবস্থা দেখে ঠোঁট বাকিয়ে একটু শ্লেষ হাসি ছাড়লেন। জীবনে বোধ হয় এটাই ছিল তাঁর প্রথম হাসি মুখ। কিন্তু তাতে তবু তাঁর দাঁত দেখা যায়নি। হাসিটাকে চেপে রেখে কবির পিছমোড়া হাত, তবু উদ্যত শির আর নাজুক শরীর, বার বার মেঘে গ্রাস করা সূর্যের মতো মুখ দেখে তাজ্জব হলেন। বোধহয় প্রথম কারও প্রতি মন নরম করার ইচ্ছা করলেন; হাফিজের মুখের দিকে তাকিয়ে ঝলসে গেলেন। তবু তো তিনি তৈমুর। তাঁকে কোনও কিছুতে কাবু করার জিনিস দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়নি। স্বভাব ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'এই বুঝি হাফিজ! কি তুমি নাকি?'

বালে বন্দেগী মল্লায়েন, অর্থাৎ 'জি হুজুর! আমি আপনার সেই সেবাদাস।' এ কথার অর্থ দুটো, এক হল, 'হুজুরের পদসেবা করতে প্রস্তুত আছি।' দ্বিতীয় অর্থ হল, 'হাত বাঁধা তবু খোঁড়া পায়ের সেবা না দিয়ে হলেও কিছু করার জন্য হাজির।'

তৈমুর এত ফার্সি জানেন না। কেবল প্রথম অর্থ তার থেকে সংগ্রহ করলেন। তবু খুব রেগে বলতে লাগলেন, 'তাহলে কোন আক্কেলে তুমি আমার দুটি আঁখি উপড়ে নিয়ে সামান্য এক তুর্কি সুন্দরী বালিকাকে উপহার দিতে চাও?'

তৈমুরের দুটি আঁখি হল 'সমরখন্দ' আর 'বোখারা' নগরী। মধ্য এশিয়ার এই শ্রেষ্ঠ দুটি নগরী তৈমুর সৃষ্টি করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে এই নগরী দুটি হল এশিয়ার 'রোম' ও 'প্যারিস'। অথবা তাদের চাইতেও উৎকৃষ্ট, মধ্যযুগের দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য ও ঔজ্জ্বল্যদীপ্ত এই সমরখন্দ ও বোখারা। তৈমুর তাঁর বিজিত সমস্ত অঞ্চলের সব ধনরত্ন এই দুই নগরীতে এনে জড়ো করেছিলেন। শুধু ধনরত্ন নয়, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গুণী, মনীষী, দার্শনিক সৌন্দর্য পিপাসু সুদর্শন লোকদেরও এবং তাতের সঙ্গে সুন্দরী নারীদেরও সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। সে জন্য কোনও একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের ভাষায়, সমরখন্দ ও বোখারা কেবল তৈমুরের দু'চোখের মনি নয় সারা বিশ্বের আঁখির তারা ছিল, কারণ সমরখন্দ ও বোখারা দিয়ে তখন বিশ্বকে দেখা যেত। অর্থাৎ সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধন সম্পদ ও জ্ঞানী গুণী সুন্দর মানুষের এখানে সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। এ হেন দুটি নগরীর এ দশা করে দিয়েছেন কবি হাফিজ, তাই তিনি কাচুমুচু হয়ে

www.pathagar.com

বলতে লাগলেন, 'হুজুর এই তো আমার চরম দুর্ভাগ্যের কারণ, এই হতভাগা তাই তো নাস্তানাবুদ, কারণ এই করে করেই বিলিয়ে দিয়ে দিয়ে নাদান কমবক্ত আমি বেশুমার বেহিসেবী হয়েছি, বলতে গেলে একদম ফতুর। বিলাতে বিলাতে এখন আর আমার কাছে দেয়ার কিছু নেই। আপনি হুজুর হলেন দুনিয়ার অধিপতি, আমি আপনার সামনে হাজির অথচ হাত বাঁধা, কিছু বিলাতে পাচ্ছি না।'

এ কথা শুনে তৈমুর তৃপ্ত হলেন, হাফিজের হাত পায়ের বন্ধন খুলে দিতে আদেশ দিলেন। দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির শাণিত শব্দের কাছে নৃশংস তৈমুরও বলতে গেলে পরাজিত হলেন। তৈমুর বললেন, 'বেটার বাঁধন খুলে দাও দেখি। সে এখন কী বিলাতে পারে?'

বন্দেগি হুজুর! হাত খুলে দেবার পর মাথা নত করে বাঁ হাত বুকে রেখে ডান হাত দিয়ে তিনবার কুর্নিশ করলেন, হাফিজ কুর্নিশ বিলালেন সেটা এ দু'নগরীর কৃতিত্বের জন্য। এর বিশ্বজোড়া খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য। হাফিজের অন্তরের সমস্ত প্রেমকে যেন উজাড় করে দিয়েছিলেন মাতৃভূমির শান-মানকে বজায় রাখার জন্য। এমন মহান প্রেমিক তৈমুর কখনও চোখে দেখেননি। তাঁর ভেতরে কি যেন চিন চিন করে নাড়া দিয়ে গেল।

মহাকবি হাফিজ খুব সহজ সরল ভাবের দ্বারা তৈমুরকে বুঝিয়ে দিলেন, তৈমুরের দুটি আঁখি সমরখন্দ আর বোখারা হল দুনয়িার শ্রেষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ নগরী। এর সকল কৃতিত্ব তৈমুর লঙ্গের জন্য, হাফিজের অন্তরের সমস্ত প্রেম তুর্কি বালার জন্য হলেও এর মূল নির্যাস সমরখন্দ ও বোখারার মাটিতে মিশ্রিত আছে। তাই তুর্কি বালার জন্য যেমন এ দু নগরীকে উপহার দিতে চান তেমনি এ দু নগরির জন্যও তুর্কি বালা তার পরম আস্বাদনীয় রূপে জীবন্ত। আর আমির তৈমুর লঙ্গ এ সকল কিছুর প্রসিদ্ধির জন্য নিবেদিত। তাই সকল কুর্নিশ ও সেবা শুধুমাত্র তাঁর জন্য উৎসর্গীত।

তারপর তৈমুর আদেশ দিলেন, কবি দুহাতে যা নিতে পারে এই মুহূর্তে সে রকম রত্নরাজি তুলে দাও; দেখি তার ইচ্ছা, এসব সে কতটা বিলাতে পারে।

হাফিজ হাতে যা পেলেন মুহূর্তে সেসব ছিটিয়ে লোকজনের গায়ের ওপর ফেললেন, সকলে কুড়িয়ে নিল। তবে কিংবদন্তি আছে যে, হাতের বাঁধন খোলার পর হাফিজ ধনরত্ন কোন কিছুকে পরওয়া করেননি। তার বদলে তৈমুরের বাহিনী যারা উন্মুক্ত কৃপাণ আকাশে তুলে রক্ষী ছিল তাদের কৃপানের ধারগুলো কেবল যাঞ্ছা করেছিলেন।

ধার দিয়ে কি হবে?

শিরাজ নগরের একটি প্রাণীও যেন এতে প্রাণ না হারায়।

www.pathagar.com

তৈমুর তাঁর আর্জি মঞ্জুর করেছিলেন এবং কবিকে পাশে ডেকে নিয়ে বসিয়ে কবির হাতে পেয়ালা তুলে দিয়েছিলেন, যা তৈমুর জীবনে কখনও আর কাউকে করেননি।

কিন্তু ব্রাউন বলেন, তিনি ইরানের অনেকের কাছে শুনেছেন, জাফর নামার এই বর্ণনা ছাড়াও প্রচলিত আছে যে, লিসানুল গায়ের কবি হাফিজ শব্দের কারসাজি দিয়ে তৈমুরের ইলজাম খণ্ডন করেছিলেন, গোটা বক্তব্যকে গায়েব করে দিয়েছিলেন, আর সে কৈফিয়াৎ চেয়ে তৈমুর নাকি হাফিজের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছিলেন, শব্দের জাদু ও অপরূপ প্রেমের বন্ধনে তৈমুর লঙ্গ তাঁর অত্যাচারের সমস্ত কিছু ভুলে এমনকি বিশ্বখ্যাত নরপতি হয়েও হাফিজের প্রেমের মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ বায়েতটি ছিল এমন—

বখালে হিন্দওয়াশ বখশম দো মন কন্দ ওয়া সি খোর্মারা

তবে আমার মতে তা ছিল—

বখালে হিন্দয়শ বকশম সমরকন্দ ওয়া বুখারারা।

তৈমুরের মতো বিশ্বত্রাস যার কাব্যের কাছে পরাস্ত হলেন তা হাফিজেরই কারণে। তবে ব্রাউনের হাতে যে কথা উঠেছে... *Nor have I met with any thrustwor Thy evidence in support of it.*

এ কবিতাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক কবিতা হিসেবে গণ্য করলে মিথ্যাচার হয় না, কারণ এটি হাফিজ শ্রেষ্ঠ। এর ভাব ভাষা এবং প্রতিটি শব্দ কল্প, শিল্প চাতুর্য এবং অনুবাদ সবই এমনি ওতোপ্রোত জড়িত যে সবই অসাধারণ। তাতে করে দুনিয়ার শিক্ষিত লোক এই বয়াত কণ্ঠস্থ করে রেখেছে মূল থেকে অন্তত যারা কাব্য পিপাসু। মানব জীবনে গ্রাহ্য সৌন্দর্য সম্ভার হঠাৎ করে কিংবা প্রেমের উন্মেষ হলেই এ দু'লাইন কণ্ঠ ও মন থেকে বের করে দিয়ে যে কেউ আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকে।

লক্ষ করা গেছে অনেক পরহেযগার ব্যক্তি যাঁরা বেহেশতের হুরি প্রত্যাশী, তাঁরা এই কবিতার ভেতর চরম আনন্দ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি পেয়ে থাকেন। তবে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব শাহজাদীদের জন্য নিযুক্ত উসতাদের কণ্ঠে এ কবিতা শুনে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাদের চরিত্র ভ্রষ্টের আশংকায় সারা মোগল সাম্রাজ্যের জন্য হাফিজ পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রকাশ্যে শাহী ফরমানের দরুন কোথাও কিছুদিনের জন্য হাফিজ উচ্চারিত না হলেও সকলের বালিশের নিচে হাফিজ পাওয়া যেত। আওরঙ্গজেবের রঙ্গ খতম হলে হাফিজ

www.pathagar.com

আবার সকলের হাতে হাতে এবং কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরে ঘুরে ধ্বনিত হতে লাগল। এই বিখ্যাত কবিতার সম্পূর্ণ মূল অংশ এই :

আগর আঁ তুর্কই শিরাজী বদস্ত আরজ দিলে মারা
বখালে হিন্দওয়াশ বখশম সমরকন্দ ওয়া বুখারারা
বদাহ সাকী ময় বাকী কেহ দর জান্নাত নাখোয়ী ইয়াফত
কিনারে আব রুখনাবাদ ওয়া গুল গাশতাই মুশল্লারা
ফগান কীন বোনীয়ান শোখ শীরীনে কার শহর আসব
চনান বরফান্দসবর আয দিল কেহ তরকান খান য়্যাকমারা
যে ইশক না তামাম মা জামালে য্যার মস্তবগানীস্ত
বাব রঙ্গ ওয়া খাল ওয়া খতবেহ হাজত রোয়ী যীবারা
মান আমান হুসনে রুখ আফরুখ কেহ ইউসুফ দাশত দানস্তুম
কেহ ইশকে আয পর্দা-এ আসমত বরোদ আরফ জোলিখারা
হদীসে আয মতরব ওয়া ময় দারায দহর কমতর জো
কেহ কখনাকোশুফ নকশায়ীদ বাহিকমত ইন মুয়াম্মারা
নসীহত গোশ কুব জনান কেহ আয জানদোস্ত তু দারান্দ
জোওয়ানান সায়াদাতমন্দ পন্দই পীরএ দানারা
বদম গোফতী ওয়া খোরশমন্দ আফাকাল্লাহ নাকু গোফতী
জবাবই তলখ ময় যীবদলব লাল শক্কর খারা
গজল গোফতী ওয়া দর সফতী বয়াওয়া খোশ বখোয়ান হাফিজ
কেহ বর নযম তু আফশান্দ ফালক আকদই সুরাইয়া রা

সরল তরজমা:

সিরাজের চিত্তকাড়া তুর্কি মেয়ে ফেরৎ যদি দেয় দিল বেচারা।
তবে তার গালের লাল তিলের লাগি দিই সমরখন্দ আর বোখারা ॥
ঢালো সাকি বাকি সুরা পাওয়া তো যাবে না এমনি কেন না।
রুখনাবাদ তীর মুসল্লা বায় অন্য কোনও বেহেশতেও বা ॥
দুঃখ এই যে নগর উন্মাদ দামাল সুন্দরী আমার প্রিয়তমা।
হৃদয় নিয়ে খেলে ছিনিমিনি তুর্কি ভোজের যেন বরাত জমা ॥
সামান্য প্রেমেও যদি বাঁধতে না পারি তার এমনই লাবণি জাল।
তিল কি ফুল রং বাহার ছেঁকে গুণি বা কেন এ ফেরৎ হাল? ॥
জানি ইউসুফের এমনি রূপ বেড়ে হবে যে দূরন্ত সঙ্গিন।
সতীত্ব ছিঁড়ে জোলেখাকে বের করে নেবেই যে কোনও একদিন ॥
গজলে মেতে তাই ঢালো এতে শরাব নতুন রহস্য নেশার।

www.pathagar.com

বুদ্ধি মেপে করবে না খোঁজ তার গিট খোলা সে সুতো প্যাঁচার॥
প্রিয় বালিকা শোনো তো কথা এর চেয়েও প্রিয় আরও যে প্রাণ।
যৌবন জানে সে জ্ঞান তার তরুণ চিত্তের নিকেশে দান॥
কটুক্তি যদিও করে মারলে হৃদয় তুল দৃষ্টি তুলে।
অন্তর্যামি জমিয়েছে মধু পাপড়ি তোমার অধর মূলে॥
কেন যে হাফিজ বাঁধলে গজল এমন মণিমুক্তো কসে?
ছত্রে ছত্রে তারার আলো আঁধারে ভালো জ্বলে সোনা উল্লাসে॥

অন্তরের গভীর ভাব আর ছন্দের সাবলীল গতিতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, আবেদনময়ী কাব্য হাফিজ ছাড়া বিশ্বে তেমন চোখে পড়ে না। অত্যন্ত সহজ সরল অথচ প্রাণবন্ত, প্রাঞ্জলভাবে নিজের অন্তর উপলব্ধিকে প্রকাশ করা হাফিজের স্বভাবজাত। কিন্তু হাফিজের গূঢ়তত্ত্ব অন্যভাষায় অনুবাদ করা বেশ কঠিন। প্রেমিক হৃদয় না হলে বিশৃঙ্খল শব্দ ঢুকে যেতে পারে। তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তা ও প্রেমিক মনের আকুতি যথাযথ শব্দের প্রয়াগ না হলে পাল্টে যেতে পারে। তবে আশার কথা হল যারাই তাঁর অনুবাদের কাজ করেছেন সকলেই আশ্চর্য রকমভাবে সফল হয়েছেন। হয়তো হাফিজ যেভাবে ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেভাবে না হলেও বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ কর্মীরা তাঁকে ভাব ও ছন্দের দ্বারা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত রূপে ফুটিয়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন এবং তাঁরা তাতে সফলও হয়েছেন। প্রত্যেক ভাষার প্রধান প্রধান কবি এবং ইরানী কবিরা হাফিজের মতো নিজ নিজ কাব্যে শরাবের গুণগান করেছেন, বিশেষত ওমর খৈয়াম ও হাফিজ। কিন্তু ওমর খৈয়ামের শরাবের সঙ্গে হাফিজের শরাবের পার্থক্য রয়েছে।

হাফিজ সুফি কবি ও দরবেশ ছিলেন। হাফিজের সুরা সাকি বুলবুল ইত্যাদি যদিও কাব্যপ্রতীকের মাধ্যমে জীবন্তরূপে প্রকাশ পেয়েছে তবুও বলা যায় তাতে রয়েছে সুফি হাফিজের অন্তরের গভীর প্রেমের আকুতি। যার ছন্দের মোহনীয় জাদুর পরশে বিশ্ব যেন মাতোয়ারা হয়ে আজও হাফিজের প্রেম বাগানে ঢোকার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে :

সাকী বনুর বাকাহ বর আফরোয জাম এ মা
মতবর বগো কেহ্ কার এ জাহান শাদ বেকামে মা
মা দর পেয়ালাহ আগাস রুখ ইয়ার দীদাহ আয়েশ
আয়ে বেখবর যলসাত এ সবর মাদাম এ মা
চান্দীন বোদ কর শামাহ ওয়া নাম সহী কদান
কায়েদ বজুল আছ সুর মনোবর খরাম এ মা

www.pathagar.com

হর কস নমীরুদ যানগাহ দালশ যিন্দাহ শদ বায় শক
সিবত সদ বর জরীদাহ আলেম দোয়াম এ মা
মাস্তী বচশমে শাহদ দিল বনত মা খোশ সত
যে আনরো শীরদাহ আন্দ বামাস্তী যমান এ মা
তরসম কেহ সরফাহ নবুরদ রোয বাখ খোয়ামত
যান হালাল শেখ যে আব হারাম এ মা
আয়ে বাদাহগর বেহ গুলশান এ আহয়াত বাগুজরী
যে নেহার আরসাদাহ বর জানাম পয়াম এ মা
গো নাম মা যে বাদ বয়মদাহ পেহমগ্নী বরী
খোদ আয়েদ আনকাহ ইয়াদ ইনারে যে নাম এ মা
বগরকত হামপূ লালা দিলম দর হাওয়ায়ী সরদ
আয়ে মর্গ বখত কী আখর তু দাম এ মা
দরবারে আখসর ফালাক ওয়া নিশতী হালাল
হাসতন্দ যুরক এ লায়মত হাজী কোয়াম এ মা
হাফিজ যে দীদাহ দানাহ আশেকী হামে ফশান
বাশদ কেহ মর্গ ওয়াসেদ কিন্দ কাসদ দাম এ মা

সরল তরজমাঃ

সাকি তোমার দেদীপ্ত সুরায় আমার পেয়ালা কর উজ্জ্বল।
জীবন্ত মানুষ দুনিয়ার জন্যই আমরা তো আছি আশার বল ॥
পেয়ালার প্রতিবিম্বে প্রেমিকের মুখ-আদল শ্রেষ্ঠ শরাব।
চিরন্তন যা ব্যথিতরে দেয় সব শরাবের আসল জবাব ॥
চোখের ইশারা তনুর লক্ষ্য রূপ-ধনও তো হারিয়ে যায়।
সাইপ্রেস লতা নাগরী সোনার খাটে কুসুম হেসে চায় ॥
কখনও টুটেনা চিত্ত অমর সঞ্জীবনী প্রেম বুকে বাঁধা।
কালের কপোলে আঁকে তার নাম সাক্ষি দুনিয়া কেন ও কাঁদা? ॥
আমার প্রেমিকার চোখের জলের উন্মাদনায় নিজেকে দেখি।
হৃদয় লাগাম ছিঁড়ে বাসনা স্রোতে সঁপে একাকি ॥
বুঝি পাছে শঙ্কা যে রোজ কিয়ামতে তাকে যদি না পাই।
কেন না শেখের হারাম রুটি পেয়ালার টুটি চেপে তাই ॥
মলয় যদি যাও সেখানে আমার প্রিয়ার পুষ্পকাননে।
এ দীনের বার্তা যা পৌঁছিও তাকে দোহাই মেনে ॥
কেন যে বললে মনে কি থাকবে নামটি আমার তেমার চিত্তে?।
সেদিন কখনও কি ভাবো আসবে, স্বপ্নেও দেখি না উঁকি দিতে ॥

www.pathagar.com

হৃদ কমল আমার লাল, সৌরভে মাতাল তোমাকে পেয়ে।
সুন্দর হে পাখি কখন দিবে ধরা দেখা যাচ্ছে দিন ধেয়ে?
সবুজ সাগরের বুকে একাকি চাঁদের নৌকো এই আমাদের।
সবচেয়ে হাজি কাইয়ুমের অনুগ্রহে কি ভাসবে ফের? ॥
হা হাফিজ! অশ্রু মোচ মোতির মালা বুক থেকে খুলে।
মিলন পাখিটি কখন ঝাপটি ধরা কি দেবে ভুলে? ॥

হাফিজ তার মাতৃভূমি রুখনাবাদের তীর আর মসল্লার গোলাপ বাগানকে এত প্রিয় জীবন্ত, প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, বেহেশতের সব সরঞ্জামও যেন তার কাব্যের কাছে হার মেনেছে :

নহী দহন্দ আজারত যারা বেহ্শের ওয়া সফর...

অর্থাৎ
আমাকে দিও না তন্বী স্রোতধারা রুখনাবাদের কূল
আর মসল্লার প্রিয় ঝির বাতাস ছেড়ে কোথাও যেতে।
কারণ তিনি মনে করেন বেহেশতের থেকেও তা উৎকৃষ্ট ॥

বদাহ সাকী ময় বাকী কেহদর জন্নাত না যোয়ী ইয়াফত...

অর্থাৎ
ঢালো সাকি! বাকি সুরা পাওয়া যাবে না এমন কেননা
রুখনাবাদের কুসুমাকীর্ণ নদীর তীরের মসল্লা আর কোনও বেহেশত ॥

হাফিজের শিরায় খাঁটি প্রেমিকের রক্তের প্রবাহ, যা আদতে ইরানী, তাঁর বিবেচনায় অন্য জায়গা এত প্রাণবন্ত, উৎকৃষ্ট নয়, অন্যরা ইরানিদের মতো ভদ্র সুসভ্য নয়, তারা ইরানি তাহজিব কিছু জানে না, তাই অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা, কথা বলার চাইতে রুখনাবাদের তীরে একটা গাছের সঙ্গে কথা বলা হাজারগুণ শ্রেয়। তাছাড়া দুনিয়ার সেরা সুন্দরী এবং সুন্দর পুরুষ কেবল ইরানেই জন্ম হয়। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ধর্মীয় কেতাবে যে হুর আর গেলমানের বর্ণনা আছে তারা সবাই ইরানী আদলের।
হাফিজের মতো এমন তুর্কিবালা হয়তো বেহেশতে পাওয়া যাবে না, আর পাওয়া গেলেও তার সাথে এর তুলনা অর্থহীন কারণ ইশ্‌ক বা প্রেমের উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

তা নয়। মহান স্রষ্টার দীদার ও তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে চির অমরত্বের জগতে পৌঁছে যাওয়াই একজন সুফির মনস্কামনা। সেখানে তাঁর কাছে বেহেশত মূল্যহীন। হাফিজ কাব্যে মিলনই বেহেশত আর বিরহই দোযখ। তাই হাফিজের কবিতা পড়ে প্রেমিকরা যে বেহেশত লাভ করে এবং সুফিরা আধ্যাত্মিক স্বাদ পান তার সাথে অন্যকিছুর তুলনা নেই।
তুর্কি সুন্দরীর প্রসঙ্গ কেবল এ কবিতায় নয়, অন্যত্রও দেখা যায়। সে কারণে অনেকের ধারণা হাফিজের শাখই নাবাত ছিলেন তুর্কি সুন্দরী। শাখই নাবাত ছিলেন হাফিজের প্রিয়তমা স্ত্রী, তাকে তিনি তাঁদের ঘরের পরী বলেছেন :

তন বার কাখওবা খানায়ে মা জায়ী পরী বুদ
সর তা কদমশ চুন পরী আয গায়েব বরী বুদ ॥

অর্থাৎ প্রিয়তমা যিনি আমাদের গৃহে ছিলেন পরীস্তান থেকে এসে এবং তিনি মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরীর মতোই ছিলেন এবং নিষ্কলঙ্ক।
কবির স্ত্রী মারা যাওয়ার পর এ কবিতা তিনি লিখেন। কবির জীবনের ওপর দিয়ে তাঁর পুত্রদের মৃত্যু ঘটে, এক পুত্রের মৃত্যুর পর রচনা করেন :

দিলা দীদী কেহ আঁ ফারজানা ফরজন্দ চেহ দীদ আন্দর খমে
তাকে রঙ্গিন বযাড়ে কওকে সীমীন দর কিনারশ ফালকে
বর শের নেহাদশ লওকে সঙ্গীন ॥

ওরে আমার চিত্ত, তুই তো দেখেছিস পুত্র আমার কোলে ছিল, এখন সে কোল ছেড়ে কি পেয়েছে? সে তো এ রঙিন চাঁদোয়া তলে ঘুমাত, সোনার তাবিজ রূপোর পেলেট যা তার বুকে ও শরীরে মানাত এখন তার বুকে পাথর, পাথরে শিথান দিয়ে আছে সে।
তারপর তৈমুর লঙ্গ হাফিজকে বোখারায় নিয়ে গিয়ে খুব আদর আপ্যায়ন করলেন এবং লোভ দেখালেন, বোখারায় তুর্কি সুন্দরীদের তো রূপের তুলনা নেই, হাফিজ তো আসল না দেখেই এ কবিতা লিখেছেন। এদের না দেখে কবিতা লেখা আর ঝোপে ঝাঁপ মারা একই কথা। তার চাইতে প্রকৃত সুন্দরী চোখ ভরে দেখে এবং তাদের জীবন্ত আস্বাদন করে বোখারা ও সমরখন্দকে নিয়ে আরও কবিতা লিখবে, চলো। সুলতান মাহমুদ ফেরদৌসিকে যা দিতে চাইছিলেন তার চাইতে অনেক অনেক বেশি আমি তোমাকে দেব।

www.pathagar.com

হাফিজ বললেন, 'ফেরদৌসি তো শেষ পর্যন্ত কিছুই পাননি।' এবার ইঙ্গিত বুঝতে তৈমুরের বেশি দেরি হল না অর্থাৎ আপনিও শেষ পর্যন্ত কিছুই দেবেন না। হাফিজকে কেবল খোদা হাফিজ বলে বিদায় করবেন।

তৈমুর তড়িৎ বললেন, 'এমনই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করার প্রাথমিক পদক্ষেপ কী দেখো—আঙুলের তুড়িতে ইঙ্গিত করতেই দু একটা চতুর্দ্দশী তুর্কি বালা এসেই তৈমুরের সামনে হাজির আর এ সুন্দরীরা এমনই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে চোখের পলকে তৈমুরকে আড়াল করে হাফিজকে কী করে চিনল খোদা মালুম। কবির দাড়ি চুমড়িয়ে মুখে চুম্বন দিয়ে আঙুর লতার মতো সুকোমল বাহুলতা জড়িয়ে কবির কণ্ঠ থেকে সোহাগ ভরে ঝুলতে লাগল। কবির মুখের ভেতর ঊষা রক্তিম আঙুর-ওষ্ঠ প্রবেশ করিয়ে দেয়াতে কোনও কথা মুখ থেকে শোনা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হল সবচেয়ে নাম করা লাল শিরাজি আর বসরাই গোলাপের ঝাড়। কবি কণ্ঠলগ্ন তুর্কি বালাদের আর অবহেলা করতে পারলেন না। অবশেষে তারা তাকে লুফে নিল, নিয়ে আবনীত গোলাপ দিয়ে ঢেকে তৈমুরের দৃষ্টির আড়াল করতে চাইল। এ সময় তিনি এক বালিকাকে কী মধু খাওয়ালেন। আর শরবতের পেয়ালা হাতে নিয়ে কী করেন তা যেন তৈমুর বুঝতে না পারেন সেটা করলেন। তবু তৈমুর আড় চোখে একবার তাদের আলিঙ্গন অবস্থায় দেখে ফেললেন এবং ঈর্ষান্বিত একটু হাসলেন। কবি তোয়াক্কা না রেখেই উচ্চারণ করলেন—

গুলে দরবর ওয়া ময় দরকফ ওয়া মাশুকাহ বকামস্ত
সুলতান জালেম বচাইন রোয গোলামস্ত বলে কী?

অর্থাৎ,
কণ্ঠে প্রেয়সি বালিকা ফুলের মালিকা আর শরবতের জাম হাতে
দুনিয়ার জালেম সুলতানকে এক্ষুনি গুণি গোলাম তাতে।

দুনিয়ার সুলতান তো তৈমুর লঙ্গ, হাফিজ কি তাঁকে জালেম বললেন? বলছো কী?

হ্যাঁ, দুনিয়ার সুলতানই তিনি। তিনি বিশ্বত্রাস। তাঁর সমকক্ষ শক্তিমান তখন দুনিয়াতে আর কে? তাকেই হাফিজ জালেম বলছেন আর তাঁর সাক্ষাতে? তিনি নাকি এই ফকির বাউরা কবির গোলাম? কোন সাহসে এ কথা বলা? এমন পাগল দুনিয়াতে কি কেউ জন্মগ্রহণ করেছে?

একজন চিৎকার করে বলল, বাঁধ হতভাগাকে, বাঁধ কসে।

শূলে চড়াও।

www.pathagar.com

তৈমুর বললেন, 'না, তাকে নিয়ে চলো বোখারায়। দুনিয়ার সুলতানের কী তাকাত শৌর্যবীর্য ঐশ্বর্য আর কী কী আছে এ ক্ষীণদেহী সুফধারি (মোটা পশমি পোশাকধারি সুফি) দরবেশ কবি বেটা বুঝে নিক।'
আর কথা নেই। কবির হস্তপদ আবার বাঁধা হল, অবশ্য শক্ত কোনও রশি দিয়ে নয়।এবার মানুষের হাতের বেষ্টনি দিয়ে। কবির এমন শক্তি নেই যে তাদের এড়িয়ে গলিয়ে বাঁচতে পারেন। তবু যতটা পারেন হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করলেন, 'না, আমি যাব না, মসল্লার বেহেশত ছেড়ে আর কোনও বেহেশতে আমি যাব না।' কাব্যের মূর্চ্ছনায় চারদিক মাতিয়ে তুললেন :

নহী দিহান্দ ইজারত মারা বেহ্ সীর ওয়া সফর...
নসীমে বাদে মুসল্লায়ে ওয়া আবে রুখনাবাদ ॥

মুসল্লার মৃদু সমীরণ আর রুখনাবাদের রূপোলী নদী
তাদের ছেড়ে দিও না যেতে বেহেশতেও আবাস পাও যদি।

কবি এমন প্রলাপ বকছেন। হেকিম সাহেবের ইঙ্গিতে শিরাজির সঙ্গে আরক মিলিয়ে পেয়ালা তুলে তাঁকে খেতে দেওয়া হল। মুহূর্তে কবি বেহেশতে বাস করতে বাধ্য হয়ে চলে গেলেন আর যখন চোখ মেললেন দেখলেন, তিনি কোথায়? তিনি এক তাজ্জবের জায়গায়, বোখারায়। দুনিয়ার সুলতানের নব নির্মিত রাজধানীতে। মাত্র কিছুদিন আগে সমরখন্দ থেকে এখানে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেছেন। সমরখন্দ হল প্রথমা (স্ত্রী) আর বোখারা একেবারে তন্বী চমৎকার। নতুন দালান কোঠা ফুলের বাগান আর সুন্দরীদের চটুল অক্ষিপাত সমৃদ্ধ অভিনব বিপনি বিতান।
দুনিয়ার সুলতানের শাহী প্রাসাদের ভেতর সজ্জিত প্রকোষ্ঠে—যেখানে বেহেশতের সাজ সরঞ্জাম কেতাবের বর্ণনার মতো রয়েছে, সেখানেই কবিকে নিয়ে রাখা হল। কক্ষের অলিন্দের বাইরে অনিন্দ্যনীয় ফুলের কেয়ারি আর ফোয়ারা থেকে ঝিরঝির করা পানি ছিটকে যাচ্ছে যেন অবিশ্রাম যৌবন বুক চিরে স্নিগ্ধ ধারা বের করে দিচ্ছে। বুলবুল গাইছে, গোলাপ বাতাসের সঙ্গে লুকোচুরি করে প্রেমে অস্থির হচ্ছে বুলবুলের সঙ্গে। আরও আশ্চর্য! অগুণতি হুরি-তুর্কিবালা কিংবা তুর্কিবালা তুল্য সুন্দরী, না তারাই তো! তাঁর চারদিকে কটাক্ষ টেনে চাইছে। দুধের মতো সাদা অথচ স্বচ্ছ তনু তাদের পাতালি কোমর, বুকের ওপর তিলকা ফুঁসে উঠছে আর ওষ্ঠে স্মিত হাসি নিয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, এরা সবাই কবির সেবার জন্য নিয়োজিত।

www.pathagar.com

মহাকবি হাফিজের যে সমস্ত দিওয়ানের মর্মস্পর্শী ও জাদুকরী ছন্দ মূর্চ্ছনায় আমির তৈমুর লঙ্গ ও তাঁর সৈন্যরা ধরাশায়ী হয়ে সমস্ত প্রকার নিগ্রহ থেকে নিজেদের বিরত করে প্রেমের অমীয় ধারায় আত্মবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন সেসব হল :

সোবেহ্ দৌলত মীদমত কো জাম হামচুন আফতাব
ফরসতী যীন বেহ্ কজা বাশদ বাদাহ্ জাম শরাব ॥

অরুণোদয়ে সুপ্রভাত ঝলমলে মন সুরার জাম দাও হাতে।
কোথা পাব আর অনাবিল এইক্ষণ, সুরার জাম দাও হাতে ॥
কবোষ্ণ কক্ষ প্রেমিকা সাকি মধু ঝরা সুরে গাইছে গান।
খুশির এ সময় যৌবন বানে নাইছে সুখের প্রাণ, সুরার জাম হাতে দাও ॥
সাকি নাচছে বন্ধুরাও নাচে গায়কও নাচে তাল রেখে।
কটা কটাক্ষ বিঁধে মাতাল ঢুলুঢুলু নিদ চোখে মেখে, সুরার জাম দাও হাতে ॥
নির্জন কোণে নিরাপদ মনে প্রেমের এ কুঞ্জবনে।
এর খোদা! কি স্বপ্ন কি মায়া মতিভ্রম ক্ষণে, সুরার জাম হাতে দাও ॥
মোহন সুরার একই চুমুকে বুদ্ধিখোলে দৃষ্টি পরিষ্কার।
গোলাপ বনে লুকানো বলি চোখে তার, সুরার জাম দাও হাতে ॥
দিল খোলা খুশিতে ফোলা রূপ দায়িনী এরা সব।
খুনি সুরা আর সোনার পেয়ালা ভরে চলে মচ্ছব, দাও জাম হাতে ॥
মুশতারি তন্বি কিংশুক ধনি্য ঠোঁটে হাফিজের গজল গায়।
কালপুরুষ রবাবে তাল রেখে মাতে এই খাস কামরায়, সুরার জাম দাও হাতে ॥

গোফতম আয়ে সুলতানে খোবান রহম কুন বর ইন গরীব
গোফত দর দুনবাল দেযরাহ্ গম কুনদ মিসকীন গরীব

সুন্দরের সুলতানকে বলি এ গরিবকে দয়া করুন।
দয়া? বললেন, পথ ভোলায়, হৃদয়ে অতৃপ্তি, গরিবী চোখে করুণ ॥
তবে একটু মেহেরবানি, আমারই জন্য দিন পায়ের ধুলো।
শোনো, গৃহে দুঃখ যন্ত্রণা, ছাড়ো হালকা রসিকতাগুলো ॥
দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শায়িত যে, তার আবার দুঃখ?
নিঃস্ব ঘুমায় পথের ধারে দেখুন পাথরে মাথা বুকে কাঁটা রুক্ষ ॥
সুন্দরী, আপনার সুচারু বেণী বেঁধেছে সকল চিত্তকে।
কালো তিল বদনে অপরূপ সে কাহিনী নিত্যকে ॥

www.pathagar.com

আমি গরিব আপনার সুন্দরের বাণে বিদ্ধ হয়েছি।
দৃষ্টি তাই ছুটেছে এ সাম্রাজ্যে, প্রাণে না বাঁচি ॥
আপনার চেহারা শরাবের প্রতিবিম্বে দেখি আর হারাই।
বনের শ্রেষ্ঠ গোলাপ ফুটেছে অজান্তে পাতায় ঢাকা তাই ॥
কালো চুল মেলেছে জায় নামাজে গরিবের দিনের শেষে।
সারারাত আর সোবেহসাদেক অবধি কেঁদে খুনের দেশে ॥
চাঁদ বদনী, আপনার গোলাপের ওপর আবরণ রাখবেন না।
তা না হলে আমাকে যোগী বিবাগী করে দেবে, দুনিয়া হবে আনমনা ॥
হেসে বললেন, হাফিজ তোমার হৃদয় বন্ধু রয়েছে অনিশ্চিত।
অপেয় অভাজানের জন্য প্রেম অস্নাত হলেও বিস্মিত ॥

বইয়া কেহ কসর আমল সখত বুনিয়াদ সত
বইয়ার বাদাহ কেহ বুনিয়াদই উমর বরবাদ সত

রঙিন সৌধ দুর্বল ভিত আশার ছলনার সব দৃশ্য।
সুরার পেয়ালা তাতে রাখ জীবন বিনাশে সব নিঃস্ব ॥
জীবন সেবী সেই সাহসী নীল আসমানের নিচে রয়।
প্রতি জিনিসের রং তুলে খায় মুক্ত সে পেয়ালা জয় ॥
হাজার বার বলি পেয়ালার কাছে নামো নাম স্মরে।
জ্ঞানীর বাণী চিত্তে টেনে মেনো বলছি কিন্তু জোরে ॥
যা বলা হয়েছে আর না বলা স্বপ্ন সব কাউকে বিশ্বাস নেই।
দুনিয়া বহু ভোগ্যা বুড়ি তার কাছে রাখা বাসনার আশ নেই ॥
আসমানি সুখবর গতদিনের কী তা জানি না।
আমি মত্ত শুড়িখানায়, তালা লাগিয়ে কিছু মানি না ॥
মগডালে বসা শ্যন শাহবাজ স্বর্গে বাস যার।
আমরা দুনিয়ার দুঃখে জীর্ণ আধমরা এ কীট আহার তার ॥
আরশের গম্বুজ হতে আসছে যে আহ্বান নিত্যি নিত্যি ॥
মায়াজাল জড়িয়ে সংসার ছড়িয়ে তার দান সত্যি সত্যি ॥
দুনিয়ার দুঃখের যত উপদেশ রাখ তার কাছে বাজে না।
বৃদ্ধ পীর বলেন ছাড় অব্যর্থ রাগ সংসার চিত্ত মাঝে না ॥
হৃদয় সাজিয়ে প্রস্তুত সব হয়রানির অবসানে বাঁচো।
তোমার আমার স্বাধীন ইচ্ছা কুঁড়ি থেকে চোখ মেলেনি আজো ॥
হাসে গোলাপ আনন্দের হেতু নেই কোনও প্রেম দৃঢ় নয়।
হতভাগা বুলবুল কেঁদে খুন শুধু ফরিয়াদে কয় ॥

www.pathagar.com

ভগ্ন কণ্ঠে হাফিজ গায় গজল তবু তার দিকে তাক কত বাণ।
খোদার হাতের কাজ এ দিওয়ান সৌন্দর্য সমাদরে তার দান ॥

গুলে দর বর ময় দরকফ ওয়া মাশুকাহ্ বকামস্ত
সুলতানে জালেম বচাইন রোয গোলামস্ত

ফুলের মালা গলে পরান প্রিয়া বুকে আর শরাবের পেয়ালা হাতে।
দুনিয়ার জালেম সুলতানকে গুণি তাই গোলাম আজ রাতে ॥
কোনও প্রদীপের প্রয়োজন নেই রাতে এমনি রূপ তার।
খুবসুরত চাঁদ মুখই সমাবেশে যথেষ্ট উজল সার আজরাতে ॥
মদ হারাম যে গোষ্ঠীর সেই তুষ্টিই তাদের হালাল বটে।
গোলাপ ও ঝাউ তরুর আলিঙ্গনে বোঝে না কী হাল ঘটে আজরাতে ॥
শুনি হৃদয়ভরে গান বাঁশি আর বীণার সুর করুণ।
ওষ্ঠ আমার নিবিষ্ট তার চুনি ওষ্ঠের দরুন আজরাতে ॥
মিছরি নাকি ইক্ষু মিঠা ঝুটা তাদের তুলনা সার।
মিঠা ঠোঁটের স্বাদ যদি পায় পরিণাম কী বলবে তার আজরাতে ॥
যখন এল তার বেদনা চিত্তজ্বালা আমার চিত্ত জুড়ে।
মদ্যশালাই হল নিবাস বুঝিনি বিশ্বাস পুড়ে আজ রাতে ॥
কুৎসা বটে তাই? অপযশ আর নিন্দার স্রোত ছোটে।
পরওয়া করি না নামের সঙ্গে বদনাম যদি জোটে আজ রাতে ॥
মদ্যপায়ী উন্মাদ আমি প্রেমিক কলঙ্কিত নজরবাজ।
এটাই বল! নয় কে এমন এ শহরে করে না এ শুদ্ধ কাজ আজ রাতে ॥
কাজির কাছে করো না নালিশ আমার এ বদ ভাব ধরে।
জানো না তো তারও রয়েছে এমনি স্বভাব গোপন ঘরে আজ রাতে ॥
প্রিয়া আর পেয়ালা ছাড়া হাফিজ ক্ষণিক বাঁচে না তো।
কেন না গোলাপ ফোটে সিয়াম শেষে ঈদের ইনাম সে তো, আজ রাতে ॥

মতলব তলায়ত ওয়া পয়মান দূরস্ত আয মানস্ত
কেহ্ বেহ্ পয়মানাহ্ কশী শহরাহ্ শদম রোয আলস্ত

মাতালের কাছে সঠিক বন্দেগী ভক্তির উৎস খোঁজ।
সৃষ্টির প্রথম দিনেই তারা পেয়ে ভূষিত শরাব পুজো ॥
আমি তাদের একজন ওজু করি প্রেম নিসৃত আঁখি বারি তো।
চার তকবিরের সাথে সেজদায় ফেলি সম্পদ এ রকমারি তো ॥

www.pathagar.com

তাহলে মদ দাও হাতে কী ভাগ্য তাতে জানতে পারি।
কার চাঁদ মুখের পাগল প্রেম ফুলে মশগুল এ বেচারি ॥
পিপড়েসম সরু কোমার তার লাস্য নজর বিদ্ধ আমি।
শরাব পিয়ে পিয়ে কেবল বাঁচি সূক্ষ্ম অনুগ্রহকামী ॥
জান কোরবান হোক সে আনন কানন দেখার জন্য।
এমন কুঞ্জ দুনিয়ার ফুল বানাতে পারে না অনন্য ॥
নার্গিস আঁখি অকলঙ্ক কুনজরে মলিন করেনি।
চাঁদোয়া তলে আসমান জোলা আনন্দ আর ভরে নি ॥
হাফিজ তুমি প্রেমের লাগি সোলেমানি তাবিজ বুকে।
হাওয়া ছাড়া এ মিলন ঠুকে আর কেউ যেন না ধুকে ॥

বাগ মারা চে হাজত সরো ওয়া সনোবরস্ত
শমশা দরসায়ে পরুর মান আম কেহ্ কমতরস্ত

আমার বাগানে সাইপ্রেস আর দেওদার কী প্রয়োজন?।
প্রিয়তমার ছায়াই উৎকৃষ্ট অন্য কিছু নয় তো এমন ॥
তন্বি প্রিয়া সন্নিকটে স্বভাব আবিষ্ট গোলাপে।
হৃদয় রক্ত আমার ফোটে হালাল মাতৃস্তন্য রূপে ॥
কত দিন পরে দুঃখ ধরে প্রেম পান করে বেড়েছি।
এখন সেয়ানা দেহে ও মনে প্রতিষেধক তা পেয়েছি ॥
আসল প্রেমের কেচ্ছা এর চাইতেও কী রোমাঞ্চ?।
যার কাছে যাও চিরন্তন বলে বলি এটাই বরঞ্চ ॥
পীর মাগানির আস্তানায় ফের কেন বা মাথা ঠোকা।
তমিই আমার সেই সম্পদ হৃদয় গৃহের মৌকা ॥
ওয়াদা করেছ আছো তো মনে আমাকে দেবে আলিঙ্গন।
কিন্তু মগজে মদ্য কাজে ছিলাম মত্ত আমি তখন ॥
আব্রুর সন্তোষ্টি অহংকারের বিরোধী ভেবো না।
বাদশাকে বল দানাপানি কিসমতে আছে তো দেনা ॥
সিরাজের রুখনাবাদ তীর তার অনাবিল হাওয়া খেয়ে বাঁচি।
দুনিয়ার সুন্দরী সে গালের তিলের রূপ দেখে দেখে আছি ॥
খিজিয়ের জীবন পানি অনেক অনেক ব্যবধান।
তার আঁধার আর এ নদীর ছোট ঢেউ এও আল্লাহ গান ॥
এখানে গলিতে হৃদয় লেনদেন হয় কত সমাবেশ।
শয়তানের কাছে আত্মবিক্রি নয় কখনও বাজারে বেশ।

www.pathagar.com

হাফিজের কলম পেয়েছে এখানে শাশ্বই নাবাত উপহার।
মিঠা ফল মধু দুধ ইক্ষুর চেয়েও সুস্বাদু দিল তার ॥

খালুত গসীদাহ রা বতামাশা চেহ্ হাজতস্ত
চুন কোয়ী দোস্ত হাস্ত বসহরা চেহ্ হাজতস্ত ॥

নির্জনে চলে গেছে যে তার আর বাজার হাটের দরকার কী?।
প্রেমের গলির মুখ পেয়েছে যে খোলা মাঠের তার দরকার কী? ॥
প্রেমিক তুমি প্রেম প্রয়োজন গচ্ছিত আছে খোদার কাছে।
বর্ণিত সকল পথ গেছে তাতে পুছে বাটের দরকার কী? ॥
সুন্দরের যে রাজা তারই থাকে সব তরতাজা।
ফকির যো খোদার কসম আমার রেশমি পাটের দরকার কী? ॥
কৃপাপ্রার্থীর কাড়া নাকাড়া সব সওয়ালের ঝাড়া যা।
দয়ালের দরবারে এসে ঝড়া নাটের দরকার কী? ॥
প্রিয়তমের উজ্জ্বল চিত্ত বিশ্বের প্রতিবিম্ব নিত্য।
নিজের সত্তা বিত্ত জাহিরকৃত্য সে ঠাটের দরকার কী? ॥
ডুবরি সাগর জলে নানাছলে ছিলাম ডুবে।
মুক্তো এখন হস্তগত আর সাগর ঘাটের দরকার কী? ॥
পাণিপ্রার্থী দুষমন যদি হও তুমি এখনই সরো।
প্রেমাস্পদ যদি না হলে আমার সুজন হাটের দরকার কী? ॥
আমি তো যুদ্ধ চাই না তবু প্রতিহিংসা বধ করবার।
আগে ভাগে তার আয়োজন খুটখাট লুটপাটের দরকার কী? ॥
সঞ্জীবনী চুমুতে প্রেম ভিখিরি প্রেমিকার ওষ্ঠ খাও।
তার গোপনতত্ত্ব জানা থাকলে সুধার পাঠের দরকার কী? ॥
কথা তোমার সাঙ্গো কর গুন থাকলে নির্গুণও করে।
খলের ভেতর তর্কচুরা হাফিজ মজনু পোড়া কাঠের দরকার কী? ॥

হাফিজ কতদিন বোখারাতে জীবন কাটিয়েছেন সে কথা কোথাও লেখা নেই। তবে খুব বেশি এ বন্দি জীবনে তাঁকে থাকতে হয়নি। কারণ বিশ্বত্রাস তৈমুর কোথাও একদণ্ড স্থির থাকতে পারতেন না। কোনও কিছুতেই তাঁর তৃপ্তি মিটত না। কত রাজ্য রাজধানী তখনও তাঁর দখলে আসেনি। কত কিছু করা বাকি। এবার তিনি হিন্দুস্তান অভিযানে প্রস্তুত হলেন। কবিকে তো সমস্ত প্রকার শৌর্যবীর্য বীরত্ব না দেখিয়ে ছাড়বেন না। তারও অভিযান যে কী নৃশংস তা দেখিয়ে কবির কাছ থেকে কাব্যস্তুতি বের করে ছাড়বেন। কবিকে সঙ্গে করে

www.pathagar.com

নেওয়া হল বটে কিন্তু কবি পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হেকিম পরীক্ষা করে সবিনয়ে তৈমুরের সামনে কবির শেষ পরওয়ানা পেশ করলে তৈমুর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা বেটাকে পুরনো বেহেশতে যেতে দাও। অর্থাৎ কেতাবে বর্ণিত বেহেশতে।'

কবি ছাড়া পেয়ে সে যাত্রায় নতুন বেহেশত হিন্দুস্থানে যেতে পারলেন না, পুরানো বেহেশতেও না, পথে কান্দাহার থেকে কোনও মতে শিরাজে ফিরে এলেন। কিছুদিন পরে মৃত্যুবরণ করেন। একজন শিল্পীর পক্ষে যা শ্রেষ্ঠ মরণ, এই পরম প্রিয় অমৃত মৃত্যু কবি হাফিজ লাভ করলেন যা খাকি ভার্জিলের মতো। ভার্জিলকে পাওয়া গিয়েছিল 'ঈনিড' বুকে সুপ্ত। তাই ব্রাউন হাফিজকে ইরানের ভার্জিল বলেছিলেন। তবে ভার্জিল মৃত্যুর পর তাঁর দেশবাসীর অসীম শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। কিন্তু হাফিজের ভাগ্যে জুটেছিল তাঁর স্বজন বর্গের কাছ থেকে চরম অবহেলা, তাঁকে বলা হয়েছিল কাফের। তাঁর মৃত্যুর পর তার দাফন নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছিল। হাফিজ তার কবিতা সংরক্ষণের বিষয়ে খুব উদাসীন ছিলেন। তাঁর রচনাবলি তাঁর মৃত্যুর পর গুণ গ্রাহীরা সংগ্রহ করে, দিওয়ানে হাফিজ নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তার মৃত্যুর পর তাঁর কুটিরে বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। কবির স্ত্রী এবং পুত্ররা আগেই মৃত্যুবরণ করেন। নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুর অনেক পরে জানা গিয়েছিল যে সেটা খুবই চমকপ্রদ খবর। তবে দুনিয়ার সুলতানকে তিনি যে গোলাম করেছিলেন কেবল সে দলিলটি ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল, তা এই।

গুলে দরবর ওয়া ময় দর কফ ওয়া মাশুকাহ্ বকাস্ত
সুলতানে জালেম বচাইন রোয গোলামস্ত
গোশময়ে মীয়ারীদ দরিন কেহ্ ইমশব
দর মজলিশ মা মাহরুখ দোস্ত তামামস্ত
দর মযাহাব মা বাদাহ্ হালালস্ত ওয়া লেকিন
বী রোয়ী বু আয়ে সরও গুল আনদাম হারামস্ত
গোশম হামা বর কোলে নী ওয়া নাগমান চঙ্গস্ত
চশমম মা আতর ময়া মময কেহ্ জানরা
হর লহাজাহ্ যে গী সোয়ী তু খোশবুয়ী মশায়স্ত
আয চাশনীয়ে কন্দ মগুহীচ ওয়া যে শক্কর
যে মান রো কেহ্ মরা বালেব শীরান তু কামস্ত
তা গনজ ঘুমত দর দিল ওয়া ইয়ারানে মকিমস্ত
পীওয়াস্তাহ্ মরা গনচে খরাবতে মযামস্ত
আয ননঙ্গ চী গোয়ী কেহ্ মরানাম যে ননঙ্গস্ত

www.pathagar.com

ওয়ান নাম চী মপর যা কেহ মরা ননঙ্গ যে নামস্ত
মী খোওয়ারায়ে ওয়া সর গোশতায়ে ওয়াট রন্দীম ওয়া নযরবায
ওয়া আনকস কেহ চোমানীস্ত দরিন শহর কদামস্ত
বা মহ্‌তসীম আয়েব মগোয়ীদ কেহ্ আও বীয
পওয়াস্তাহ চুমা দর তলবে আয়েশ মদানস্ত
হাফিজ মনশীল বী ময় ওয়া মাগুকাহ্ যমানে
কায়ামে গুল ওয়া ইয়াসমীন ওয়া ঈদ সীয়ামস্ত

সরল তরজমা:

ফুলের মালা গলে পরান প্রিয়া বুকে আর শরাবের পেয়ালা হাতে।
দুনিয়ার জালেম সুলতানকে গুণি তাই গোলাম আজ রাতে ॥
কোনও প্রদীপের প্রয়োজন নেই রাতে এমনি রূপ তার।
খুবসুরত চাঁদ মুখই সমাবেশে যথেষ্ট উজ্জ্বল সার আজরাতে ॥
মদ হারাম যে গোষ্ঠীর সেই তুষ্টিই তাদের হালাল বটে।
গোলাপ ও ঝাউ তরুর আলিঙ্গনে বোঝে না কী হাল ঘটে আজরাতে ॥
শুনি হৃদয়ভরে গান বাঁশি আর বীণার সুর করুণ।
ওষ্ঠ আমার নিবিষ্ট তার চুনি ওষ্ঠের দরুন আজরাতে ॥
মিছরি নাকি ইক্ষু মিঠা ঝুটা তাদের তুলনা সার।
মিঠা ঠোঁটের স্বাদ যদি পায় পরিণাম কী বলবে তার আজরাতে ॥
যখন এল তার বেদনা চিত্তজ্বালা আমার চিত্ত জুড়ে।
মদ্যশালাই হল নিবাস বুঝিনি বিশ্বাস পুড়ে আজ রাতে ॥
কুৎসা বটে তাই? অপযশ আর নিন্দার স্রোত ছোটে।
পরওয়া করি না নামের সঙ্গে বদনাম যদি জোটে আজ রাতে ॥
মদ্যপায়ী উন্মাদ আমি প্রেমিক কলঙ্কিত নজরবাজ।
এটাই বল! নয় কে এমন এ শহরে করে না এ শুদ্ধ কাজ আজ রাতে ॥
কাজির কাছে করো না নালিশ আমার এ বদ ভাব ধরে।
জানো না তো তারও রয়েছে এমনি স্বভাব গোপন ঘরে আজ রাতে ॥
প্রিয়া আর পেয়ালা ছাড়া হাফিজ ক্ষণিক বাঁচে না তো।
কেন না গোলাপ ফোটে সিয়াম শেষে ঈদের ইনাম সে তো, আজ রাতে ॥

মহাকবি হাফিজ দুনিয়ার ইতিহাসে চির অমর হয়ে রইলেন। তাঁর বিশ্বকাঁপানো দিওয়ান গুলো ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তৈমুর লঙ্গ ও হাফিজের এ ঘটনাও ছড়িয়ে গেল পৃথিবীর নানা প্রান্ত জুড়ে। ইরানের বুকে জীবন্ত কিংবদন্তিরূপে আজও যার মাজারের পাশে হাফিজ প্রেমিকগণ

www.pathagar.com

ভীড় জমিয়ে মহান এই কবিকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত করেন। নিজের জন্য আশির্বাদ কিংবা হাফিজের জন্য হৃদয় উজাড় করে দোয়া করতে থাকেন। জীবদ্দশায় হাফিজের হৃদয় রুখনাবাদ তীর ও মসল্লাবাগান তাঁর সুখে দুখে প্রেমে সারাজীবন জড়িত ছিল এবং এ স্থান ছেড়ে তিনি কখনও স্বেচ্ছায় কোথাও যাননি। এখানেই তাঁর জন্ম এবং এখানেই লিখতে লিখতে তাঁর মৃত্যু হয় এবং এখানেই তাঁর মাজার।

হাফিজ খুব সুদর্শন ছিলেন। তাই সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। বিশেষত জেনানা মহলে তাঁর সমাদর ছিল খুব বেশি এবং সেখানে তিনি সাড়াও জাগিয়েছেন বেশি। শোনা যায় কোনও গুল বাগিচার দুর্বাশ্যামল মসল্লায় বসে হাফিজ যদি কণ্ঠ ছেড়ে গজল পেশ করতেন তাহলে বাগিচার আড়ালে আবডালে মেয়েরাও আব্রু বে-আব্রু অবস্থায় এসে ভিড় লাগাত। শিরাজের প্রকাশ্য রাজপথে জেনানার দল হাফিজের পিছু ধাওয়া করেছিল, হাফিজ 'ইরাকি' বীণা বাজিয়ে গাইতেন আর তারা করতাল যোগে তার ধুয়া তুলত। ইরাকি বীণাকে আমির খসরু পরবর্তীকালে সংস্কার করে সেতার সৃষ্টি করেন। মূল ইরানি বীণা দুই তার বিশিষ্ট্য বাদ্যযন্ত্র। এমন কাণ্ড কেউ কখনও আগে দেখেনি এমনকি ভাবতেও পারেনি। তাই গোঁড়া মোল্লার দল আর রক্ষণশীল সমাজ রক্ষককেরা হাফিজের ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁকে কয়েকবার দৈহিকভাবে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। হাফিজ কণ্ঠ চড়িয়ে তাদের আক্রমণের দাওয়া এই বলে দিয়েছিলেন—

ফসলই গুল ওয়া তরফে শরাব, আয়ে বেখবর

অর্থাৎ এখন গোলাপের সময় আর তোমরা শরাব ছেড়ে আমাকে মারতে উদ্যত হয়েছ, তোমাদের কোনও খবর নেই।

জাদুকরী কণ্ঠের সুরের মোজেজা শেষ অবধি সকল আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে। আর তারাই তাকে নিসানুল গায়ের বা অদৃশ্যের রসনা বলে সংযত হয়ে গেছে 'ফসলই গুল ওয়া তরফে সারাব' পৃথিবী খ্যাত উক্তি, উর্দু কবিতা, তুর্কি কবিতা, এমনকি এক সময় বাংলা কবি নজরুলের চেতনায়ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল।

এভাবেই হাফিজ ইয়োরোপের হৃদয়কে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিলেন যা আগে কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি একমাত্র খৈয়াম ছাড়া। নিজের ভেতরে এ নব প্রেম সঞ্চার করে ইয়োরোপ যেন জীবন্ত ও প্রাণান্তরূপে হাঁটতে শিখেছে। হাফিজ হয়েছেন দুনিয়া শ্রেষ্ঠ মহাকবিদের একজন।

www.pathagar.com

এভাবে বিশ্বপ্রসিদ্ধ মহাকবি ও সুফিদের দিওয়ান, দর্শন ও তত্ত্ব রহস্যের জ্ঞানের আলোয় ইকবাল ভীষণভাবে আলোকিত হন। তাঁর পরবর্তী রচনাগুলোতে এর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এরপর থেকে ইকবালের কাব্য প্রতিভার দ্যুতি ও জাদুকরী স্পর্শের সীমাহীন প্রভাব সকল রচনাতেই লক্ষ্য করা যায়।

লন্ডন থেকে স্বদেশ ফেরার সময় নিকলসন ইকবালকে পুনরায় লন্ডন আসার জন্য ওয়াদা করান। পরবর্তীকালে ইকবাল লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতে গেলে ড. নিকলসনের সাথে পুর্নবার সৌজন্য সাক্ষাত করেন। ড. নিকলসন এবার ইকবালের 'আসরারে খুদী' বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাঁর প্রতি সম্মান জানান এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের চির যোগসূত্র স্থাপন করেন। এ দুজন মনীষী আজীবন একে অপরকে স্মরণ রেখেছিলেন। ড. নিকলসনের ইংরেজি অনুবাদটি ১৯২০ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি পাঠকমহলে আশাতীত সমাদর লাভ করে এবং ইকবালের কাব্যপ্রতিভা পাশ্চাত্যের জ্ঞানী-গুণীদের কাছে পরিচিতি লাভ করে।

পাশ্চাত্যে ইকবাল-চর্চা ও জনপ্রিয়তা

ইউরোপের প্রবাস জীবনে (১৯০৫-১৯০৮) ইকবালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। প্রফেসর টর্মাস আরনল্ডের প্রিয় ছাত্র হিসেবে তাঁর পরিচিতির পথ আরো সুগম হয়। তাই আমরা দেখি, মাত্র তিন বছর ইউরোপ থেকে তিনি বিপুল সম্মান ও সম্মাদর লাভ করেন। সে সময় প্রাচ্য কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মধ্যে ইকবালের সমাদর সবার শীর্ষে স্থান পায়। ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের পর তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি (১৯০৭-১৯০৮)-তে প্রফেসর হিসেবে সাময়িকভাবে নিয়োজিত হন। ১৯৩৫ সালে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েও অসুস্থতার জন্য যোগ দান করতে পারেননি।

লন্ডনে ১৯০৮ সালে তাঁর থিসিস Development of Metaphysics in persia ১৯২০ সালে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আর. এ. নিকলসন কর্তৃক 'আসরারে খুদীর অনূদিত Secrets of Self ১৯৩৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন থেকে `The Reconstruction of Religious Thouth in Islam' প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্যের চিন্তা-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁর খুদী-দর্শন পাশ্চাত্যের জড়বাদী মান৫৫৫৫৫২০৩+স এক নবতর জীবনবোধের সন্ধান দেয়। তাঁর মননশীল সাহিত্য তাদের চিন্তাকর্ষণ করে।

ইকবালের মৃত্যুতে প্রাচ্যবাসী যেমন ব্যথিত হয়েছিলেন তেমনি পাশ্চাত্যবাসীও শোকাহত হয়েছিলেন। বৃটেন, ওয়াশিংটন ও জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইকবাল

www.pathagar.com

সোসাইটি। পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারার উপর প্রথিতযশা লেখকদের বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের বিবরণ পেশ করছি :

১. জার্মান ভাষা : Mohammad Iqbal and welt des Islam (Koln 1959) by Baymirza Hayit.

২. ফিনিশ ভাষায় : Muhammad Iqbal (Helsinki, Finland 1954) by Henri Broms.

৩. ফরাসী ভাষায় : Luce-claude Maitre লিখিত Introduction a la pensee d' Iqbal (parsia 1955)

৪. Dictionary of National Biography (1931-1940)-তে Iqbal শীর্ষক Sir H. A. R. Gibb এর লেখা প্রবন্ধ (Oxford university press, 1950) প্রকাশিত।

৫. Iqbal : His Art and Thought- S. A Vahid, ১৯৫৯ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ইকবাল সাহিত্যের অধিকাংশই অনূদিত হয়েছে। ষাটের দশক পর্যন্ত যেসব বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, এর একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :

ইংরেজি ভাষায় :

1. Secrets of Self : Dr. R. A. Nicholson 'আসরারে খুদী'র অনুবাদ : ১৯২০ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

2. Mysteries of Selflessness : A. J. Arberry 'রুমূযে বেখুদীর অনুবাদ : ১৯৫৪ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

3. Poems of Iqbal : V. S. Kiernan. জরবে কলীম থেকে নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ : ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

4. Notes on Iqbal's Asrar-i-Khudi : Arthur j. Arberry, আসরারে খুদীর ভাষ্য। ১৯৫২ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

5. Poems of Iqbal : Dr. H. T. Sorle, Aberdeen University press থেকে ১৯৫৩ সালে মুদ্রিত হয়। বাঙ্গে দরা কাব্যের নির্বাচিত ২১ টি কবিতার অনুবাদ।

6. The Tulip of Sinai : prof A. J. Arberry (London 1947) পয়ামে মশারিক-এর অনুবাদ।

7. Persian Psalms : A. J Arberry যবুরে আজম-এর ইংরেজি অনুবাদ। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

ইতালি ভাষায় :

1. II poems celeste by Alssandro Bausani (Roma 1952)

2. II Modernisme Musulmano dele indiano sir Mohammad Iqbal. (Roma 1939).

উল্লেখ্য যে এখানে সংগৃহীত তথ্য ষাটের দশক পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের তালিকা দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ইকবালের আরও বই নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইকবালের কাব্য-চর্চা ও স্বীকৃতি

১৮৯৬ সালে ছাত্রাবস্থায় সিয়ালকোটের কবিতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের পর থেকে ইকবালের মন-মানসিকতা কাব্য-চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তা দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে। এরপর থেকে তিনি রীতিমতো কাব্য-চর্চা করতে লাগলেন। একদিন হায়দরাবাদের উর্দু কবি দাগের কাছে কতগুলো কবিতা ও গজল সংশোধনের জন্য পাঠালেন। কবি দাগ এগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেন। তারপর ছোট একটি মন্তব্য লিখে পাঠালেন, 'এ কবিতাগুলো সংশোধন করার কোন অবকাশ রাখে না, এগুলো কবির স্বচ্ছ মনের সার্থক, সুন্দর ও অনবদ্য ভাব প্রকাশের পরিচয় দিচ্ছে।' এ মন্তব্য পেয়ে ইকবাল খুশিতে আটখানা। স্বনামধন্য কবির মন্তব্যে তাঁর উৎসাহ আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তিনি আরো গভীরভাবে কাব্য-চর্চায় মনোনিবেশ করলেন।

তাঁর কবিতায় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা ছিল ব্যাপক। স্বদেশ প্রেম, মুসলিম উম্মাহর প্রতি মমত্ববোধ, বিশ্বনবীর আদর্শ, প্রেম ও ইসলামের শাশ্বত সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থার গুরুত্ব, কুরআনের শিক্ষা ও হাদিসের আলোকে মুসলিম জীবনের মুক্তি, কল্যাণ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। তৌহিদের স্বরূপ ও প্রকৃতি। মুসলিম বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণের দিক-নির্দেশনা। বিশ্বনবীর আদর্শের বাস্তবায়ন ও তাওহীদ ভিত্তিক বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, মুসলিম জাতির উত্থান-পতন, দলীয় কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর কবিতা ছিল অতুলনীয়। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে তিনি বেলালী সুরে আহ্বান জানাতেন ক্লান্তি হীন ভাবে। স্বকীয় আদর্শের সন্ধানে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

ইকবালের কাব্যে চিরন্তন আবেদন ও আবেগ রয়েছে বলেই অতি অল্প সময়েই তিনি বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সবার যে সম্মান পেয়েছেন-তা ইতিহাসে বিরল। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের একজন হিন্দু অধ্যাপক তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'মুসলমানগণ ইকবালকে লক্ষ বার তাদের সম্পদ বলে দাবী করতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন ধর্ম বা শ্রেণি-বিশেষের সম্পদ নন; তিনি একান্তভাবে আমাদেরও।'

www.pathagar.com

১৯০১ সাল। এপ্রিলের এক শুভ সকাল। তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু পত্রিকা 'মাখযান'-এর বিশেষস্থানে তাঁর 'হিমালাহ' কবিতা প্রকাশিত হয়। ইকবাল তা দেখে অশেষ খুশী হন। এতে তাঁর উৎসাহ উত্তরোত্তর বেড়ে যায়।

আল্লামা শিবলী নু'মানী, আলতাফ হুসাইন হালী, আকবর এলাহাবাদী প্রমুখ খ্যাতিমান কবির পথ অনুসরণ করেই ইকবাল অসংখ্য কবিতা ও গজল রচনা করেন। সহজভাবে বলতে গেলে, তাঁদের মতবাদের অপূর্ণভাবে ইকবাল পরিপূর্ণতা দান করেন।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ড. আল্লামা ইকবাল বেশ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তিনি মুসলিম জাতির আদর্শিক উন্নতি, আধ্যাত্রিক, নৈতিক জাগরণের লক্ষ্যে ব্রিটিশের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীতে বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনের আলোয় আলোকিত যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলিম জাতির দিক-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী এবং তিনি এতেও সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর রচিত পুস্তক 'আল-ইলমুল ইকতেসাদ' উর্দু ভাষায় অর্থনীতির উপর প্রথম পুস্তক। এটি ১৯০৩ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়।

তাঁর পড়ার ঘরে রাশি-রাশি বই পুস্তক এখানে সেখানে ছড়ানো-ছিটানো থাকতো। তত্ত্বাবধানকারী এগুলো গুছিয়ে রাখতে চাইলে তিনি বাধা দিতেন এবং বলতেন, 'বইগুলো এলোমেলো থাকলেই এক সময়ে অনেকগুলো বই দেখতে পাই। আর গুছিয়ে রাখলে চোখের আড়াল হয়ে যাবে। তখন আমার মন অস্থির হয়ে উঠবে।'

একদিনের ঘটনা। গভীর রাতে ইকবাল কবিতা লিখছেন। লাহোরে ভূমিকম্প চলছে। চারদিকে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। ঘর-বাড়ি ভেঙে চুরমার। ইকবালের সেদিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি শুধু লিখেই যাচ্ছেন। বাইরে কি ঘটছে, সে সম্পর্কে বে-খবর। তত্ত্বাবধায়ক আলী বখশ পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করছে। আর চীৎকার করছে, 'ভূমিকম্প। ভূমিকম্প!!' ইকবাল এতক্ষণে টের পেলেন। আলীকে বললেন, 'ছুটোছুটি করো না; বরং সিঁড়ির উপর নীরবে দাঁড়িয় থাকে।' এতটুকুই বলে তিনি আবার লেখার কাজে মগ্ন হয়ে পড়লেন। আল্লাহ্র রহমত। সেদিনের ভূমিকম্পে চারদিকে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও তাঁর আশেপাশে কোন ক্ষতি হয়নি।

আল্লামা ইকবাল বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁর অমর কাব্য আমাদেররেক বিশ্বনবীর আদর্শ ও কুরআনিক শিক্ষার মাহত্বে উজ্জীবিত করে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য প্রেরণা দান করে।

www.pathagar.com

তিনি সুফি কবি ও দার্শনিক হিসেবে মুসলিম উম্মাহর একজন যুগের নকীব ও সফল সংস্কারক রূপে আবির্ভূত। তাঁর কাব্যের চিরন্তন ও শাশ্বত আহ্বান চিন্তাশীল মানুষের চিত্ত স্পর্শ করে আল্লাহর প্রেম ও নবীর মহব্বতের দ্বারা আলোকিত জীবনের সন্ধান দান করে। তাঁর সুদীর্ঘ কালের কাব্যকে তিন ভাগে ভাগে করা যায়।

এক. ছাত্র-জীবন থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত জাতির উত্থান পতনের কারণ নির্ণয় ও জাতিভেদের অবসান কামনা এবং মুসলিম মিল্লাতের চিন্তাশক্তির জাগরণ।

দুই. ১৯০৫-১৯০৮ সাল পর্যন্ত দেশাত্মবোধ, ধর্মতত্ত্ব জ্ঞান, প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত জীবন ও মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিক-নির্দেশনা প্রদান।

তিন. ১৯০৮-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ইসলামের দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সুফিতত্ত্ব, বিশ্বনবীর আদর্শের অনুসরণীয় দিক ও ইসলামের শাশ্বত আদর্শ প্রতিষ্ঠার আহ্বান এবং মুসলিম জাতির অগ্রগতির প্রেরণাদায়ী কাব্য রচনা।

কর্ম জীবনে সততার দৃষ্টান্ত

১৯০৮ সালের ২২শে অক্টোবর থেকে তিনি লাহোরে ব্যারিস্টারী শুরু করেন। কয়েক বছর পর থেকে লাহোরে সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তাছাড়া লাহোরে গভর্নমেন্ট কলেজে (নৈশ বিভাগ) অধ্যাপনাও করেন।

কর্মজীবনে পদার্পণ করার পর ইকবাল কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন। এ সময় সাধারণত জ্ঞান সাধনা, সুফি ধ্যান, মোরাকাবা-মোশাহাদা, জিকির আযকারসহ গভীর রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করে কাটাতেন।

সরলভাবে জীবন যাপন ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। দিনে একবার মাত্র সামান্য আহার গ্রহণ করে কোর্টে চলে যেতেন আর রাতে শুধু এক পেয়ালা লবন–চা পান করে কলেজে যেতেন।

আইন ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ। অন্যায়-অসত্য মামলা গ্রহণ করতেনই না, উপরন্তু মজলুমের পক্ষে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন। আইনের মারপ্যাঁচে জালিমকে কখনও সাহায্য-সহযোগিতার প্রশ্রয় দিতেন না। কারণ তিনি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, মানুষের বিন্দুমাত্র অন্যায়ের জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। জীবনে কোন প্রলোভনই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। পরিমিত ব্যায়ে চলার উপযোগী টাকা পেলে তিনি নতুন মামলাই গ্রহণ করতেন না।

১৯২৬ সালে বিখ্যাত ডুমরাও রাজ মামলায় বাংলার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে দু'মাসের জন্য পাটনায় আসেন। তাঁর

www.pathagar.com

কাজ ছিল বিচারকের সামনে অর্থ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে ব্যাখা দান করা। তাঁর দৈনিক সম্মানী ছিল এক হাজার টাকা– দু'মাসে ষাট হাজার টাকা। ড. ইকবাল এসেই মামলার সমুদয় কাগজপত্র দেখলেন। মাত্র দু'দিনের খসড়ায় তাঁর মতামত পেশ করে আদালতে দাখিল করলেন এবং লাহোরে চলে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয়, দীর্ঘদিনের ঝুলন্ত মামলা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ইকবাল ইচ্ছে করে অযথা বিলম্ব না করে তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ করে দিলেন। গড়িমসি করে বিলম্ব করলে তাঁরই লাভ হতো। কারণ দৈনিক হাজার টাকা সম্মানী সে সময়ে ছিল বিরাট ব্যাপার। টাকার প্রতি যে তাঁর লোভ ছিল না, এটা তার প্রমাণ। অসহায় গরীব লোকের মামলা তিনি বিনা পয়সায় করে দিতেন।

আল্লামা ইকবালের ডক্টর অব লিটারেচার ডি, লিট, স্যার উপাধি ও সম্বর্ধনা সভা

মুসলিম জাগরণের মহাকবি ড. আল্লামা ইকবালের কাব্যের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এমন একজন কৃতি সন্তানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন সম্মান দেয়া হয়নি দেখে পাঞ্জাবের সাবেক শাসনকর্তা স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান বিস্মিত হন। তিনি এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইকবাল যখন ইয়োরোপে শিক্ষা ও অধ্যাপনার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তখন বিশ্বখ্যাত দার্শনিকদের নজরে আসেন। এ সময় পাশ্চাত্য দার্শনিক ও মনীষীদের অন্যতম ড. আর. এ নিকলসন ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অন্যতম মনীষীদ্বয় তাঁর দার্শনিক উক্তি, ধর্মতত্ত্ব, প্রজ্ঞাতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক সুফিতত্ত্ব, বিশ্বনবীর হাদিসের গুঢ়তত্ত্ব ও কুরআনের শিক্ষার আদর্শ ধারায় উজ্জীবিত জীবন ব্যবস্থার দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী রচনা ও কাব্যের ভূঁয়সী প্রশংসা করেন। পাশ্চাত্যে ইকবালের জ্ঞানের পরিচিতি পায় ড. আর. এ নিকলসনের লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তিনি আল্লামা ইকবালের 'আসরারে খুদী' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের পর থেকে ইংল্যান্ডে ইকবালের দর্শন আলোড়নের ঝড় তোলে। ইকবাল প্রতিভা সম্পর্কে মুসলমানদের পূর্বে ইয়োরোপবাসী জানতে পারেন। ইকবালকে নিয়ে যখন পাশ্চাত্যে হৈচই অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ১৯২২ সালে ইকবালকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। দীর্ঘ দিন পর তিনি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেলেন। তাঁর এ সৌভাগ্যের সংবাদ শুনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই খুশী হলেন।

অন্যদিকে ইকবাল 'স্যার' উপাধি গ্রহণ করতে রাজী নন। তিনি সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন— 'আমাকে স্যার উপাধি দিতে গেলে পূর্বাহ্নে আমার উস্তাদ মাওলানা সাইয়েদ মীর হাসানকে 'শামসুল উলামা' (আলেম গণের সূর্য)

উপাধি দিতে হবে। অবশেষে সরকার বাধ্য হয়ে তাঁর দাবী 'নীতিগতভাবে মেনে নিলেন' এবং যথারীতি তাঁর প্রিয় উস্তাদকে 'শামসুল উলামা' উপাধিতে ভূষিত করার পর ইকবাল তাঁর 'স্যার' উপাধি অনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন।

ইকবাল প্রভিতা যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আলোচিত ও বেগবান স্রতের ন্যায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে এমন সময় তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর কারণে বিশ্বের নানা দেশে তাঁর ভক্ত অনুরাগীগণ মহাখুশী হয়ে কবিকে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। জ্ঞান ও গুণের কদর সবার কাছে সমান। জার্মানী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, মিসর, তুরস্ক, ইরান, তুর্কীস্থান ও আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে তাঁর ভক্তবৃন্দ লাহোরে ছুটে আসতে লাগলো তাদের উদ্দেশ্য, শুধু প্রাণপ্রিয় কবিকে অভিনন্দন জানানো এবং তাঁর দর্শন লাভ করা।

মুসলমানদের মতো শিখ ও হিন্দুরাও ইকবালকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। তাঁর সাহিত্য সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ এ তিন জাতির পক্ষ থেকে লাহোরের বাসিন্দারা সাড়ম্বরে তাঁকে সম্বর্ধিত করে যোগ্য মর্যাদার আসনে সমাসীন করেন। পাঞ্জাব ও লাহোরের হাজার হাজার লোক উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের পদস্থ কর্মকর্তা, লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবিরাও তাঁদের প্রাণপ্রিয় কবিকে সম্মান জানানোর জন্য উপস্থিত হন। ইকবাল সেখানে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

ব্রিটিশ সরকার থেকে 'স্যার' উপাধি পাওয়ার পর সমালোচকরা ইকবালের সম্পর্কে নানা মন্তব্য করতে লাগলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ ও ভারতীয় মুসলিমদের প্রেরণাদায়ী কাব্যের অগ্নিঝরা বক্তব্যকে স্তব্ধ করার জন্য একটা চক্রান্তের জাল বুনেছে। কিন্তু ইকবাল ছিলেন মুসলিমদের এক আদর্শবাদী মহান প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল দেশপ্রেমিক। তিনি জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়দের জন্য বৃটিশদের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ থেকে কখনও সরে দাঁড়াননি। এবং আজীবন মুসলিম জাতির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তবুও অনেকে বলতে লাগলো, 'অবশেষে ইকবালও কী করবে? পদলোভ ত্যাগ করা এত সহজ নয়।' আরও কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছে—'স্যার' উপাধিতে ইকবালের বিপ্লবী চিন্তাধারার অপমৃত্যু ঘটলো।' ইকবাল এসব অপবাদ নীরবে শুনে শুনে সময়-সুযোগে জওয়াব দেওয়ার অপেক্ষা করছিলেন।

তাঁর সম্মানে পাঞ্জাবে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় তেজোদীপ্ত কণ্ঠে এ ভুল ধারণার অপনোদন করলেন তিনি। উক্ত সভায় পাঞ্জাবের গভর্নরও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ইকবাল কয়েকটি মূল্যবান কবিতা আবৃত্তি করেন, যা তুলূয়ে ইসলাম' গ্রন্থের শুরুতে সংকলিত হয়েছে। তিনি নিজের দিকে ইঙ্গিত করে

www.pathagar.com

বলেছিলেন, 'দুনিয়ার কোন শক্তি শত চেষ্টা করেও আল্লাহ্‌র দীনের প্রচার ও প্রসার দমিয়ে রাখতে পারবে না।'

১৯৩৩ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি মহাকবি ইকবালকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৬ সালে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিও তাঁর জ্ঞান সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ডি.লিট. ডিগ্রী প্রদান করে ভূষিত করেন। অনুরূপভাবে ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি তাঁকে ডি.লিট. ডিগ্রী প্রধান করে।

www.pathagar.com

রাজনীতির ময়দানে মহাকবি আল্লামা ইকবাল

পাঞ্জাবের আইন সভায়

পাঞ্জাব তথা ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা ছিল তখন অত্যন্ত নাজুক। তাদের সপক্ষে কথা বলার তেমন কেউ ছিল না। হাতে গোনা কয়েকজন নেতা দুর্দশা কবলিত এ জাতির মুক্তির জন্য চিন্তা ভাবনা করতেন। মুসলমানদের স্বাধিকার আদায় ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী প্রমুখ অন্যতম। তন্মধ্যে আল্লামা ইকবাল ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ও আন্দোলনের দিক-নির্দেশক।

ইকবালের ইচ্ছে ছিল, মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদে সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নির্বাচিত হন। ১৯২৪-১৯২৮ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর একনিষ্ঠভাবে দেশ ও দশের সেবা করেন। মুসলমানদের উন্নতি ও মুক্তির জন্য তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। দেশের দুঃখ-দুদর্শার জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতো। ব্রিটিশের গোলামীর জিঞ্জীরে আবদ্ধ মুসলিম জাতির ভাগ্যোন্নয়নই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

আইন পরিষদ সর্বদা চাষী ও মজুরদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। প্রয়োজনে তিনি সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করতেন। এতে ক্ষমতাসীনদের ভিত কেঁপে উঠতো। পাঞ্জাব সরকারের আয়কর ও ভূমিকর নীতির বিরুদ্ধে তিনি তৎকালীন রাজস্ব সচিব স্যার ফজলি হোসাইনের সাথে বাক্যুদ্ধে লিপ্ত হন। অবশেষে ইকবালের উপস্থাপিত যুক্তিতে সচিব হেরে গেলেন। ইকবালের দাবী-দাওয়া মাথা পেতে মেনে নিলেন। সে সময়ে আর যাই হোক, যে কোন শাসককে ইকবালের সাথে আলোচনা করতে একটু সমীহ করতো হতো। তাঁর যুক্তির কাছে অন্য কোন যুক্তি হার মানতে বাধ্য হতো। ইকবাল এভাবে আজীবন মজলুমের পক্ষে জালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্যয় ইকবালের অন্তরকে আন্দোলিত করে তোলে।

www.pathagar.com

তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে মুসলিম মিল্লাতের মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ইকবাল অধঃপতিত দেশ ও ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত, উন্নত ও নতুন কর্মোদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করার সংগ্রাম সাধনার জন্য বিজাতীয় সংস্কৃতি পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এ ছিল ব্রিটিশ সরকারের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ।

১৯০০ সালে লাহোর 'আঞ্জুমান হেমায়েতে ইসলাম'-এর সভায় 'নালায়ে ইয়াতীম'—ইয়াতীমের আর্তনাদ' শীর্ষক যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, সমগ্র ভারতের বিদগ্ধ সমাজকে সে কবিতা দারুণভাবে আলোড়িত করে তোলে।

১৯১০-১৯১১ সালের ইতিহাস বিশ্বমুসলিমের জন্য কারবালায় ইতিহাস। বলকান ও ত্রিপলীর মুসলমানদের রক্তের বন্যার স্রোত ইকবালের মর্ম স্পর্শ করে। সেখানকার ইসলামী খিলাফতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার আশঙ্কায় ও শোকে তিনি জ্বালাময়ী কবিতা ও গজল দিয়ে মুসলিম বিশ্বে জাগরণ সৃষ্টি করলেন। মুসলমানরা তাঁর কবিতা গজল শুনে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে। ১৯১১ সালে ৬ অক্টোবর তিনি লাহোর শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে 'খুনে শহীদা কী নজর' নামে যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন তা অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ কবিতা শ্রোতৃবৃন্দের কান্নায় চোখ ভাসিয়ে দিল।

পরবর্তীতে উক্ত বক্তৃতাবলি সংকলিত হয়ে The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam নামে পুস্তকাকারে ১৯৩১ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়। বইটি সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি তাঁর অনবদ্য রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উক্ত বইটির বাংলা অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' নামে প্রকাশিত হয়।

ইকবালের রাজনৈতিক চেতনার পেছনে কুরআন-হাদিস, ইমাম আল-গাজ্জালী, আল-রাযী, মাওয়ার্দী, নিজামুল মুল্ক তূসী, ইবনে হাজম ও ইবনে খালদূনের চিন্তাধারা দারুণ প্রভাব বিস্তার করে।

১৯২৮ সালে তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে পর্যায়ক্রমে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতাগুলোর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

১. জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা মুসলিম জাতির জাগরণ ও প্রেরণাদায়ী চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

২. দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকপাত করা।

www.pathagar.com

৩. আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম সম্পর্কে মুসলমানদের সঠিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভের মাধ্যমে বিশ্বনবীর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

৪. মানুষের খুদী : তার আযাদী ও অমরতা সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধির দ্বারা ইহলৌকিক উন্নতি, পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করা।

৫. মুসলিম তমদ্দুনের মর্মকথা, কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ এবং বিশ্বনবীর জীবন চরিত থেকে মুসলমানদের এগিয়ে চলার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।

৬. ইসলামী ব্যবস্থায় গতিশীলতার নীতি ও আদর্শ দ্বারা জীবনকে আল্লাহ্ ও রাসুলের পথে পরিচালিত করা।

৭. ধর্ম কি সত্য? ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ও মানব জীবনের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে সত্যের বাস্তবায়ন করা।

সেখানকার জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবি মহলে তিনি বিপুল সম্মান ও রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভ করেন। দূর দূরান্ত থেকে হাজার-হাজার মানুষের ঢল নামতে থাকে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে। এই প্রাণপ্রিয় কবিকে এক নজর দেখার জন্য ও অভিনন্দন জানানোর জন্য লোকে লোকারণ্যে পরিণত হয়। এভাবে ইকবালের চিন্তাধারা দিন দিন প্রসারিত হতে লাগলো। জাতীয় জীবনের এ যুগ সন্ধিক্ষণে এমন একজন প্রতিভাশালী দার্শনিক কবির আবির্ভাব সত্যিই আল্লাহ্র অপার রহমত। কবি ইকবালের জ্বালাময়ী কবিতায় মুসলিম মিল্লাতের মৃত ধমনী সক্রিয় হয়ে ওঠতে লাগলো। তিনি বিশ্বনবীর আদর্শ, কুরআনের শিক্ষা ও ইসলামের শাশ্বত সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ব মুসলিম জাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বিশ্বের নানা ধর্ম ও জাতির সম্পর্কে ইকবাল ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন। দর্শন ও ধর্মের নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল সুস্পষ্ট। মুসলিম জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তাঁর দিক-নির্দেশনা, পরামর্শ ও প্রেরণাদায়ী বক্তৃতা হৃদয়ের গভীর অনুভূতি আন্দোলিত করে।

আল-কুরআনের ভাষায় : 'যে জাতি নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, আল্লাহ্ও তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না।' আল্লামা ইকবাল এ আয়াতটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ইসলামের আইন-কানুন, বিশ্বনবীর আদর্শ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ইসলামী তমুদ্দুন, ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে ব্যয় করেছি। আমার মনে

www.pathagar.com

হয়—ইসলামের এসব মূল বিষয়ের সাথে আজীবন সম্পর্কের কারণে আমার জ্ঞানভাণ্ডার যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে, তার ফলে বিশ্বজনীন সত্য হিসেবে ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে এ ধরনের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি।'

ইকবাল ইসলমাকে নিছক ধর্মানুষ্ঠান মনে করতেন না। বরং এটাকে তিনি পূর্ণাঙ্গ ও মানব জাতির জন্য একমাত্র বিধান বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। নবীর মহব্বত ও ভালোবাসাকে হৃদয়ে ধারণ করে মুসলমানরা যেন আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে ইবাদত-বন্দেগী ও সকল কর্মে আত্মনিয়োগ করে ইকবাল তাদেরকে জোর আহ্বান করেছেন। মানব জীবনের কোন দিকই ইসলামের দৃষ্টির বাইরে নয়। তাই তিনি ইসলামী শিক্ষা ও বিশ্বনবীর আদর্শকে জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে মনে করতেন। ধর্মকে তিনি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁর অমূল্য চিন্তাধারা কেবল প্রাচ্য দেশসমূহ নয়। বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই বিপ্লবাত্মক পরির্বন এনে দিয়েছে।

একবার ইকবালের সাধ বাস্তবায়িত হওয়ার পদক্ষেপ শুরু হলো। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে পুনর্গঠিত হলো 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ।' ভারতবর্ষে ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন ও ভাবাদর্শে মুসলিম বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এলেন। তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে চলতে লাগলো মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। নেতৃবৃন্দ একাত্ম হয়ে প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইকবাল তাঁদেরকে পরামর্শ দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতেন।

মুসলমানদের মনে আশার সঞ্চার হলো। এবার বুঝি সুবহে সাদিকের আলোর রেখা ফুটে উঠবে। হারানো রাজনৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধার হবে। ব্রিটিশ বেনিয়াদের হাত থেকে বাঁচা যাবে। সারা ভারতে মুসলিম লীগের তৎপরতা জোরদার হয়ে উঠলো।

১৯৩০ সালে ইকবাল মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি মুসলমানদের জন্য একটা স্বাধীন আবাসভূমির দাবী করেন। মুসলিম লীগের এখন শুধু একটি মাত্র দাবী, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন মুতাবিক চলতে পারবে এবং দেশ পরিচালনা করতে পারবে। এ বছর এলাহাবাদে 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে'র বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আল্লামা ইকবালের সভাপতির ভাষণটি ছিল ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে বক্তৃতাদানের মাধ্যমে ইকবাল মুসলমানদের স্বাধীন সার্বভৌম ভূখন্ডের রূপরেখা সম্পর্কে মতামত দান করেন। তিনি বলেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে মুসলমানরা সকল দিক থেকে বঞ্চিত ও পিছিয়ে রয়েছে। এখানে মুসলমানদের

www.pathagar.com

শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে বৈরি পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আর মুসলমানগণও নিজেদের অলস মনোবৃত্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ থেকে মানসিক দৈন্যতার কারণে পিছিয়ে পড়েছে। তারা ধর্মচর্চার ক্ষেত্রেও তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। সবকিছুর মূলে ব্রিটিশদের শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের সাথে মুসলমানদের শিক্ষা, নীতি, আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার বৈপরীত্যের কারণে তারা ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। কারণ মুসলমানগণ তাদেরকে কখনও আপন ও নিজেদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যদিকে মুসলমানরা তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যেমন আধুনিক হতে পারেনি তেমন আধুনিক শিক্ষাকে হিন্দুদের মতো গ্রহণ করতে পারেনি। যার ফলে ব্রিটিশ প্রশাসনিক কার্যে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগও জুটেনি। আর মুসলমানরাও কখন তা চায়নি। যে যোগ্যতা ও শিক্ষা দরকার সে শিক্ষা ও যোগ্যতাও মুসলমানদের ছিল না, কারণ এই শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ নির্ভরশীল। এখানে খুব কম মুসলমানের পড়ার সুযোগ ছিল। আর ব্রিটিশরাও কখনও মুসলমানদের বন্ধু মনে করতে পারেনি। তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য হিন্দুদের কাছের মানুষ ভেবেছে। অন্তত মুসলমানদের চাইতে তাদেরকেই অপেক্ষাকৃত আপন মনে করেছে। আর হিন্দুরাও নিজেদের উজাড় করে দিয়ে ব্রিটিশ শিক্ষা, নীতি ও আদর্শকে নিজেদের উন্নতি ও অগ্রগতির হাতিয়ার হিসেবে নিয়ে অনুকূল আচরণ করেছে এবং সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবেই তারা ব্রিটিশদের আনুকূল্য পেয়েছে কিন্তু মুসলমানরা নানা ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছে। এতে মুসলমানদের যেমন মানসিক দৈন্যতা ছিল তেমন ব্যর্থতাও ছিল চোখে পড়ার মতো। আর প্রশাসনিক নীতি, আদর্শ ও ব্যবস্থাও ছিল তাদের প্রতিকূল। তাই মুসলমানদের আলাদা ভূখন্ডের প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য।

এভাবে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের প্রতি আল্লামা ইকবাল পকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে মতামত প্রদান করেন। এখানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমুখকে ইকবাল সার্বক্ষণিক পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বস্তুত ইকবাল না থাকলে পাকিস্তান আন্দোলন এতখানি সফলতা লাভ করতো না। ইকবাল ছিলেন রাজনীতির দার্শনিক আর অন্যরা ছিলেন শুধু রাজনীতিক। তাই বলতে হয়, পাকিস্তান আন্দোলন ইকবালের কাছে একান্তভাবে ঋণী। কিন্তু আল্লাহ্র এমন এক মর্জি যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মহতী উদ্যোগ ও আন্দোলন সফল হওয়ার আগেই মুসলিম জাগরণের এই মহাকবি দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেন। তাঁর ইন্তেকালে আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলিম লীগের আন্দোলন সফল হয় এবং দক্ষিণ-

www.pathagar.com

পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে আল্লামা ইকবালের স্বপ্নের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলেও তাঁর আদর্শের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ আলী জিন্না সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। কারণ আল্লামা ইকবাল ভারতবর্ষে এমন এক আদর্শিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে উপমহাদেশের সমস্ত মুসলমান একাত্ম হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, শিল্প-সংস্কৃতি-সভ্যতা, শিক্ষা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সমৃদ্ধশীল আধুনিক রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করতে পারে। কিন্তু ইকবালের অবর্তমানে প্রতিষ্ঠিত তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই হীনস্বার্থ ও মানসিকতার কারণে ব্রিটিশের শাসন নীতিরই অনুসরণ করে। ফলে ইকবালের আদর্শচ্যুত জিন্নার পাকিস্তান দুটি অংশে ভাগ হওয়ার সূত্রপাত ঘটে। অন্যদিকে আরেকটি কারণও পূর্ব থেকেই সংগত ছিল। যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সার্বক্ষণিক আন্দোলনে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তারা পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী উর্দু ভাষী। তারা আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান অংশকে সমৃদ্ধশীল ও বড় করতে। সংগত কারণে তারা বাংলার প্রতি নজর দেননি। আর ব্রিটিশরা তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির সুযোগ যেমন নিয়েছে তেমন ভারতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দও ব্রিটিশের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে তাদের নিজেদের স্বার্থে। তাই পাকিস্তান ভাগের সময় পশ্চিম অংশের নেতৃবৃন্দ পূর্ব অংশের অর্থাৎ বাংলার স্থল সীমান্তের প্রতি নজর না দিয়ে সংকীর্ণ মানসিক দৈন্যতার কারণে তারা পাঞ্জাব ও কাশ্মির অংশের প্রতি নজর দেয় এবং বাংলাভাষী মুসলমান নেতৃবৃন্দের থেকে নিজেদের আলাদা মনে করে। এখানে আরেকটা কারণও ছিল তারা আগে থেকেই নির্ধারণ করেছিল তারাই পাকিস্তান শাসন করবেন। তারা অন্তরিকভাবে পশ্চিম অংশের করাচীকে রাজধানী করতে পূর্ব অংশ বাংলার প্রতি উপেক্ষার নীতি গ্রহণ করেছিল। মুসলমান হলেও তারা বাঙ্গালীদের প্রতি মুসলমানের নীতি ও আদর্শ প্রদর্শন করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। তারা বাংলা ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলিমদের জীবনকে ভারতীয় সনাতনপন্থীদের সাথে একাত্ম মনে করেছিল। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্নে তারা বাংলার স্থল সীমান্তের তোয়াক্কা করেনি। পশ্চিম ও পূর্ব মিলে বৃহত্তর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন স্থল সীমান্ত ছিল না। অনেকে বলে এটা ব্রিটিশের চাল কিন্তু ব্রিটিশের চাল থাকলেও পাকিস্তান কায়েমের নেতৃবৃন্দরা করাচীকে রাজধানী এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মিরের অংশ নিয়ে অর্থাৎ তাদের অংশের প্রতি নজর দিয়েছিল। এতে হিন্দু নেতৃবৃন্দও ব্রিটিশের সাথে একমত হয়ে নিজেদের স্বার্থে স্থল সীমান্ত রাখতে চায়নি। কিন্তু তাই বলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না কারণ এই সুযোগটা আমাদের থেকেই তৈরি

www.pathagar.com

হয়েছে। যাইহোক তারা কখনোই ঢাকাকে রাজধানী করতে চায়নি এটা পাকিস্তানের প্রদেশ হিসেবে তারা শাসন করতে চেয়েছিল। তাই সামগ্রিকভাবে বলা যায় মুসলমান হয়েও তারা বাঙ্গালী মুসলিমদের মুসলমান ভাবতে পারেনি। সেজন্য আল্লামা ইকবালের স্বপ্নের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মুহাম্মদ আলী জিন্নার যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তা বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে আবারও আরেক ব্রিটিশের শাসন শোষণ ও বৈষম্যের শিকারে পরিণত করে। যদিও পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বাস, তবুও বাংলা ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ও বাঙ্গালী জীবন মননের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির বৈষম্য, শোষণ ও সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টি বাঙ্গালীরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে থাকে। ফলে তাদের অধিকার আদায়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের হাত ধরে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি ইকবালের জবাব

উপমহাদেশ তথা মুসলিম জাগরণের মহাকবি আল্লামা ইকবাল ছিলেন সুফি কবি, দার্শনিক ও আশেকে রাসুল। সমগ্র জীবন তিনি মুসলিম মিল্লাতের সেবায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। কিন্তু তারপরও বিরুদ্ধবাদী, গোড়াপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল কতেক আলেম তাঁর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ছিল। তারা তাঁর ইসলামী জাগরণমূলক কবিতা, সুফিতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক রচনাবলি, নৈতিক ও আদর্শিক মুসলিম হওয়ার প্রেরণাদায়ী দিক-নির্দেশনা ও সাহিত্য সাধনা নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন না। এরা চাইতো অন্যান্যদের মতো ইকবালও রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নিয়ে মাঠ-ময়দানে ঘুরে বেড়াতে শুরু করুক। তাই তারা নিজেদের মানসিক দৈন্যতার বীজ ইকবালের ভেতরে বপন করার জন্য নানাভাবে তৎপর চালাতো। যখন তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। অবশেষে কটাক্ষ করে বলতো, *'ইকবাল গোফতারে গাযী, কিরদারে গাযী নেহী'* অর্থাৎ ইকবাল তো কথার উস্তাদ, কাজের উস্তাদ নন। এভাবে তারা তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপন করে যাচ্ছিল। অর্থাৎ তারা চাইতো ইকবাল রাজনীতি করুক আর তাদেরকে মনের বাসনা পূর্ণ হোক। কিন্তু কোন গোষ্ঠীস্বার্থ ও ব্যক্তির মনোবাসনা পূরণের জন্য ইকবালের জন্ম হয়নি। ইকবালের জন্ম পুরো মুসলিম মিল্লাতের জন্য।

এরকম একদিন মাওলানা মুহাম্মদ আলী ইকবালকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি রসকিতার সুরে জবাব দিলেন :

'মাঁয় তু কাওয়াল হোঁ, মাঁয় গাতা হোঁ তোম্ নাচতো হো, কিয়া তোম্ চাহতে হোঁ কেহ্ মাঁয় ভী তোমারে সাথ নাচ্না শুরু করে দোঁ।'

সূত্র : আসারে ইকবাল : পৃ. ২৮

www.pathagar.com

—'আমি তো গায়ক, আমি গান গাই আর তোমরা সুরের তালে তালে নাচ। এখন তোমরা কি চাও যে, আমিও তোমাদের সাথে নাচি?'

এর আরও সহজ অর্থ হলো, মানুষ প্রকৃতিগত ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, মেধা ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জন্মে। সবার জন্য একই কাজ উপযোগী নয়। আল্লামা ইকবাল হয়তো সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি, তোমরাও তোমাদের দায়িত্ব পালন কর।'

পারিবারিক জীবনে ইকবাল

আল্লামা ইকবাল অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তাঁর মনে বিদ্যা-বুদ্ধির বিন্দুমাত্রও অহংকার বলতে ছিল না। তাঁর জীবনে ছিল অসংখ্য গুণের সমাহার। এসব গুণরাজি তাঁকে মহীয়ান ও গরীয়ান করে তুলেছে। সারা বিশ্বে হাতে গোনা কয়েকজন বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে তিনি একজন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর শান-শওকত ও আড়ম্বর থাকতে পারতো। কিন্তু তিনি ছিলেন এর বিপরীত।

তাঁরা বন্ধু-বান্ধব, অনুরক্তরা প্রতিদান তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে তিনি সহাস্য বদনে সবার সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ-আলোচনা করতেন। সর্বদা তাঁকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা যেত। দূরদূরান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থী ও ভক্তদের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতে তিনি মোটও ক্লান্তিবোধ করতেন না। এদের জন্য তাঁর দরবার সর্বদা উন্মুক্ত থাকতো।

ফুলের সৌরভের মতো ইকবালের চারিত্রিক মাধুর্য মানুষকে মুগ্ধ করে দিত। মুরুব্বীকে সম্মান ও ছোটদেরকে স্নেহ করা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিথ্যাকে তিনি দারুণভাবে ঘৃণা করতেন। আর সত্যকে গভীরভাবে ভালবাসতেন।

স্যার আবদুল কাদের বলেন, আল্লামা ইকবাল এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁর সাথে কেউ সাক্ষাত করলে তিনি বুঝতে পারতেন তাকে কিভাবে বুঝতে হবে। নিজে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় থাকা ও অপরকে হাস্যোজ্জ্বল রাখাই ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য গুণ।

ব্যারিস্টার মীর্যা জালাল উদ্দীন লিখেছেন : 'দৈনন্দিন জীবনে ইকবাল আমাদেরকে সাদাসিধে জীবন যাপনের শিক্ষা দিতেন। রাসুল (সা.)-এর প্রতি মহব্বত ও আদর্শ অনুসরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি। তাঁর মতো একজন আদর্শ মুমিন, চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ বর্তমান শতাব্দীতে বিরল।'

www.pathagar.com

বিশ্বনবী ও কুরআনের প্রতি ইকবালের গভীর ভালবাসা

আল্লামা ইকবাল বিশ্বনবী (সা.) এর মহব্বতকে ঈমান বলে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন এবং কুরআনের প্রতিও ছিল তাঁর হৃদয়ের গভীর প্রেম। লাহোর তিব্বিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল হেকিম মুহাম্মদ হাসান কারশী লিখেছেন: 'কুরআনুল কারিম আল্লামা ইকবালের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল এবং তিনি বিশ্বনবীর আদর্শের প্রতি অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত সবাইকে মুগ্ধ করতো। তিনি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিলাওতের সময় তাঁর চেহারায় নূরের আভা ফুটে উঠতো। কখনও উৎফুল্ল চিত্ত অথবা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে না পারলে তিনি মনে খুবই দুঃখ পেতেন। তখন রীতিমতো তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে যেত। তিলাওয়াতকালে গভীর মনোযোগ কুরআনের মর্মার্থের প্রতি নিবিষ্ট থাকতো। এমনকি অনেক সময় পৃষ্ঠায় পর পৃষ্ঠা অশ্রুতে ভিঁজে যেত। তিনি একান্ত ব্যক্তিগতভাবে যে কুরআন শরীফখানা তিলাওয়াত করতেন তা লাহোর ইসলামিয়া কলেজের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এটা তাঁর নীরব সাক্ষী।'

ব্যারিস্টার মীর্যা জালাল উদ্দিন লিখেছেন : 'আল্লামা ইকবাল কুরআনের প্রতি সব সময়ই গবেষণা ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিলাওয়াতের সময় মধুর উচ্চারণ ও অর্থের উপর ব্যাপক গবেষণা চালাতেন। নামাযের সময়ও কুরআনের আয়াত বুঝে বুঝে পড়তেন। মর্মার্থ উপলব্ধি করে আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদে ফেলতেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যার ফলে তিলাওয়াতে শ্রোতারাগণ মুগ্ধ হয়ে যেত। এটা ছিল তাঁর আল্লাহ্-প্রেম ও কুরআনের প্রতি গভীর ভালবাসার নিদর্শন। অপরদিকে নবীর প্রতি ছিল তাঁর গভীর মহব্বত। তিনি সব সময় আল্লামা শেখ সাদির রচিত নবীর জগদ্বিখ্যাত প্রশংসাগীতি (দুরুদ) 'বালাগাল উলা বিকামালীহি' পাঠ করতেন। বস্তুত বিশ্বনবীর মহব্বত ও কুরআনের বরকতেই তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন।'

মাতাপিতার ইন্তেকাল

আল্লামা ইকবাল লাহোর সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিস্টারী করার সময় ১৯১৪ সালের ৯ নভেম্বর সিয়ালকোটে তাঁর মাতা ইমাম বিধি ইন্তেকাল করেন। এর ঠিক ষোল বছর পর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ (র.) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একশ' বছর। আশি বছর বয়স থেকে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

www.pathagar.com

পারিবারিক তথ্য

আতা মুহাম্মদ ছিলেন ইকবালের বড় ভাই। আতা মুহাম্মদ ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইকবালের তেরো বছরের বড় ছিলেন। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি লন্ডনে বসবাস করতেন। ইকবালের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে তিনি বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। ইকবালের মৃত্যুর কয়েক বছর পর তিনিও ইন্তেকাল করেন।

ইকবাল দুই বিয়ে করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর ঘরে একজন সন্তান ছিল। তাঁর নাম আফতাব ইকবাল। তিনি ব্যারিস্টারী পাশ করার পর লন্ডনে আইন পেশায় লিপ্ত ছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুটো সন্তান। নাম জাভিদ ইকবাল। তিনি লাহোর হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ছিলেন ও মেয়ে মুনীরা ঝানু। তাঁর মৃত্যুকালে জাভিদের বয়স ছিল ১৪ বছর আর মুনীরার বয়স প্রায় ১০ বছর।

www.pathagar.com

বিদেশ ভ্রমণ ও বিশ্ব জ্ঞানের সন্ধানী ইকবাল

আমীর নাদির খানের আমন্ত্রণ

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ। আল্লামা ইকবালও পেশওয়ার সফর শেষে আফগান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে আফগানিস্তান পৌঁছেন। শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁকে এ আমন্ত্রণ জানান। রাজধানী কাবুলে ইকবাল রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে দারুল আমানে অবস্থান করেন। সফরসঙ্গী ছিলেন আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর রাস মসউদ ও আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী। ড. গোলাম রসুল মিহ্‌র (বার-এট-ল) ও এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হাদী হাসান যথাক্রমে ইকবাল ও ভি.সি'র প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে গিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে ইকবাল এক সাক্ষাতে আমীর নাদির খানকে সবুজ মখমল মোড়ানো এক খন্ড কুরআনুল কারিম উপহার হিসেবে পেশ করে সাশ্রুনয়নে বললেন, 'আল্লাহ্‌র বাণী এ পবিত্র মহাগ্রন্থ আপনাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে উপহার দিলাম। এর প্রতি লাইনে বিশ্বের যাবতীয় গোপন রহস্য, জীবন সমস্যার সমাধান ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি বিদ্যমান। এ গ্রন্থই আমার একমাত্র সম্বল, আমি একজন ফকীর মাত্র।'

কাবুল সাহিত্য সংসদ আল্লামা ইকবালের সম্মানে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশের সেরা কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা ইকবাল অনুষ্ঠানে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তাঁর আলোচনা সবাইকে মুগ্ধ করে।

সরকারকে শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ পেশ করে ইকবাল স্বদেশে চলে আসেন। ফেরার পথে তিনি গজনী ও কান্দাহার সফর করেন। এ সময় ইকবাল গজনীর প্রসিদ্ধ মাজারসমূহ যিয়ারত করেন এবং অলি-আল্লাগণের প্রতি হৃদয়ের প্রেম বর্ষণ ও তাদের থেকে ফয়েজ বরকত লাভে ধন্য হোন। তিনি প্রাচীন নিদর্শনাদির মধ্যে প্রসিদ্ধ সুলতান মাহমুদ গজনভী, হাকিম সিনাই (রা.), হযরত দাতাগঞ্জ বখশ (রা.) ও তাঁর পিতার মাজার যিয়ারত করেন। সফরকালে তিনি মুসাফির নামে ফারসী ভাষায় দু'টি কবিতা রচনা করেন।

www.pathagar.com

ইকবাল লাহোর পৌঁছার কয়েকদিন পর পত্রিকা মারফত জানতে পারলেন যে, দুস্কৃতিকারীদের অতর্কিত হামলায় আমীর নাদির শাহ্ শাহাদত বরণ করেছেন: ইন্না লিল্লাহি...রাজেউন। তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে ইকবাল শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং মুসলিম মিল্লাতের শুভবুদ্ধির জন্য তিনি নানা কাব্য ও গবেষণাধর্মী লেখনির দ্বারা আজীবন সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন।

প্রখ্যাত মনীষী ও জ্ঞানীদের সন্ধানে ইকবালের প্যারিস, ইটালী ও স্পেন ভ্রমণ

১৯৩২ সালে ইকবাল প্যারিসে নেপোলিয়ানের সমাধি পরিদর্শন ও সে দেশের প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিধ মেসিগণের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর সাথে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় মেসিগণ পারসিক ধর্মের সুফিতত্ত্ব ও ইসলামের সুফিতত্ত্ব বিষয়ে ইকবালের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। তাতে ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক ইলমে তাসাওউফের নানা বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। ইকবাল ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধক ও তাঁদের মারেফতের সাধনা সম্পর্কে অবহিত করেন। মেসিগণ পারস্যের সুফিতত্ত্বের একজন ভক্ত ও গবেষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ইকবালের সাথে হাফিজ, হাল্লাজ, রুমি, খৈয়াম, সাদি, জামী, আরাবী ও ফরীদুদ্দীন আত্তারের সুফিতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ বছরই তিনি ইটালী ও স্পেন সফর করেন। ইটালীতে মুসোলিনির সাথে সাক্ষাত করেন। স্পেনে সফরকালে 'দোয়া', 'মসজিদে কর্ডোভা' প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। কবিতাগুলো মুসলিম জাগরণে বিশেষ অবদান রেখেছে। তাঁর সফরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা– স্পেনের একটি প্রাচীন মসজিদে নামায আদায়। ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার পর প্রায় পাঁচ শ' বছর উক্ত মসজিদ তালাবদ্ধ ছিল। এ মসজিদের করুণ পরিণতির স্মরণে ইকবাল 'মসজিদে কর্ডোভা কবিতাটি লিখেন। এবং বিশ্ব মুসলিম জাতিকে বিশ্বনবীর আদর্শ, ত্যাগ, ধৈর্য, শৌর্য-বীর্যের সাথে কুরআনের শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলার জন্য অনুপ্রেরণা দান করেন। ইকবাল মুসলমানদের হারানো দিনের ইতিহাস, ঐতিহ্য, গৌরব ও মর্যাদার কথা স্মরণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বনবীর আদর্শ, কুরআনের শিক্ষা ও সাহাবা কিরামগণের দেখানো পথে চলার জন্য আজীবন দিক-নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন।

আন্তর্জাতিক সভা-সম্মেলনে আল্লামা ইকবাল

১৯৩১ সালের প্রথধম দিকে ইকবাল ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত মু'তমার-ই-আলমে আল-ইসলামী' (ইসলামী বিশ্ব সম্মলেন-এ) যোগদান করে ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ বছরই ইকবাল ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১

www.pathagar.com

ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর অগ্রণী সদস্যরূপে যোগদান করেন।

১৯৩২ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকেও যোগদান করেন। এর বৈঠকসমূহে আহূত প্রিন্স আগা খান ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নানা পরামর্শ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু নিজের স্বপ্নের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ইকবাল ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও আল্লামা ইকবালের স্বপ্ন ও আদর্শের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। যার ফলে পাকিস্তান পুনরায় খন্ডিত হয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

মহাকবি আল্লামা ইকবাল যেমন খুদীতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে মুসলিম জাতিকে আশার বাণী শুনিয়েছেন, তেমনি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর ইসলামী সংগীত, মরমীতত্ত্ব ও সুফি ভেদমূলক কাব্য ও প্রবন্ধের দ্বারা মুসলমানদের জাগরণী বাণী ও খোদার অপার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেছেন। তিনি নবীর প্রেম ও খোদার নৈকট্য লাভের জন্য প্রেমিক মনের গুপ্ত ও সুপ্ত বাসনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর রচিত হামদ ও নাত সংগীতের মূর্চ্ছনায়। সেখানে যে মরমী, আধ্যাত্মিক ও ইসলামের মর্মবাণী ধ্বণিত হয়েছে। তাতে নজরুলের আধ্যাত্মিক, তাত্ত্বিক ও সুফি মনের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর সেসব কাব্য, প্রবন্ধ ও সংগীতের গুপ্ত রহস্যের বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা নিয়ে আমার রচিত গ্রন্থ 'নজরুল ইসলামের মরমীতত্ত্ব ধর্মীয় দর্শন ও সুফি রহস্য বইমেলা ২০১৬ গ্রন্থ কুটির থেকে প্রকাশিত হলো। সকল ভক্ত-পাঠকগণ গ্রন্থটি আলী রেজা মার্কেট, দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

www.pathagar.com

আল্লামা ইকবালের যুগান্তকারী দর্শনতত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর যুগ সন্ধিক্ষণে বিশ্ব-মানবতা ও মুসলিম জীবন ধারায় যে বিরাট বিপর্যয় ও ধ্বংসোন্মুখ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে ইকবালের বাণী ও কাব্য এর যথাযথ সমাধান দিয়েছে। ফলে মুসলিম মিল্লাতের স্বকীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে ইকবালের মত প্রতিভাধর কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুফি ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী অল্পই জন্ম হয়েছে। তিনি আমাদের জন্য ইসলামের মর্মবাণী এমন যুগোপযোগীভাবে পেশ করেছেন, যা বিংশ শতাব্দীতে অন্য কারও দ্বারা হয়নি এবং আজও তা প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত। সে ক্ষেত্রে ইকবাল কালোত্তীর্ণ মহাকবি, দার্শনিক, সুফি ও মুসলিম জাগরণের প্রেরণাদায়ী বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মানুষের মন-মগজ আস্তে আস্তে নানাবিধ ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত হতে লাগলো। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, ডারউইন, ফ্রয়েড, মার্ক্স, লেনিন, মুসলিনি, শোপেন হাওয়ায়, হেগেল, মেকিয়াভেলী, হাকিন্স কান্ট, রুশো, নীটশে, প্লাটিনাস, স্পিনোজা, শেলি, বার্গসোঁ, ব্রাডলি প্রমুখ দার্শনিক, রাজনীতিক, সমাজ বিজ্ঞানী চিন্তানায়কদের উদ্ভাবিত মতবাদে বিশ্ব ছেয়ে গেছে। যুগ জিজ্ঞাসার জবাবে ইসলামের শাশ্বত আদর্শকে একটি অজেয় ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে পেশ করার ক্ষেত্রে ইকবাল যে অমূল্য অবদান রেখেছেন, তার জন্য তিনি আমাদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মুসলিম বিশ্ব তথা এ উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর মতাদর্শ যাদু মন্ত্রের মতো কাজ করেছে। কারণ তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন সুনিপুণভাবে এবং তাঁর কাব্য, দর্শন ও দিক-নির্দেশনামূলক রচনা মুসলিম বিশ্বকে ছাপিয়ে ইয়োরোপের দার্শনিক, গবেষক, কবি, মনীষী ও ধর্মতত্ত্ববিদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

মানুষ সম্পর্কে উপরিউক্ত দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি। কেউ বলেছেন, 'মানুষ নিয়তিরই

www.pathagar.com

পুতুল, সুতরাং তাকে যা করানো হবে, তার জন্য সে বিন্দুমাত্র দায়ী হবে না।' কেউ মানুষের যৌন সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেউ বলেছেন, 'মানুষ যতদিন বিধাতা বলে কাউকে বিশ্বাস করবে, ততদিন তার উন্নতির পথ রুদ্ধ।' ইত্যাকার হাজারো মতবাদ ও পাশ্চাত্য দর্শনকে ইকবাল যুক্তির দ্বারা খন্ডন করে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ একটি জাতি। পৃথিবীতে সে আল্লাহ্‌র খলিফা মনোনীত হয়ে এসেছে। আল্লাহ্ মানুষের ইচ্ছে ও কর্ম শক্তিকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। সে-ই ভালমন্দ জ্ঞান ও যুক্তির কৃষ্টিপাথরে যাচাই করে নিজেই বেছে নেবে। ফলে মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে শিখবে। পক্ষান্তরে আখিরাতে তার ভালমন্দের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাছাড়া যৌন ও পেটের সমস্যা বড় নয়। এগুলো পশুদের প্রধান সমস্যা। মানুষের আসল সমস্যা হচ্ছে ঈমান আক্বিদার সমস্যা, আদর্শের সমস্যা।

ইকবাল ছিলেন খুদী বা ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত একজন বলিষ্ঠ মানবতাবাদী ও মুসলিম জাগরণের মহাকবি। আসরাবে খুদীতে তিন কতই না সুন্দর করে লিখেছেন :

খুদী কো কর বুলন্দ এতনা কে হার তাকদীর ছে পহলে
খোদা খোদ বান্দা ছে পুছে বাতা তেরী রেজা কিয়া হ্যায়।

খুদী করো প্রসারিত–
            বুলন্দ এমন শক্তিমান,
(যেনো) তকদীর লেখার আগে
            খোদা তাঁর বান্দারে শুধান,
তোমার সম্মতি কিসে
            (বলো তুমি কিসে হও খুশী?
আমার নিয়ামত দেবো
            ছড়িয়ে বিপুল রাশি রাশি!) ॥

তাঁর মতে ভিক্ষুক আজীবন ভিক্ষা করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। বরং ভিক্ষার ফলে গরীব আরো গরীব হয়। খুদীও অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়। অতএব আত্মশক্তির উপর প্রত্যয় বা বিশ্বাস হারালেই মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। ধর্মকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের তথা সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। তিনি বলেন, 'শিশির কণাকে জমিয়ে নদীতে পরিণত কর আর মোমাবাতির মত নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে অন্যকে আলো দাও।'

www.pathagar.com

জীবন ও জগত সম্পর্কে এ রকম হাজারো মতবাদকে খন্ডন করে ইকবাল সমুচিত জবাব দিয়েছেন। তাঁর দর্শনের মূল উৎস ছিল আল-কুরআন ও নবীর হাদিস। তাই এক কথায় বলা যায়– ইকবাল নিছক একজন দার্শনিক, কবি, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ নন বরং তিনি ছিলেন একজন সূফি, মুসলিম মিল্লাতের একজন মুখপাত্র ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

আলীগড় ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বোম্বায়ে প্রাক্তন শিক্ষা উপদেষ্টা কে.জি সাঈয়িদানইন Ipbal's Educational philosophy (ইকবালের শিক্ষা দর্শন) বইয়ের উপক্রমণিকায় লিখেন :

পৃথিবীর কাছে একটা অভূতপূর্ব সুসংবাদ বহন করে আনবার জন্য ও নতুনতর মান স্থাপন করার জন্য এমন একজন অনন্যসাধারণ সৃজনশীল প্রতিভাধর ভাবুকের আবির্ভাব শিক্ষার্থীদের কাছে একটা প্রাকৃতিক অবদান। তাঁর চিন্তাধারা যত বেশি করে তাঁর সমসাময়িকদের কল্পনা, বোধ ও উৎসাহ আকর্ষণ করে, তত বেশি করে তার প্রভাব মানুষের কাছে একটা শিক্ষার উৎস হয়ে ওঠে।

বিশ্বে সাড়া জাগানো আল্লামা ইকবালের গ্রন্থ-পরিচিতি

'ইলমুল ইকতেসাদ' আল্লামা ইকবালের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। ১৯০১ সালে এটা লাহোরে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী নু'মানী এ বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন। বইয়ের ভূমিকায় ইকবাল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন : শ্রদ্ধাস্পদ জনাব মাওলানা শিরবী নু'মানীকে অশেক শোকরিয়া জানাচ্ছি। তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে এ বইয়ের প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উপর 'ইলমুল ইকতেসাদ' গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থার বিশদ রূপরেখা এ বইয়ে আলোচিত হয়েছে। বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

আসরারে খুদী

'আসরারে খুদী' ইকবালের একটি অনন্যসাধারণ সুফিতাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাবধারা সম্বলিত কাব্য-গ্রন্থ। এটা পারস্যের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও সুফি আল্লামা জালালুদ্দীন রুমি (রা.)-এর মসনবী শরীফের অনুকরণে ফার্সী ভাষা ও ছন্দে লিখিত। এটা ১৯১৫ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়।

খুদী অর্থ ব্যক্তিত্ব। মানুষের ব্যক্তিত্বের সমুন্নতি ও জাগরণ ইকবাল কাব্যে অনুরণিত। 'আসরারে খুদীতে' ব্যক্তিতের উৎপত্তি ও বিকাশের মূলতত্ত্বগুলো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ভাবনে গবেষণালব্ধ

www.pathagar.com

এক যুগান্তকারী দার্শনিক মতবাদ এ কাব্যে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। বস্তুবাদ ও জড়বাদী সভ্যতার উত্থানই বিপর্যস্ত মানবতার খুদীর অবমূল্যায়নে ইকবাল দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর মানসপটে অংকিত মহিমান্বিত খুদীর বৈশিষ্ট্য রূপায়নে তিনি 'আসরারে খুদী' কাব্যখানি লিখতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন জালালুদ্দীন রুমির মসনবীর অনুকরণে। দীর্ঘ দু'বছরে এটা রচনা সম্পন্ন হয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

'এটা লিখতে প্রায় দু'বছর কেটে গেল। রচনাকালে কয়েক মাসের বিরতিতে পুনরায় এ কাব্যের প্রতি ভাবাবেগে আসক্ত হয়ে পড়ি। ফলে কয়েক রবিবারে (ছুটির দিন) ও কয়েক রাত বিনিদ্র যাপন করে লেখা শেষ করেছি। যদি আরও সুযোগ পেতাম তাহলে সামগ্রিক দিক থেকে আমার এ মসনবীটি সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য লাভ করতো। এর দ্বিতীয় খণ্ডও রচনা চলছে। সেটা এর চাইতে সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বলিত হবে।'

'আসরারে খুদীতে' কবি মানবিক সত্তার বিকাশের লক্ষ্যে পার্থিব ধ্যান ধারণা বিবর্জিত তথাকথিত দর্শনকে প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এবং প্রকৃত সুফি দর্শনের রূপরেখা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাছাড়া জীবন ও জগত সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদের ভুল ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করে ইসলামী দর্শনকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। যুক্তি দর্শনের আলোকে মুহাম্মদ (সা.)-এর শাশ্বত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে রাসুল (সা.)-ই উন্নততর খুদীর (ব্যক্তিত্বের) অধিকারী। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উসওয়ায়ে হাসানার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

দর দু'আয়ে নুসরাতে তায়গে আমীন উ
কাতে' নসলে সালার্তী তায়গে উ।
দর জাহাঁ আঈন নো আগায করদ।
মসনদে আকওয়ামে পেশ দর-নোরদ।

আয কলীদে দী দর দুনিয়া কুশাদ
হামতু উ বতনে উম্মে গীতি নযাদ্
দর নেগাহে উ য়েকে বালা ও পুশ্‌ত
বা গোলামে খোবেশে বরয়েক খাঁ নুশ্‌ত ৷৷

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্যের হাত বাড়ালে
তাঁর তরবারিই 'আমীন' বলে,
প্রাচীন সাম্রাজ্যরাজিকে আনলেন তিনি

www.pathagar.com

সমাপ্তির দিকে।
দ্বার উদঘাটন করলেন তিনি নবীন বিশ্বের
ধর্মের কুঞ্জিকা দ্বারা,
বিশ্ব-গর্ভে কোন দিন জন্ম নেয়নি
তার মত মহামানব।
তাঁর দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ ছিল সমান,
বসতেন তিনি আহারে তাঁর ভৃত্যের সাথে
এক বিছানায় ॥

'আসরারে খদীতে' ইকবালের বিশ্বজনীন মতাদর্শের প্রতি মুগ্ধ হয়ে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, লন্ডন-এর প্রফেসর ড. আর. এ নিকলসন বইটি Secrets of Self নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। অনুবাদ-গ্রন্থের শুরুতে দীর্ঘ ২৫ পৃষ্ঠার ভূমিকায় তিনি কবির খুদী দর্শনের মনোজ্ঞ ব্যাখা দান করেন। অনূদিত গ্রন্থটি ১৯২০ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে উক্ত ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগের অন্য একজন প্রফেসর ড. ডিকনসন ইকবালের চিন্তাধারায় সাম্প্রদায়িকতায় গন্ধ খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং কবির উপর জাতিপূজার অপবাদ দেন। এর জবাবে ইকবাল ড. আর. এ নিকলসনের নামে যে চিঠিটি লিখেন তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

'আমি বিশ বছরাধিক কাল ধরে বিশ্বের খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতবাদ অধ্যয়ন করেছি। এতে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি যে, এগুলোর কল্যাণী আদর্শ গ্রহণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে আমি কোন গোঁড়ামি দেখাইনি। আমার ফার্সী কাব্যগুলোর সারবত্তা ইসলামের সপক্ষে ওকালতি করা নয়। বরং মানব সমাজের জন্য বিশ্বজনীন মতাদর্শ পেশ করা ও সামাজিক সুষ্ঠু ব্যবস্থার অনুসন্ধান ছিল মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে রূপায়িত করতে গিয়ে বর্তমান জড়বাদী দর্শনের মূল্যায়ন করে বংশ, সম্পদ-মর্যাদা ও জাতি ভেদাভেদ বিলুপ্তি সাধন আমার কাছে অসম্ভব মনে হলো। এসব দার্শনিকের মতবাদের দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, ব্যক্তিগত জীবনে কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা। দ্বিতীয়ত, সামাজিক জীবনে পার্থিক উন্নতি-বিমুখ হয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বসে থাকা। সুতরাং এর কোনটিই ভারসাম্যপূর্ণ নয়। ইসলাম যে আদর্শ পেশ করেছে ইউরোপীয় সভ্যতায় সেটা পুরোপুরি অনুপস্থিত। আমরা তাদেরকে তা শেখাতে পারি।'

'আসরারে খুদীতে' ইকবাল মানুষকে কর্মবাদে উদ্দীপ্ত করেছেন। খুদীর পরিপুষ্টিতে মানুষের কর্মদক্ষতা হাসিল হয়। এ জন্য তিনি মুসলমানদেরকে সৃজনশীল কাজে প্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জীবনের সার্থকতাই হচ্ছে

www.pathagar.com

কাজের মধ্য দিয়ে। একমাত্র ব্যক্তিত্ববোধই পারে কাজের গতি সঞ্চার করতে এবং জীবনের সার্থকতা ফিরিয়ে আনতে। কাব্য-গ্রন্থের পূর্বাভাসে তিনি বলেছেন :

যর্‌রা আম মেহেরে মুনীর আন মন আস্ত
সদ সাহ্‌র আন্দর কর বয়ানে মন আস্ত।
খাকে মন রওশন তর আয জামে জম আস্ত
মুহ্‌রম আয নাজ আদহায়ে আলম আস্ত।

অর্থাৎ যদিও আমি একটি ক্ষুদ্র পরমাণু মাত্র,
তবু অত্যুজ্জ্বল বিভাময় সূর্য আমরই;
বক্ষ মাঝে আমার
শতেক পূর্বাশার আলো।
আমার ধূলিকণা–
জামশেদের সুরা পাত্রের চাইতে উজ্জ্বলতর,
সে জানে সেই সব পদার্থকে
যায়া আজও জন্ম নেয়নি এ বিশ্বে।

তিনি আরও বলেন :

ফিকরম আঁ আ্যহো সর ফতরাক বস্ত
কো হোনূয আয নীস্তি বিরোঁ নজস্‌ত
সবযানা রোয়েদাহ্‌ যের গুলশনম,
গুল বশাখে আন্দর নেহাঁ দর দামনম।

অর্থাৎ সুন্দর আমার বাগিচা,
পত্রপুট তার তারণ্যে সবুজ।
আমার পরিচ্ছদের মাঝে
লুক্কায়িত আছে
কতো অস্ফুট গোলাপ।

পূর্বাভাষের শেষাংশে লিখেছেন :

শায়েরী যী মসনবী মকসুদ নিস্ত
বুত পরস্তী বুত গীরি মকসুদ নিস্ত।
হিন্দীম আয ফার্সী বেগানা আম,
মাহে নো বাশদ তী পয়মানা আম।

www.pathagar.com

ফিকর মন আয জলওয়া আশ মশহূর গশত
খামায়ে মন শাখ নখল তূরে গশ্‌ত ॥

অর্থাৎ কাব্য সৃষ্টি নয় এ মসনবীর লক্ষ্য
এর লক্ষ্য সৌন্দর্য পূজা
আর প্রেম সৃষ্টি।
ভারতবাসী আমি;
ফার্সী নহে আমার মাতৃভাষা;
আমার চিন্তাধারার ঐশ্বর্যের জন্য
শুধু ফার্সীই হলো এর বাহন ॥

সর্বশেষে বলেন :
খারদা বরমীনা মগীর আয় হোশমন্দ
দিল বযোকে খরদায়ে মীনা ব বন্দ।

অর্থাৎ ওহে পাঠক! দোষ দিও না
আমার সুরা পাত্র দেখে,
গ্রহণ করো অন্তর দিয়ে
এই সুরার স্বাদ ॥

এ কাব্যের শেষ অধ্যায়ে ইকবাল জ্বালাময়ী ও মর্মস্পর্শী প্রার্থনার মাধ্যমে ইতি টানেন। নিম্নে তাঁর কিছু উদ্ধৃত করছি :

বায্ ঈঁ আওরাক রা শারীযা কুন
বায্ আঈন মুহব্বাতে তাযা কুন।
বায্ মারা বর হামাঁ খেদমতে গুমার
কারে খোদ বা আশেকাঁ খোদ সেকার।
রহরোয়াঁ বা মনযিলে তসলীমে বখশ
ইশকে বা আয গুগলে 'লা' আহাহ কুন
আশনায়ে রময 'ইল্লাল্লাহ' কুন ॥

অর্থাৎ বেঁধে দাও একই গ্রন্থিতে এই বিক্ষিপ্ত পত্ররাজিকে
পুনর্জাগ্রত করো প্রেমের নীতি!
টেনে নাও আমাদেরকে সেই প্রাচীন যুগের মতো

www.pathagar.com

তোমার সেবায়,
ইচ্ছা তোমার পূর্ণ কর তাদের জীবনে
প্রেম করে যারা তোমায়।
দাও আমাদেরকে ইবরাহীমের
সেই বলিষ্ঠ ঈমান।
জানিয়ে দাও আমাদেরকে 'লা ইলাহার অর্থ–
পরিচিত কর আমাদেরকে–
'ইল্লাল্লাহ্‌র রহস্যের সাথে ॥

পৃথিবীর প্রধান প্রধান বেশ কয়েকটি ভাষায় ইকবালের এ কাব্য গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। 'আসরারে খুদী' ও 'রুমূযে বেখুদী' (দু'খণ্ড একত্রে) আবদুল ওহ্হাব আয্যাম কর্তৃক আরবীতে অনূদিত হয়ে 'দিওয়ান আল-আস্রার ওয়াল রুমূয' নামে দারুল মা'আরিফ, কায়রো, মিসর থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। সিন্ধী ভাষায় অনুবাদ করেন মুহাম্মদ বখশ ওয়াসিফ। ড. আলী নিহাদ তারলান Esrar ve Rumuz নামে তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত বইটি ১৯৫৮ সালে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া জার্মান ও ফরাসী ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

রুমূযে বেখুদী

ইকবালের খুদী দর্শনের সাড়া জাগানো দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ 'রুমুযে বেখুদী'। আসরারে খুদীর ভূমিকায় কবি এ গ্রন্থেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে খুদী সিরিজের ২৮ খন্ড হিসেবে এটা লাহোরে প্রকাশিত হয়। কাব্যের ভাষাও ফার্সী। 'রুমুয-ই-বেখুদী' অর্থাৎ 'আত্ম বিলীনের রহস্য।'

ইকবাল আসরারে খুদীতে নিরপেক্ষ ও চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব জাতির শাশ্বত আদর্শ কি হবে তার আলোচনা করেছেন। আর সেই আদর্শের বাস্তব নমুনা হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন দর্শন ও মহব্বকে তুলে ধরেছেন। 'রুমূয-ই বেখুদীতে' সেই শাশ্বত ও চিরন্তন আদর্শকে রূপায়নের লক্ষ্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ আনুগত্য ও রাসুল (সা.)-এর মহব্বতের অনুগামী হওয়ার সাথে রিসালাতের অনুসরণের মধ্যে আত্মবিলীন করে দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এটি সুফিতত্ত্বের উচ্চতম গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এখানে ইকবালের মুফিমনের দ্যুতি ও হৃদয়ের আকুতি অতি গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

তাওহীদবাদে উজ্জীবিত মানব সত্তা নবীর শাশ্বত আদর্শ অনুসরণ ও মহব্বতের দ্বারা 'ইনসানে কামিলের প্রতিভূ হতে পারে। মানুষের স্বাধীনতা সাম্য প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

ও কল্যাণের জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে তার নাম আল-কুরআন। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন আল-কুরআনের আদর্শিক বাস্তবতার মূর্ত প্রতীক। ইকবাল বিশ্বব্যাপী অশান্তির হাহাকার রূপ দেখে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকর নেতৃত্ব ও শাসন-প্রণালীর জন্যে আল-কুরআনের শিক্ষা ও মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শের অনুসরণ ও মহব্বতের জীবনকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি খেলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণ যুগের প্রতি দিকে নির্দেশ করেছেন। মুমিনদেরকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সে আদর্শ গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় কবির দু'একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

'আমার ধারণায় 'রুমূযে বেখুদী' কাব্যখানি লেখায় ইতি টেনে ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো দু'তিনটি বিষয়ের জন্য কাব্যটি অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। কুরআন, বায়তুল্লাহ শরিফের মাহাত্ম্য, মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে– কবিতাগুলো পরে সংযোজন করেছি। এতে গ্রন্থটির প্রকাশনায় বিলম্ব ঘটেছে।

এখন আমার মনে হচ্ছে, গ্রন্থটি মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগাবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলকধাঁধায় যারা ঘুরপাক খাচ্ছে তাদেরকে পথের দিশা দেবে। কারণ আমার যতটুকু মনে হয়, ইতোপূর্বে ইসলামী জীবন দর্শনকে এত শিল্পিত অবয়বে মিল্লাতে ইসলামিয়ার সামনে পেশ করা হয়নি। ফলে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের এটা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল প্রত্যয় জন্মাবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতা আজকে জাতীয়তাবাদের যে ভিত্তি স্থাপন করেছে তা দুর্বল গাঁথুনির নড়বড়ে কুঁড়েঘর মাত্র। জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপনের রূপরেখা একমাত্র ইসলামই চূড়ান্ত করেছে, যার মজবুত ভিত্তি ও বলিষ্ঠ চেতনা সময় বা যুগের অতিক্রান্তিতে স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে না।'

কাব্যের শুরুতে 'মিল্লাতে ইসলামিয়ার সমীপে নিবেদন' কবিতায় মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে ইকবাল বলেছেন :

আয় তরা হক খাতেমে আকওয়াম করদ
বরতু হো আগায রা আন্‌জাম করদ ॥

অর্থাৎ তোমায় খোদা সৃষ্টি করেন পূর্ণতম শ্রেষ্ঠ জাতি,
তোমার মাঝে হরেক আদি সফল লভি পূর্ণ ভাতি।

আল-কুরআনের ভাষায় 'খায়রে উম্মাতিন'-এর প্রতিধ্বনি করে কাব্যরূপ দিয়েছেন তিনি এ কবিতায় মাধ্যমে। খায়রে উত্তম হওয়ার অনিবার্য শর্ত হলো রাসুল (সা.)-এর উসওয়ায়ে হাসনা– 'সর্বোত্তম আদর্শের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ ও তাঁকে প্রাণাধিক ভালবাসা প্রদর্শন করাই মুমিন বা ঈমানদারের প্রধান শর্ত।'

www.pathagar.com

হাদিসে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। বস্তুত রসুল প্রেমের দহনই মুসলিম মিল্লাতের ঈমানী শক্তিকে মহীয়ান গরীয়ান করে তুলতে পারে তাই তিনি তাঁর প্রেম ও মহব্বতকে হৃদয়ে ধারণ করে আল্লাহ্‌র অশেষ নেয়ামতের অধিকারী ও প্রিয় বান্দা হওয়ার উদাত্ত আহ্বান করেছেন :

রমযে সূযে আয পরওয়ানায়ে।
দর শরর তামীর কুন কাশনায়ে।
তরহে ইশকে আন্দায আন্দর জানে খোবীশ
তাষা কুন বা মুস্তফা পরমাঁ খোবীশ।

অর্থাৎ পতঙ্গেরই দহন দেখে মর্ম দহন শিক্ষা করো,
অগ্নিশিখার কেন্দ্র মাঝে আবাস তব গঠন করো।
আপন প্রাণের গোপন কোণে নবী প্রেমের ভিত্তি গঠন করো,
নবীর সাথে শপথ তব আবার তুমি নব জীবন বপন করো।

আবার বলছেন :

তায খাকত লালাহ্ যার আরদে পদীদ
আয দমত বাদে বাহরে আয়দ পদীদ॥

অর্থাৎ মৃত্তিকাতে তোমার যেন পুষ্প ফোটে নতুন করে,
তোমার শ্বাসে মধুর মলয় বয় যেন গো নূতন করে॥

পরিশেষে দুর্দশাগ্রস্ত ও পদস্খলিত মুসলমানদের জন্য সিরাতুল মুস্তাকীমের আশাবাদ ব্যক্ত করে আল্লাহ্‌র কাছে আহাজারির সুরে মুনাজাত করেছেন :

আয পরে কওমে যখোদনা মহরমে
খাস্তীমে আয হক হায়াতে মাহকমে।
দর সকৃতে নীম শব নালাঁ বুদম
আলম আন্দর খাব ওমন গুরীযাঁ বুদম।
জানম আয সবর ও সকূ মাহরূম বুওদ।
দরদ মন ইয়া হাইউ ইয়া কাইউমু বুওদ॥

অর্থাৎ

আত্মা সত্তার অজ্ঞ ঘুমন্ত এই জাতির তরে,
যাজ্ঞা করি– দাও হে খোদা, সবল-সফল জীবন তারে।

www.pathagar.com

অর্ধ রাতের নিঝুম ক্ষণে বিলাপ করি করুণ স্বরে
'বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন' বক্ষ ভাসাই নয়ন-লোরে।
বঞ্চিত মোর পরাণখানি ধৈর্য এবং শান্তিহীন।
হে চিরঞ্জীব! হে চিরন্তন, জপ করছি রাত্রি দিন॥

কাব্যগ্রন্থের ভূমিকার পাদমূলে তিনি খুদী-বেখুদীর মর্মোদ্ঘাটন করে বলেছেন :

নকশে গীর আন্দর দিলশ 'উ' মী শুওদ
মন যহম মী রীযদ ও 'তু' মী শুওদ।
জবর কতা' ইখতিয়ারশ মী কুনদ
আহ মুহব্বত মায়াহ্ দারশ মী কুনদ।
নায তা নায আস্ত কুম খীযদ নেয়ায
নায হা সাযদ বহম খীবদ নেয়ায।
দর জামা'আত খোদ শিকন পরদিদ খুদী
তায গুলবর গে চেমন গরদিদ খুদী।
নুকতায়ে হা চোঁ তায়গে পোলাদ আস্ত তেয
গরনমী ফাহমী যপেশ মা গুরেয।

অর্থাৎ 'তিনি'র মোহর অন্তরে তার অংকিত হয়,
'আমি' বিচূর্ণ হলেই 'তুমি'র অভ্যুদয়।
বাধ্যকতা ইচ্ছা তাহার খর্ব করে,
প্রেমের ধনে ধন্য সে হয় গর্ভ ভরে।
নম্র হবে না অভিমান যবে চাও তবে,
ভুলে যাও মান, বিনয় তার জন্ম লবে।
সত্তা সে করে আত্মবিলোপ সংঘ মাঝে,
পত্র সে হবে পুষ্পমালা কানন মাঝে।
'তীক্ষ্ম লৌহ অসির মত সূক্ষ্ম কথা;
যাও দূরে– না বুঝলে যদি গোপন ব্যথা।

বাঙ্গে দরা

বাঙ্গে দরা কাব্য-গ্রন্থটি মূলত ইকবালের বিশিষ্ট কবিতাগুলোর একটি সংকলন। ১৯২৪ সালে এটা লাহোরে প্রকাশিত হয়। শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া, খিযির রাহ, তুলূয়ে ইসলাম– এ চারটি দীর্ঘ কবিতাও পরবর্তীতে এর সাথে সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর সাড়া জাগানো কবিতাগুলো এতে

www.pathagar.com

সংকলিত হওয়ায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাঙ্গে দরার কবিতাগুলো রচনা কালক্রম অনুসারে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায় : প্রথমত, কাব্য-চর্চার সূচনাকাল থেকে ১৯০৫ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপ সফরে যাওয়া পর্যন্ত। এ সময়কালে আমরা ইকবালকে খাঁটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কবি হিসেবে দেখি। নয়া শিওয়ালা (নতুব শিবালয়), হিমালাহ্ (হিমালয়), হিন্দুস্তানী কওমী গীত (ভারত-সঙ্গীত), হিন্দুস্তানী বাচ্চোঁ কী কওমী গীত (ভারতীয় শিশুদের জাতীয় সঙ্গীত) ইত্যাদি কবিতাগুলোতে তাঁর স্বদেশ-প্রেমের অনন্য অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেছে।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপের প্রবাস জীবন (১৯০৫-১৯০৮)। প্রবাসী ইকবাল রচিত কবিতা ও ভারতীয় ইকবালের কবিতার মধ্যে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপে যাওয়ার পর দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদের নিষ্ফল ও তিক্ত অভিজ্ঞতা দেখে তিনি আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হন। এ সময়ে রচিত জযীয়ায়ে সিসিলিয়া (সিসিলি দ্বীপ), হাকীকত-ই-হুসন (সৌন্দর্য তত্ত্ব), ওয়াতানিয়াত (ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ), তোলাবায়ে আলীগড় কি নাম (আলীগড় ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের প্রতি) প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। এ সব কবিতায় ক্রমানুসারে তাঁর চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও প্রসারতার ছাপ সুস্পষ্ট। বস্তুতপক্ষে তখন থেকে পরবর্তী সব কবিতার আঞ্চলিক 'স্বদেশ' এর বিকল্প বৃহত্তর 'স্বজাতির সমৃদ্ধির কথাই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত, এ পর্যায়ের কবিতাগুলোতে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি তাঁর একান্ত প্রীতি ও আন্তরিকতার মহান বাণী ভাস্বর হয়ে রয়েছে। কবি স্বজাতির গৌরবময় অতীত ও সুন্দর ভবিষ্যত গঠনের বিস্তৃত রূপরেখা পেশ করেছেন সুনিপুণভাবে। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে তারানা-ই-মিল্লী (জাতীয়-সঙ্গীত), শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া (অভিযোগ ও অভিযোগের জবাব), শবে মি'রাজ (মি'রাজ রজনী), দোয়া (প্রার্থনা), তুলূয়ে ইসলাম (ইসলামের উত্থান), খিযির-ই-রাহ (পথের দিশারী), বিলাদে ইসলামিয়া (ইসলামী রাষ্ট্র) ইত্যাদি। এ কবিতায় ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন আহ্বানের আলোকে 'হেরার রাজ-তোরণে'র পথ-নির্দেশ করেছেন তিনি।

ভারতবর্ষের শাসন-ক্ষমতা ইংরেজদের পদানত হলে রাজ্যহারা মুসলমানরা অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। তাদের পুঞ্জিভূত হতাশার স্তূপে ইকবাল নাড়া দেয়ার লক্ষ্যে হিমালাহ্ (হিমালয়) কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতায় তিনি ভারতের মুসলমানদেরকে বিস্মৃত অতীত-গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়ের প্রতীক চয়ন করেছেন, যাতে তারা আত্মসম্বিৎ ফিরে পায়।

www.pathagar.com

কবি ক্ষমতাচ্যুত হতাশাগ্রস্ত জাতিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলেছেন, হিমালয় যেমন সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হিসেবে তোমাদের জন্মভূতিতে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনি তোমরাও বিশ্বের সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন– সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, আর এই ভারত-ভূমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বাসভূমি। আকাশ যেমন হিমালয়ের ললাট চুম্বন করছে তেমনি অন্যান্য জাতিরা তোমাদের জ্ঞান-গরীমায় মুগ্ধ ছিল। সুতরাং তোমরা এদেশে ঘর জামাই নও। কবিতার শুরুতে ইকবাল বলছেন :

আয় হিমালাহ্! আর ফসীলে কিশওরে হিন্দুস্তাঁ
চোমতা হে তেরী পেশানী কো ঝুক কর আসমাঁ,
তুজ মে কুচ পয়দা নেহী দেরীনাহ্ রোষী নিশাঁ
তু জোয়াঁ হে গরদিশে শাম ও সেহের কি দরমিয়াঁ!
এক তজল্লী হে সরাফা চশমে বীনা কি লিয়ে।

অর্থাৎ হিমালয়, হিমালয়! হে ভারত নগর-প্রাচীর,
আনত আকাশ চুমে স্নেহ ভরে তব উচ্চশির।
কাল এঁকে দেয় নাই তব বয়সের জ্বরা,
দিবা-রাত্রি চক্রাবর্তে আজো তুমি যৌবন-শিহরা।
মুসার দৃষ্টিতে ছিল ক্ষণজ্যোতি 'সিনাই' পাহাড়,
আপাদমস্তক তুমি জ্যোতিষ্মান নয়নে সবার।

দুর্জয় সাহস ও পরিকল্পিত কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এলে ঔপনিবেশিক শক্তি পিছু হটতে বাধ্য। তাই ভারতবাসীকে তিনি আন্দোলিত করে তুলছেন :

আবর কি হাতোঁ মেঁ রাহওয়ার হাওয়া কি ওয়াস্তে
তাযা য়া ন দে দিয়া বরকে সর কো সার নে।
আর হিমালাহ! কুয়ী বাযী গাহ হে তু বিহী জিসে
দসতে কুদরত নে বনায়া হে আনাসের কি লিয়ে।
হায়ে কি করতে তরব মেঁ জুমতা জাতা হে আবর।
ফীলে কে যনজীর কি সূরতে উড়া যাতা হে আবর।

অর্থাৎ মেঘেদের হাতে দেয় চূড়া তব বিদ্যুতের কশা,
তাড়িও তুরঙ্গ বায় হেষে ছুটে শিহরি' সহসা।
হিমালয়, হিমালয়! তুমি সেই লীলা-নিকেতন,

www.pathagar.com

ক্ষিতি তেজ আদি যেথা ক্রীড়া-সুখে করে বিচরণ।
আহা! কিবা মহানন্দে পুঞ্জ মেঘ ভেসে বলে যায়,
মুক্ত করীদল যেন আকাশেতে উড়ে বেড়ায় ॥

পরিশেষে তিনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের প্রতি দিক নির্দেশ করে বলছেন :

হাঁ দেখা দে আয় তসওওর! ফের উওহ্ সুবহে ও শাম তু
দৌড় পিছে কি তরফ আয়ে গারদিশে আইয়াম তু ॥

অর্থাৎ হে কল্পনা দেখাও সে সন্ধ্যা আর প্রভাত নিচয়,
অতীতে ফিরিয়া চল ওগো কাল আবর্তনময়!

'হিন্দুস্তানী বাচ্চোঁ কি কওমী গীত' কবিতায় ভারতবাসীদের মিলন- সুরে আহ্বান করেছেন। সঙ্গীতের আখ্যান ভাগে কবি গাইলেন :

চিশতী নে জিস্ যমীঁ মেঁ পয়গামে হক সুনায়া,
নানক নে জিস্ চয়ন মেঁ তওহীদ কা গীত গায়া,
তাতারীয়োঁ নে জিস্‌কো আপন ওয়াতন বানায়া,
জিসনে হিজাযীয়োঁ সে দশ্‌তে আরব চুড়ায়া,
মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায়, মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায় ॥

অর্থাৎ চিশতী শোনাল যে ভূমিতে সত্যের বাণী প্রেমের বলে,
তাওহিদী গান গাহিল নানক যে দেশের শ্যাম কানন তলে,
তাতারাবাসীরা বলেছিল যার আপনার প্রিয় স্বদেশ বলে,
মরুর মুক্তি ভুলিল হিজাযবাসীরা যাহার স্নিগ্ধ কোলে;
সে দেশ আমার জন্মভূমি গো, সে দেশ আমার জন্মভূমি!

স্বদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় মুগ্ধ হয়ে কবি বলেছেন :

ইউনানীয়োঁ কো জিস্ নে জীরান কর দিয়া থা
সারে জাঁহা কো জিস্‌নে ইলম ও হুনর দিয়া থা।
মেট্টি কোন জিস্ কি হক নে যর কা আসর দিয়া থা
তুরকোঁ কা জিস্ নে দামন হীরোঁ সি বহ্‌র দিয়া থা
মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায়, মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায় ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ প্রতিভায় যার তাক লেগেছিল জ্ঞান-গুণীদের য়ুনান দেশে।
সারা পৃথিবীরে দিয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান যে গো, মধুর হেসে।
পরশ যাহার তুচ্ছ মাটিরে বানাল বিশাল সোনার খনি,
তুর্কবাসীরা দু'হাতে ভরিয়া তুলিয়া দিল যে হীরক মণি;
সে দেশ আমার জন্মভূমি গো, সে দেশ আমার জন্মভূমি ॥

'হিন্দুস্তাঁ কি কওমী গীত'–এ তিনি স্বদেশ-প্রেমের আতিশয্যে গাইলেন :

সারা জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা
হাম বুলবুলে হ্যাঁ উসকে, ইয়েহ্ গুলিস্তাঁ হামারা

অর্থাৎ সবার সেরা ভারত আমার
জন্মভূমি অতুল,
সে যে আমার উদ্যান আর
আমি তার বুলবুল ॥

তসবীর-ই-দরদ কবিতায় কবি সেই পুণ্য জন্মভূমির পরাধীনতার দুঃখ গাঁথা জীবনের চিত্র অংকন করেছেন। বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বিলাপ করেছেন :

ইলাহী ফের মযাহ কিয়া হ্যাঁ য়েহাঁ দুনিয়া মে রহনে কা
হায়াতে জাবিদাঁ মেরী নহ্ মুরগ না গাহাঁ মেরী,
মেরা রোনা নেহী, রোনা হে ইয়ে সারে গুলিস্তাঁ কা
উওহ্ গুল হো মাঁয়, খযাঁ হর গুল কি হে গোয়া খযাঁ মেরী ॥

অর্থাৎ প্রভু হে! আমার কি সুখ বল তো এই দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকা,
জীবন-মরণে যেখানে কোথাও অধিকার কিছু যায় না রাখা।
আমার রোদনে শুধু আমি নই– সারা বনভূমি কাঁদিছে হায়।
আমি সেই ফুল হেমন্ত যার প্রতিটি কাঁদায় ॥

স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে কবি বলছেন :

ইয়ে খামুশী কাহাঁতক, লজ্জতে ফরিয়াদ পয়দা কর
যমীঁ পর তুহো আওর তেরী সদা হো আসমানোঁ মেঁ।

www.pathagar.com

নহ্ সমঝো গি তু মিট জাও গি আয় হিন্দোস্তাঁ ওয়ালো
তোমারী দাস্তাঁ তক ভী নহ্ হোগী দাস্তানোঁ মেঁ ॥

অর্থাৎ কতকাল আর নীরব থাকিবে? ফরিয়াদ নিয়ে দাঁড়াও সব,
মাটিতে থাকিয়া বিপুল শুন্যে প্রেরণ কর গো, তোমার রব।
এখনো যদি না বুঝিয়া থাক হে স্বদেশবাসী, শোন গো তবে,
আগামী দিনের ইতিহাস মাঝে নামটুকু তব নাহিক রবে ॥

দ্বিতীয় ভাগের ওয়াতানিয়াত কবিতায় ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের মর্মমূলে আঘাত হেনেছেন। তিনি ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন, দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সব বিপর্যয়ের মূল। সারা বিশ্বের মুসলিম একটি দেহের মত। পবিত্র হাদিসেও বলা হয়েছে তা-ই। মু'মিনদের উদাহরণ হচ্ছে একটি প্রাসাদের মত। এর একটি ইট যেমনি অন্যটির সাথে সম্পৃক্ত তেমনি বিশ্বের প্রত্যন্ত প্রান্তরে অবস্থানরত অবহেলিত মুসলমানরা জাতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই পতাকাতলে সমবেত হোক– এটাই কবির একান্ত কাম্য। সুতরাং তিনি দেশ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলেন :

উন তাযা খোদাঁও মেঁ বড়া সব সি ওয়াতন হে
জো পিরহন সি কা হে উওহ্ মযহাব কা কাফন হে ॥

অর্থাৎ সব দেবতার সেরা দেবতা, যাহারে কহিছ স্বদেশ ফের,
বসন তাহার বনেছে কাফন আবারি বদন ইসলামের ॥

হো কায়দে মকামী তু নতীজা হে তবাহী
রহ বাহর মেঁ আযাদ সুরতে মাহী ॥

অর্থাৎ স্থানের শিকলে বন্দী যদি গো হও তুমি তবে বিলীন হবে,
অকূল জলধি মাঝে বাস কর মীণ সম এই বিপুল ভাবে ॥

আকওয়ামে জাহাঁ মেঁ হে রিকাবত তু ইসি সে
তসখীর হে মকসুদে তেজারত তু ইসি সে।
কমযোর কা ঘর হোতা হো গারত ইসি সে,
আকওয়াম মেঁ মখলুকে খোদা বটতী সে ইসি সে
কওমীয়ত ইসলাম কি জড় বটতী হে ইসি সে ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ ভুল বুঝাবুঝি যত এরি লাগি, জাতি-বিদ্বেষ ও হানাহানি,
বাণিজ্য জাল বিস্তার লাগি প্রয়োজন হলো জয়ের গ্লানি।
ইহারি কারণে রাজনীতি হতে দূরে পালিয়েছে সততা যত,
এরি ফলে আজ হতেছে ধ্বংস গরীবের প্রিয় কুটির শত।
খোদার সৃষ্টি মানুষ জাতিটি দেশের টানেতে শতধা হয়,
মহান ভ্রাতৃ ভাবধারাবাহী ইসলাম এতে হয় যে লয় ॥

ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ বিমুখ কবি অনুপম আন্তর্জাতিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'তারানা-ই মিল্লীতে বলেছেন :

চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হেঁ হাম ওয়াতন হে সারা জাঁহা হামারা।
তাওহীদ কি আমানত সীনোঁ মেঁ হে হামারে,
আসাঁ নেহী মিটানা নাম ও নিশাঁ হামারা ॥

অর্থাৎ আরব মোদের চীনও মোদের, মোদের হিন্দুস্তান,
মুসলিম মোর বিশ্ব জগত মোদের বাসস্থান ॥
বক্ষে আমার তাওহীদের রয়েছে আমানত,
নয়কো সহজ মিটিয়ে দেওয়া মোদের নাম-নিশান।

যেহেতু কবি ও মুসলিম মিল্লাত অমিত তেজোদীপ্ত বীর পুরুষের উত্তরাধিকারী। তাদের শিরাই শহিদী খুনের ধমনী সংযুক্ত। সুতরাং তিনি বলেছেন :

তায়গোঁ কে সায়ে মেঁ হাম পল কর জোয়াঁ হোয়ে হেঁ,
খঞ্জরে হেলাল কা হে কওমী নিশাঁ হামারা।
মগরিব কি ওয়াদিওঁ মেঁ গোঞ্জী আযাঁ হামারি,
থমতা ন থা কিসি সে সায়লে রওয়াঁ হামারা।

অর্থাৎ শিশুকাল হতে হয়েছি জোয়ান তরবারি-ছায়া শিরেতে ধরে,
নতুন চাঁদের খঞ্জর শোভে আমার জাতীয় পতাকা 'পরে।
ইউরোপ ভূমে গিরি-প্রচ্ছায় ধ্বনিয়া তুলেছি আযান সুর,
কিছুতে পারেনি ধাবমান গতি রুখতে আমার,—লক্ষ্য দূর।
মিথ্যার কাছে পরাজিত হব? দৈব বিপাক, আমি যে নই,
শতবার তুমি পরখ-নিরিখ করিয়াছ যারে, আমি সে হই ॥

www.pathagar.com

আয় আরদে পাক তেরী হুরমত পেহ্ কট্ মরে হাম
হে খোঁ তেরী রগোঁ মেঁ আবতক রওয়াঁ হামারা ॥

অর্থাৎ হে পবিত্র ভূমি! তোমার ইজ্জতের জন্য করেছি মোরা রক্ত দান,
সে রাঙা শোণিত ধমনীতে তব আজিও প্রবহমান ॥

বাঙ্গে দরা কাব্যখানি থেকে সংকলিত কবিতার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন V.G. Kirnan। অনূদিত সংকলনের নাম 'Poems of Eqbal'. Dr. H.T. Sorle-ও নির্বাচিত ২১টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। তা Aberdeen University থেকে ১৯৫৩ সালে মুদ্রিত হয়। ড. মুহাম্মদ বাকির ও প্রফেসর ইউসুফ সেলিম চিশতী এ বইয়ের দু'টি পৃথক পৃথক ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন। দু'টোই ১৯৫১ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়।

শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া

'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া' ইকবালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতাসমূহের অন্যতম। এ দু'টি কবিতাই আঞ্জুমানে হেমায়েত-ই-ইসলামের সভায় যথাক্রমে ১৯১১ ও ১৯১২ সালে পঠিত হয়েছিল। 'শেকওয়া পাঠে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এটার জন্য ইকবালকে যে প্রবল বাধা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল অন্য কোন লেখার জন্য সে রকম হয়নি।

শেকওয়া মানে অভিযোগ– আল্লাহ্‌র নামে অভিযোগ। ৩৬টি স্তবকের দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে মুসলিম জাগণের মহাকবি আল্লামা ইকবাল তিমির-তাড়িত দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম জাতির করুণ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌র নামে অভিযোগ পেশ করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অভিযোগগুলো অত্যন্ত শ্রুতিকটু হলেও তিনি সুফি মন ও প্রাণের আকুতিকে আল্লাহর কাছে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এখানে তাঁর মুসলিম মননের ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-দুর্দশা ও বিশ্বব্যাপি তাদের অধঃপতনের চিত্র সম্পর্কে যেমন তিনি ব্যথিত হয়েছেন তেমনি আল্লাহর কাছে এর প্রতিকারের জন্য অভিযোগ পেশ করেছেন। তাঁর প্রতিবাদের মূলে ছিল এটাই। কিন্তু আলেম সমাজের কতিপয় ব্যক্তি বিশেষ করে গোড়াপন্থী সম্প্রদায় তাঁর কবিতার সুফি দৃষ্টিভঙ্গি ও নিগুঢ় তত্ত্ব না বুঝেই তাঁর কাফের উপাধীতে ভূষিত করে। যদিও পরে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সেই উপাধী ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু আল্লামা ইকবাল সেইসব আলেমদের প্রতি রুষ্ঠ হয়ে দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে জওয়াবে শেকওয়া লিখেন।

www.pathagar.com

পৃথিবীর সব সাহিত্যেই দুই প্রেমিক হৃদয়ের মান-অভিমান উপজীব্য বিষয়। কবিরা তেমন কোন এক প্রেমিক সত্তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে তা রসঘন করে উপস্থাপন করেন। ইকবালের পরম প্রিয় সত্তা আল্লাহ্ রব্বুল 'ইয্যত। তাঁর প্রতিই তাঁর মান-অভিমানের কথামালা। স্বজাতির চরম দুর্দশা দর্শনে মর্মাহত হৃদয় নিয়ে তিনি আল্লাহ্র দরবারে অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নালিশ করেছেন। মুসলমানের এহেন অবস্থা সত্ত্বেও তিনি কেন নির্বিকার- এটাই কবির মর্মবেদনার কারণ। তিনি বলেছেন :

জুরআতে আমূয মেরী তাবে সুখন হে মুজকো
শেকওয়া আল্লাহ্ সে খাকম বদহ্ন হে মুকজো।

অর্থাৎ বাক শক্তি নির্ভীক আমায় করছে এই ধরা ধামে,
ছাই মুখে হোক তাই করছি শেকওয়া আমি খোদার নাম ॥

সমকালীন বিশ্বের প্রেক্ষাপটে কবির মর্মবেদনা লাঘবের জন্য তিনি অভিযোগের পথই বেছে নিলেন। তিনি বলেন :

আয় খোদা শেকওয়া আরবাবে ওফা ভী সুনলে
খোগর হামদ্ সে তোড়া সা গেলাহ্ ভী সুনলে ॥

অর্থাৎ আল্লাহ্! এবার বন্ধু অনুযোগের কেচ্ছা শোন
নিত্য যারা গুণ গাহিছে, বারেক তাদের গেলাহ্ শোন ॥

যে জাতি আজ ধ্বংসোন্মুখ সে জাতির কর্মতৎপরতা ও ত্যাগ তিতিক্ষার ফলে আল্লাহ্র তাওহীদ ও খিলাফত বাস্তবায়িত হয়েছে। অথচ আজ তারা পদদলিত হচ্ছে চরমভাবে। তাই কবিতায় প্রেমাস্পদের কাছে অভিযোগের সুরে বললেন:

তুজকো মা'লূম হে লেতা থা কুয়ী নাম তেরা
কুওওতে বাযূয়ে মুসলিম নে কিয়া কাম তেরা।

নকশে তাওহীদ কা হার দিল পেহ বটায়া হামনে
যের খঞ্জর ভী ইয়ে পয়গাম সুনায়া হামনে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ তুমি বল কেউ কি তোমার নাম এই মহীতলে?
আজকে তুমি পরিচিত মুসলমানের বাহুবলে।

আঁকিয়াছি মানব হৃদে তাওহীদের চিত্র মোরা,
খঞ্জরের তলে থেকে দিয়াছি তাওহীদের সাড়া।

এভাবে কবি মুসালিম মিল্লাতের গৌরবময় অতীতের বিশদ বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্‌র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শেকওয়া মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলে পরবর্তীতে কবিকে জওয়াবে শেকওয়া রচনা করতে হয়। এখানে তিনি মুসলমি জাতির দুঃখ-দুর্দশার কারণগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শুনিয়ে দিয়েছেন। জাতির অধঃপতনের মূলে কি উপাদান সক্রিয় ও তাওহীদবাদী জনতার উপর আঘাত হানছে, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে জাতির শিরায় অনল শিহরণ জাগিয়েছেন। কবি বলেন :

কলব মেঁ সূয নেহী রূহ মেঁ এহসাস নিহী
কুছ ভী পয়গামে মুহাম্মদ কা তোমী পাস নেহী

অর্থাৎ রূহে নাহি অনুভূতি, অন্তরে না জ্বালা আছে
মুহাম্মদের পয়গামেরও মর্যাদা নাই তোমাদের কাছে।

রহ গেয়ী রসমে আযাঁ রূহে বেলালী ন রহী
ফলসফা রহগিয়া তালকীনে গযালী ন রহী।
মসজিদী মরসিয়া খাঁ হেঁ কে নামাযী ন রহী
ইয়া'নী উওহ্ সাহেবে আওসাফে হেজাযী ন রহী।

অর্থাৎ আযান দেওয়ার প্রথা আছে
নাই বেলালী প্রাণের সাড়া,
ফলসফা আর থাকলে কি হয়,
গাযযালীর শিক্ষা ছাড়া।
মসজিদ আজি কাঁদছে বসে
হায়! সেই নামাযী কেউ তো নেই
হেজাযী সেই গুণে আজি
গুণান্বিত কেউ তো নাই ॥

www.pathagar.com

এভাবে তিনি জাতিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উসওয়ায়ে হাসানার অনুসরণ ও মহব্বতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি নবীর প্রেম ও তাঁর আদর্শের আনুগত্য ও কুরআনের শিক্ষাকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আকুল আহ্বান জানিয়ে ইসলামী নব জাগরণের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পরিশেষে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণাও দিয়েছেন যে, নবীর আদর্শ ও মহব্বত ছাড়া মুসলিম জাতির মুক্তির পথ সুদূর পরাহত।

বালে জিবরীল

'বালে জিবরীল' (জিবরাঈলের ডানা) কাব্য গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত। এতে ৬১ টি গযল ও ২৪ টি চতুষ্পদী কবিতা রয়েছে। এ কাব্য গ্রন্থে বিশেষত কবি মানবতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন। মানবতা বিধ্বংসী শক্তির বিরুদ্ধে শোষিত নির্যাতিত মানবতাকে তিনি রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

সমাজের নিগৃহীত মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে যারা স্বীয় স্বার্থ হাসিলের পাঁয়তারা চালায়, কবি সেসব শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। কবির প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে :

উঠো মেরী দুনিয়া কি গরীবোঁ কো জাগা দো
কাখে উমারা কি দর ও দিওয়ার হেলা দো।

জিস ক্ষেতে সে দহকাঁ কো মায়স্সর নেহী রুযী
ইসক্ষেত কি হার খোশায়ে গুনদম কো জ্বলা দো।

অর্থাৎ ওঠো বিশ্বের গরীব নিঃস্বে জাগিয়ে দাও,
ধনীর প্রাসাদের ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।

যে ক্ষেতের ফসল কাঙ্গাল কিষাণ পায় না খেতে,
সে ক্ষেতের শস্যসমূহ জ্বালিয়ে দাও ॥

বালে জিবরীলের বেশ কিছু কবিতা স্পেন সফরকালে রচিত। তাই এতে মসজিদে কর্ডোভা ইত্যাদি কবিতাগুলো আমরা দেখি। তাছাড়া জিবরীল ও ইবলিস, আযান, ফিরিশতোঁ কি গীত, ফরমান-ই-খোদা কবিতাগুলোও উল্লেখযোগ্য। 'ফরমান-ই-খোদা' কবিতাটি বেশ জনপ্রিয়। এতে বিদ্রোহের সুর অনুরণিত। এভাবে মর্মস্পর্শী ভাষায় দুর্দশাগ্রস্ত জাতির গরীব-দুঃখী মেহনতী

www.pathagar.com

মানুষের শোষণ-বঞ্চনার মুলোচ্ছেদের লক্ষ্যে ইকবাল ঐক্য ও সংহতি কামনা করেছেন।

আরমুগানে হিজায

'আরমুগানে হিজায' কাব্য-গ্রন্থটি ইকবালের প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ। তাঁর একান্ত আশা ছিল হিজাযের প্রধান আকর্ষণ মক্কা ও প্রিয়নবীর রওদ্বা মুবারক মদিনা শরিফ বিয়ারত করে এ কাব্য-গ্রন্থের সমাপ্তি টানবেন। সে জন্য তিনি গ্রন্থের অনেক জায়গা অপূর্ণ রেখেছিলেন এবং এটা প্রকাশনার কোন উদ্যোগও নেননি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর এ সাধ পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি রাব্বুল ইয্‌যতের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

এ কাব্য-গ্রন্থে কবি তাঁর মর্মবেদনা নিবেদন করেছেন আল্লাহ্‌র সমীপে, রাসুলুল্লাহ্‌র খেদমতে, জাতির খেদমতে, মানুষের খেদমতে ও সহগামীদের খেদমতে। আল্লাহ্‌র সমীপে তাঁর কথার নজরানা :

গোলামে জুয রযায়ে তু বখোয়ম
জুয আঁ রা হে কে ফরমূদী না পোয়ম।
মুসলমানে কে দর বন্দ ফিরিঙ্গ আস্ত
দিলশ দর দস্তে উ আসাঁ নয়ায়দ ॥

অর্থাৎ গোলাম আমি তোমার খুশি
ছাড়া কিছুই চাইনে, তা ঠিক,
যেই পথেতে চলতো বলো
সে পথ ছাড়া যাইনে, তা ঠিক।

মুসলমান যে আটকে গেছে
ফিরিঙ্গিদের শিকার জালে,
ওদের নিকট থেকে হৃদয়
ফিরবে না আর সহজ তালে ॥

রাসুলুল্লাহ্‌র খেদমতে মুসলিম উম্মাহ্‌র দুদর্শা মুক্তির জন্য দু'আ করেছেন :

শবে পেশ খোদা বগরীস্তম যার মুসলমানান
চরা যারন্দ ওয়া খোদারন্দ
নেদা আমদ ব ময়দানী কেহ্‌ ঈঁ কাওম

www.pathagar.com

দিলে দারন্দ ওয়া মাহবুবে ন দারন্দ।
ন গোয়ম আয ফরো ফালে কেহ্ বগুজশ্‌ত
কেহ সোদ আয শরহে আহওয়ালে কি বুগুজ্‌শত্‌।

অর্থাৎ বলবো কী যে এদের কথা,
পঙ্গু গরীব দীন বেচারা,
দাও এদের জ্ঞানের শাবল
ভাঙতে পারে অজ্ঞ-কারা।
এদের নির্দয় হৃদয় পরে
দাও বুলিয়ে দয়ার পরশ
পড়ছে এরা ঘোর বিপাকে
রুদ্ধ এদের গতির ধারা।
বলবো কতো এদের কথা
ঠিক মতো সব বলাই যে ভার;
দেখছো তুমি এদের গোপন
এদের প্রকাশ— সকল ব্যাপার।

জাতির খেদমতে তাঁর বক্তব্য :

বরোঁ আয সীনা কশে তকবীর খোদ রা
বখাবে খোবীশ যন একসীরে খোদ রা।
খুদী রা গীর ও মাহকমে গীর ও খোশ যী
মদা দর দস্তে কিস্‌ তকদীরে খোদ রা।

অর্থাৎ প্রকাশ করো তোমার বুকের
তকবীরের ঐ উদার ধ্বনি।
তোমার কালো এই মাটিতে
বুলাও আপন পরশ মণি।
নিজের পায়ে দাঁড়াও নিজে
শক্ত হয়ে বাঁচতে শিখো,
তোমার কপাল তুমিই গড়ো
দূর করো ওর সকল শনি।

www.pathagar.com

জীবন সায়াহ্নে ইকবাল

১৯২৩ সাল ইকবাল কঠিন মূত্রাশয় রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় দু'বছর দিল্লীর বিখ্যাত হেকিম নাবীনা সাহেবের চিকিৎসায় সাময়িকভাবে আরোগ্য লাভ করেন। রোগাক্রান্ত হওয়ায় তঁর শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়ে। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি স্বীয় কর্মসূচি পরিত্যাগ করেননি। সংগঠনের কার্যাদি সুচারুরূপে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দায়িত্ব পালনে তাঁর একটুও শিথিলতা ছিল না।

রোগ মুক্তির পর পরই তাঁর প্রথমা স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। স্ত্রীর বিয়োগ ব্যথায় তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। মানসিকভাবে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। অবয়বেও চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। রোগা ক্লিষ্ট প্রৌঢ় বয়সে তাঁর যখন সেবা শুশ্রুষাপরায়ণ লোকের প্রয়োজন দেখা দিল, ঠিক তখনি তিনি তা থেকে বঞ্চিত হলেন।

১৯৩৪ সালে আবার মূত্রাশয়ের রোগ দেখা দিল। একই সাথে বাত রোগও। ফলে শারীরিকভাবে তিনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। চলা-ফেরা করার শক্তি তো হারালেনই, সে সাথে কণ্ঠের গুরু-গম্ভীর উদাত্ত স্বরও হারালেন। এবার বুঝতে পাররেন, তাঁকে শীঘ্রই পরলোকে যাত্রা করতে করতে হবে। তাই ১৯৩৫ সালে সপরিবারে 'জাভিদ মনযিলে' স্থানান্তরিত হন। এখানে কিছুকাল বসবাস করার পর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী জাভিদের মা ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে ইকবাল আরো কাহিল হয়ে পড়েন। আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে একে একে দু'জন সহধর্মিনীর ইন্তেকালের শোক সংবরণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ইকবাল এখন থেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আফতাব ইকবাল লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে এম.এ. ও বার এট-ল ডিগ্রী লাভ করে লন্ডনেই ব্যারিস্টারী করছেন, আদালতের কাজে তিনি ব্যস্ত। জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্বশুর বাড়িতে। কনিষ্ঠ পুত্র জাবিদ ইকবাল ও কন্যা মুনীরা জনৈকা মহিলার হাতে লালিত-পালিত হচ্ছিল। কবি এ সময় দুঃখ-শোক ও রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। একান্ত অনুরক্ত ভৃত্য আলী বখশ তাঁর সেবায় নিয়োজিত।

ইকবাল এবার মৃত্যুর সুধা পান করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অসমাপ্ত কাজ গুটিয়ে আনছেন। সময় আসন্ন বুঝতে পেরে সমস্ত সম্পত্তির উইল প্রস্তুত করে রেজিষ্ট্রি অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯৩৫ সালে 'ওসিয়তনামা' লিপিবদ্ধ করে রাখলেন।

এদিকে দিন দিন রোগ বেড়ে যেতে লাগলো। অন্যদিকে আয়ুস্কাল ক্রমান্বয়ে ফুরিয়ে আসতে লাগলো। জীবনী শক্তি নিস্তেজ-নিস্প্রভ হয়ে আসছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কথাবার্তা ও আলোচনা কালে তিনি ক্লান্তি অনুভব করতেন

www.pathagar.com

না। যারা প্রতিদিন কবিকে দেখতে আসতেন তারা তাঁর কাব্য, দর্শন, সুফিতত্ত্ব ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা শুনে কেউ বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, কবি গুরুতর রোগে আক্রান্ত এবং তিনি ভক্তদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে চির বিদায় গ্রহণ করবেন।

মৃত্যুশয্যায়

লাহোরের খ্যাতনামা ডাক্তার ও হেকিমগণ পালাক্রমে ইকবালের চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রোগের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ডাক্তারগণ বুঝতে পারলেন– এটাই তাঁর মৃত্যুরোগ। সুতরাং এ ব্যাধি আরোগ্য হবার নয়। কবি আর বেশিদিন ইহজগতে থাকবেন না। তাঁরা কবিকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার দিনের অপেক্ষায় রইলেন। প্রখ্যাত হেকিম মুহাম্মদ হাসান কারশী প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কবির সেবা শুশ্রুষায় নিয়োজিত থাকতেন। হেকিম সাহেব ছিলেন ইকবালের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম। তিনি তখন লাহোরে তিব্বিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল। তাছাড়া আরো অনেকে সাময়িকভাবে এসে খেদমত করতেন এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনতেন।
১৯৩৭ সালে মিসরের জামেয়া আযহারের শিক্ষাবিদগণ লাহোরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে জওহরলাল নেহরু মুমূর্ষু কবিকে দেখার জন্য লাহোরে আসেন। এ বছর মার্চ মাসের প্রথম দিকে কবির রোগ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেল। সমস্ত শরীর ফুলা দেখা দিল এবং হৃৎপিন্ড প্রসারিত হয়ে পড়ল। অবস্থা এতই মারাত্মক আকার ধারণ করলো যে, তখন বিছানা থেকে উঠে বসার শক্তি পর্যন্ত হারালেন। যৎসামান্য তরল পদার্থের খাদ্যদব্য গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু আহার বন্ধ হয়ে গেল। ভক্তরা যে হাদীয়া তোহ্ফা নিয়ে হাজির হতেন মহানুভব ইকবাল উপস্থিত লোকদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। শত চেষ্টা করে হয়তো তাঁর মুখে সামান্য আহার দেয়া হতো– অনাসক্তভাবে দায়ে ঠেকে তিনি কিছু খেতেন। আল্লাহ্র এ কী রহমত! এ সময়ও কবির জ্ঞান-শক্তি সুচারুরূপে কাজ করে যাচ্ছিল। তাঁর চিন্তাপ্রসূত আলোচনা তখনও অব্যাহত ছিল। জীবন মৃত্যুর এ ক্রান্তিকালের কঠিন মুহূর্তে তিনি মুখে মুখে 'ইসলাম আওর কাওমিয়া' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (প্রবন্ধটি বাংলায় অনূদিত হয়ে 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 'ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র' বইয়ে সংকলিত হয়েছে।)
৭ মার্চ কবির একান্ত বন্ধু ও ভক্ত অধ্যাপক গোলাম রসুল মিহর ও আবদুল আযীয তাঁকে দেখতে আসলেন। তাঁরা কবিকে চিন্তামুক্ত করার জন্য বললেন,

www.pathagar.com

'ইনশাআল্লাহ্ আপনি অতি সত্তর আরোগ্য লাভ করবেন।' তাঁদের কথা শেষ হতেই কবি বলে উঠলেন, 'মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, বরং সানন্দে অর্ভ্যথনা জানাবো।'

হিজায সফরের আশা

আল্লামা ইকবালের মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল, হিজায সফর করবেন। হিজায বলতে বিশেষ করে মক্কা-মদিনাকে বুঝায়। আল্লাহ্‌র ঘরে তাওয়াফ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর রওযা মুবারক মদিনার মুনাওয়ার যিয়ারত করার বাসনা ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের। কারণ তিনি নবীর আশেক ছিলেন। কবি তাঁর কবিতায় সেই জন্য হিজাযকে কোন ক্রমে ভুলতে পারেননি। হিজায সফরের জন্য তিনি বহুবার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন অসুবিধার কারণে যেতে পারেননি। হজ্জে যাওয়ার নিয়তেই তিনি 'আরমুগানে হিজায' 'হিজাযের উপহার' নামক কাব্য-গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে কিছু কিছু স্থান বাদ রেখেছেন হজ্জে গেলে সম্পূর্ণ করার আশায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁর এই অন্তিম বাসনা পূর্ণ হলো না।

ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে উপস্থিত ভক্তদেরকে তিনি জানালেন 'সাহরানপুর থেকে আমার একজন বন্ধু চিঠি লিখেছেন যে, তিনি এবার হজ্জে গিয়েছিলেন। বায়তুল্লাহ্ শরিফ তাওয়াফকালে আল্লাহ্‌র কাছে আন্তরিকভাবে দোয়া করেছেন, যেন আল্লাহ্ আমাকেও হজ্জে যাওয়ার তওফীক দেন। তিনি বলেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ দোয়া নিশ্চয়ই সাদরে কবুল হয়েছে।' অতঃপর ইকবাল অশ্রুসজল নয়নে উপরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আমার হিজায যাওয়া সম্ভব হবে না। বন্ধু লিখেছেন যে, 'দোয়া কবুল হয়েছে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়!'

মৃত্যুর প্রহর ঘনিয়ে আসছে

১৭ এপ্রিল (মৃত্যুর চার দিনে আগে) কবির একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু খ্যাতনামা দার্শনিকের সাথে ডারউইন ও নীটশের জটিল দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। শেষ অবস্থাতেও কবির বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি ও ভাবগম্ভীর আলোচনায় সবই মুগ্ধ হয়ে যান। ইকবাল বুঝি এবার তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার অন্বেষণকারীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে পরপারে পাড়ি জমাবেন, যাতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে জ্ঞান গোপন করার ও নিয়ামতের যথার্থ প্রচার না করার অপরাধে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয়।

ইকবালের দারুণ অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে প্রবাস জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জার্মান পণ্ডিত ফন ভেলসিম ২০ এপ্রিল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে ছুটে এলেন।

www.pathagar.com

দীর্ঘদিন পর উভয়ের মধ্যে পুনর্মিলন হওয়ায় পরস্পরে অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হলেন। ইকবাল ক্লান্তিহীনভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে দার্শনিক মতবাদের উপর সফল আলোচনা ও মত বিনিময় হলো। মি. ভেলসিম বিদায়ের সময় কবির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিলে ইকবাল বলে উঠলেন, 'বন্ধু! আমি মুসলমান, মৃত্যুর ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত নই। হাসি মুখেই তা গ্রহণ করবো।'

এদিন (২০ এপ্রিল) উত্তর আফ্রিকায় প্রকাশিত একখানা ইংরেজি পত্রিকা ডাকযোগে কবির নামে এল। স্যার আবদুল কাদের তাঁর পাশে বসা ছিলেন। ইকবাল পত্রিকাটি পড়ে শোনানোর জন্য তাঁর হাতে দিলেন। তিনি প্রথমে একটি খবর পড়লেন যাতে লেখা ছিল :

'উত্তর আফ্রিকার মুসলমানরা এক মহাসম্মেলনে আল্লামা ইকবাল, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কামাল আতাতুর্ক প্রমুখ মনীষীদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছে।' এ সংবাদ শুনে ইকবাল বলে উঠলেন, 'আমি তো আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছি। মি. জিন্নাহরই কেবল দায়িত্ব পালন করতে বাকী রয়েছে। এ জন্য মুসলমানদের উচিত তাঁর আয়ু বৃদ্ধির জন্য দোয়া করা!'

ঐ দিনই বিকেলে তাঁর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো। মৃত্যু-শয্যার চারপাশে শত শত ভক্ত কাঁদছে আর আল্লাহ্র কাছে আশু রোগ মুক্তির জন্য মুনাজাত করছে। কারণ কবি তাদের মাতাপিতার মতই বেশি শ্রদ্ধার পাত্র, একান্ত আপনজন। তবুও নিয়তির লেখা ফেরানো যাবে না। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, 'যখন কারও মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন এক মুহূর্ত আগে অথবা পরে করা হবে না।'

দুনিয়ার যত মনীষী এসেছেন আল্লাহ্র নিয়ম কারও বেলায়ই শিথিল করা হয়নি। কারণ সমস্ত সৃষ্টি মরণশীল। আল্লাহ্ বলছেন :

কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মাউত

প্রত্যেক সৃষ্ট জীবই মৃত্যুবরণ করবে। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন :

'কুল্লু মান আলাইহা ফানিউ ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রব্বিকা যুলযালালী ওয়াল ইকরাম'

'এ বিশ্ব চরাচরে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে আর বাকী থাকবে শুধু তোমার মহান প্রভুর আধিপত্য ও অস্তিত্ব।'

আল্লামা ইকবালের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনিও দুনিয়াবাসীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন এটাই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

২০ এপ্রিলের রাত এগারটার দিকে মুসলিম জাগরণের মহাকবি আল্লামা ইকবাল বিশ্বনবী (সা.) এর প্রতি মহব্বতের সাথে দুরুদ ও আল্লাহকে স্মরণ অবস্থায় চোখ বুঁজে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণের জন্য তাঁর রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট থেমে গেল। ভক্তরা বললেন, 'এবার তাঁকে আরামে ঘুমোতে দেয়া ভাল হবে। সুতরাং লোকজনের ভীড় কমানো উচিত।' এটা মনে করে অনেকেই নিজ নিজ বাসায় চলে গেলেন। এভাবে কবিকে ফেলে যেতে কারও ইচ্ছে হচ্ছে না, তবুও কী আর করা যায়? পাশে শুধু রইলেন আলী বখশ ও রাজা হাসান আখতার।

রাত প্রায় শেষ। সময় আনুমানিক চারটা তিরিশ মিনিট। জীবনে সর্বশেষ বারের মতো ইকবাল ঘুম থেকে জাগলেন। জেগে পুনরায় ছট্ফট্ শুরু করেছেন। আলী বখশ ও রাজা হাসান আখতার ডাক্তারের নির্দেশিত নিয়মে রোগ যন্ত্রণা উপশম করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এ সময় (মৃত্যুর আধ ঘন্টা পূর্বে) কবি নিম্নের দু'লাইনের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন :

'ঈমানদারের নিশানাটি বলতেছি ভাই তোদের তরে,
মৃত্যুকালে হাসিমুখে মৃত্যুকে যে বরণ করে ॥

২১ এপ্রিল ভোর পাঁচটায় কবি রাজা হাসান আখতারকে ডেকে বললেন, 'আখতার! আমি কী অবর্ণনীয় অবস্থায় আছি তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।' এ কথা শুনে আখতার বললেন, 'আচ্ছা! আমি এক্ষুণি হেমিক হাসান কারশীকে ডেকে নিয়ে আসছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।' এই বলে হেকিমের কাছে যেতে চাইলে কবি তাঁকে বাধা দিলেন এবং নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন : (মৃত্যুর দশ মিনিট আগে)।

জানিনা অতীত সুর আবার বাজবে কি না?
হিজাযী হাওয়া পুনঃ এদিকে বইকে কি না?
এ দীন ফকীরের নিঃশেষ হলো জীবন
অপর রহস্য ভেদী (জ্ঞানী) জানিনে জন্মে কি না?

তারপরও আখতার সাহেব অবস্থা বেগতিক দেখে হেকিমের কাছে ছুটলেন। পাশে আলী বখ্শকে রেখে গেলেন। আলী বখ্শ মাথার কাছে বসে একাকী শুধু আল্লাহ্-আল্লাহ্ যিকির করছেন। আর দোয়া-কালাম পড়ছেন। কিছুক্ষণ পর কবি হাত-পা প্রসারিত করে উপরের দিকে চোখ মেলে আলী বখশকে ডেকে বললেন, 'আলী! আমার প্রাণ প্রদীপ একটু পরেই নিভে যাবে। আমি

www.pathagar.com

তোমাদের থেকে চির বিদায় নেবো। মনে কোন প্রকার কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিও।'

এরপর ডান হাত 'রূহের'[১] উপর রেখে বিনয়ের সুরে বললেন, 'আয় আল্লাহ্! আমার এখানে সাংঘাতিক ব্যথা!... সেই মুহূর্তে মুখমণ্ডলখানি কিবলার দিকে ঢলে পড়লো। আলী বখশ তৎক্ষণাৎ ডান হাত আবার বুকের উপর তুলে দিল। আল্লাম ইকবালের মুখে তখন স্মীত হাসির রেখা।

২১ এপ্রিলের সুবহে সাদিকের আলোতে পূর্বাকাশ ঝলমল হয়ে উঠলো। সময় সোয়া পাঁচটা। চারিদিকে ফজরের আযান ধ্বনিত হচ্ছে, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর... আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.....আশহাদু আন্না মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ... আল্লামা ইকবাল আযানের সেই ধ্বনির সাথে সুর মিলিয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমা পড়তে পড়তে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলে গেলেন। (ইন্না লিল্লাহি...রাজেউন)

একটু পরেই পূর্বাকাশে উদিত হবে সোনালী কিরণ নিয়ে সূর্য। আর অন্য দিকে ইসলামের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, খ্যাতনামা আইনবিদ, দার্শনিক, সুফিকবি, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক ও শতাব্দীর প্রদীপ্ত ভাস্কর মহাকবি আল্লামা ইকবাল চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন, যে নিদ্রা থেকে তিনি কিয়ামতের আগে আর জাগবেন না। ভক্ত-অনুরক্ত ও শিক্ষার্থীর সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা করবেন না। মুসলিম মিল্লাতের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে পরামর্শ দেবেন না। মুসলিম জাহানের প্রতিনিধি হয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে কোন বক্তব্যই রাখবেন না।

আলী বখ্শের তখনও বিশ্বাস হয়নি যে, কবি এখন আর বেঁচে নেই। তাই সে পাশের বাড়িতে অবস্থানরত ড. আব্দুল কাইউম ও শফী সাহেবের কাছে দৌড়ে গিয়ে খবর দিয়ে আসলো। তাঁরা এসে দেখেন, ইকবাল আর আমাদের মাঝে নেই। ইতোমধ্যে রাজা হাসান আখতারও হেকিম নিয়ে উপস্থিত। হেকিম হাসান কারশী শিরা পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা দিলেন। মৃত্যুকালে ইকবালের বয়স ছিল ইংরেজি সন হিসেবে ৬৫ বছর ১ মাস ২৯ দিন আর হিজরী সন হিসেবে ৬৬ বছর ১ মাস ২৪ দিন।

সকালে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর লাহোর ও পাঞ্জাবের সরকারী অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটি ও মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনই সারা বিশ্বে এ খবর প্রচারিত হয়। সেদিন মুসলিম জাহানের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। আল্লামা ইকবালের মৃত্যুতে মুসলিম-বিশ্ব যেন পিতাকে হারালো। তাই কবি বলেছেন :

---

১. বিশেষজ্ঞগণের মতে মানুষের বাম স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে রূহ (প্রাণ) রয়েছে)।

www.pathagar.com

এমন মহৎ জীবন করিবে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন ॥

দাফন

ইন্তেকালের পর চৌধুরী মুহাম্মদ হুসাইন (এম.এ) ও ড. মুজাফফর উদ্দীন লাহোর শাহী মসজিদের পাশে হাজুরীবাগে তাঁকে দাফন করার স্থান নির্ণয় করে এলেন। কিন্তু পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খানের অনুমতি ব্যতিরেকে সেখানে দাফন করা যাবে না। সুতরাং সবাই পরামর্শে মিলত হলেন। সাইয়েদ মুহসিন শাহ, খলিফা শুজা উদ্দীন, সা'আত আলী খান, মিয়া নিজাম উদ্দীন, মিয়া আমীর উদ্দীন, মাওলানা গোলাম মোরশেদ, মাওলানা আবদুল মজীদ, চৌধুরী মুহাম্মদ হুসাইন, মাওলানা গোলাম রসুল মিহ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ শাহী জামে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। যাতে দাফনের জায়গা চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। মসজিদের দরজার বাম পার্শ্বে যে জায়গাটুকু খালি ছিল সেটা তাঁরা উত্তম বিবেচনা করলেন। সুতরাং এবার দাফন করার অনুমতির জন্য তৎপর হলেন। পাঁচজনের একটি প্রতিনিধিদল পাঞ্জাবের গভর্নরের উদ্দেশ্য রওয়ানা দিলেন। তাঁরা পৌঁছেই গভর্নরের সাথে দেখা করে উক্ত জায়গায় তাঁর দাফনের অনুমতির জন্য আবেদন করলেন। জায়গাটি প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিধায় দিল্লীর অনুমতির প্রয়োজন। গভর্নর অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে জোর সুপারিশ করে দুপুর বারোটার মধ্যে অনুমতি আনলেন এবং বিকেল চারটার মধ্যে অনুমতির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথারীতি তাদের হাতে দিয়ে খুশী মনে বিদায় করলেন।

নামাযে জানাযা

আল্লামা ইকবালের মরদেহ গোসল দেয়া হলো। গোসল শেষে জাভিদ মনযিল থেকে বিকেল পাঁচটার সময় দাফনের উদ্দেশ্যে খাঁটিয়া বের করা হলো। হাজার-হাজার ভক্ত-অনুরক্তরা সবাই খাটিয়া কাঁধে নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলেন। তাই খাটিয়ার সাথে লম্বা লম্বা বাঁশ বেঁধে দেয়া হলো। যাতে বেশি লোক কবির কফিন বহন করার সুযোগ লাভে ধন্য হয়। শাহী মসজিদের দিকে জানাযা রওয়ানা হলো। পাঞ্জাবের গভর্নরের তরফ থেকে তাঁর চীফ সেক্রেটারী ও ভাওয়াল পুরের নবাবের পক্ষ থেকে তাঁর সেক্রেটারী খাঁটিয়ার উপর মূল্যবান চাদর ও ফুল স্থাপন করলেন।

রাস্তার দু'পাশে অপেক্ষমান জনতা খাটিয়ার উপর ফুল ও আতর ছুঁড়তে লাগলো। সবার মধ্যে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। ভক্তরা খাটিয়ার পেছনে

www.pathagar.com

পেছনে হাঁটছে। মন্ত্রী-সেক্রেটারী, উকিল-ব্যারিস্টার, কবি-সাহিত্যিক, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী-চাকরিজীবি, কৃষক-মজুর ও সাধারণ মানুষ জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগলেন। শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া প্রহরাধীনে লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শত শত স্বেচ্ছাসেবকও নিয়োজিত করা হয়েছিল। অবশেষে কফিন জানাযার স্থানে পৌঁছলো।

প্রথমে পরিকল্পনা ছিল লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ময়দানে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হওয়ার। কিন্তু জনতা সংকুলান হবে না দেখে দিল্লী দরওয়াজার কাছে উন্মুক্ত ময়দানে নিয়ে যাওয়া হলো। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সেখানে লাশ পৌঁছলো। শুরু হলো নামাযের প্রস্তুতি। লোকের সমাগম বেশি হওয়াতে কাতার ঠিক করতে অনেক সময় লেগে যায়। রাত আটটার সময় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। নামায শেষে মুসল্লীদের মধ্যে কবিকে শেষ বারের মতো এক নজর দেখার জন্য হিড়িক পড়ে যায়। অতঃপর রাত পৌনে দশটার সময় লাহোর শাহী মসজিদের হাজুরীবাগে মুসলিম জাগরণের মহাকবি ও আশেকে রাসুল আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালকে দাফন করা হয়। দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে তিনি এখানে কবরবাসী হলেন।

ইকবালের মাযারে

আল্লামা ইকবাল নামযাদা কবি
মরেও অমর তিনি চিরদিনের রবি ॥

মহাকবি ইকবাল ছিলেন একজন অমর ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ্ রাসুলের একজন খাঁটি অনুসারী, একজন মকবুল বান্দা। তাঁর রূহানী শক্তি ছিল খুবই শক্তিশালী। ইসলামী সুফিবাদের তিনি ছিলেন অন্যতম সংস্কারক। ইমাম গাযযালী (রা.) এর পাঁচশত বছর পর এরকম একজন মহাপুরুষ না এলে বিংশ শতকের মুসলমান ও ইসলামের কী দুর্দশা এবং বিকৃতি ঘটতো তা বলার অবকাশ রাখে না। জীবদ্দশায় যে ইকবাল আমাদের মাঝে ছিলেন মৃত্যুর পরও তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। এ কথার মর্মার্থ বুঝাতে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে :

মুরতজা আহমদ খান কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে কোন এক রাতে ইকবালের মাযার যিয়ারত করতে গেলেন। যাতে তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে ও আল্লাহ্ ভয় সঞ্চারিত হয়। যখন তাঁরা মাযারের সন্নিকটে পৌঁছলেন তখন দেখলেন, 'একজন জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ ফকির ইকবালের কবরের পাশে কুরআন

www.pathagar.com

তিলাওয়াত করছেন। তিনি একপারা তিলাওয়াত সমাপ্ত করে নিম্নের আয়াতটি পড়লেন,

'আলা ইন্না আউলিয়াল্লাহি লা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহযানুন'

'আর জেনে রেখো! আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি অলি-আল্লাহ্‌দের কোন ভয়-ভীতি নেই অথবা তাদের কোন প্রকার চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই।' অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি দাঁড়িয়ে গেলেন আর নিম্নের কবিতাটি পড়লেন :

ইকবাল প্রেমিক আল্লাহর প্রেম বুকে
নবীর প্রেমকে রেখেছেন হৃদয়েতে,
কুরআনের বাণী নিয়ে ছুটেছেন অবিরাম
নবীর আদর্শ প্রেম তৌওহীদের পয়গাম ॥

ইকবাল মহান প্রেমিক সুফিদের মাহ্‌ফিল
ইশকের শরাবেতে কুরআনের মনযিল,
দীদারে এলাহীতে আশেকে রাসুল
ঘুমালেন শান্তমনে অনন্তের বুলবুল ॥

তাঁদের মধ্যে একজন লোক এই ফকিরের পেছনে পেছনে গেলেন। ফকির চুপে-চুপে হাঁটতে লাগলেন কিন্তু উপর্যুপরি কয়েকবার ডাকার পরও কর্ণপাত করলেন না।

মুরতজা আহমদ খান এভাবে প্রত্যেক রাতে তাঁর একজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে কবির মাযারে যেতেন। আরেক দিনের ঘটনা–

একজন ফকির মাযারে মুরাকাবায় রত। এ সময় তিনি অনেক দোয়া-দরূদ পড়ছিলেন। অতঃপর দোয়া শেষে ফিরে যাওয়ার সময় নিম্নের আরবী কবিতা পড়লেন যার বাংলা তরজমা হল :

'এটা বায়তুল আতীক (বায়তুল্লাহ্)-এর মতো সম্মানিত। এর কাছে পৃথিবীর প্রত্যন্ত-প্রান্তর থেকে লোকেরা ছুটে আসে।

এ কবিতা শুনে মুরতজা খান চমকে উঠলেন। কারণ তাঁর ধারণায় এ লোক সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, অথচ এ রকম তত্ত্বপূর্ণ কবিতা!

মুর্তজা খান আরো বর্ণনা করেছেন :

আমি একবার খাটে শোয়া অবস্থায় অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করতেছিলাম। রাত তখন তিনটা। অন্তরে শুধু মরহুম কবি আল্লামা ইকবালের স্মৃতি উদিত হতে লাগলো। নিঃসঙ্গ অবস্থায় কবির মাযারের দিকে চললাম। এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ আমাকে সেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন আমি কবরের সন্নিকটে

www.pathagar.com

পৌঁছলাম তখন লাহোরের একজন মজযুব বুজুর্গকে দেখলাম। তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। তিনি কবরের পাশে বসে কি যেন পড়েছিলেন। আমিও কবরের কাছে গিয়ে সুরা ফাতিহা পড়লাম। অবশ্য আমি বেশ কয়েকদিন এভাবে সুরা ফাতিহার সাথে অন্যান্য সুরা মিলিয়ে পড়ছিলাম। আমার এ কয়দিনে হয়তো দুরুদ পড়া হয়নি কিন্তু আজকে এ সময়ে তিনি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর একান্ড দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বুযুর্গের চক্ষুদ্বয় রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে আর জ্বলজ্বল করছে। যিয়ারত শেষে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, 'হুজুর আপনি অকারণে কেন হাসছেন? এদিকে আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি।' তিনি চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, 'তোমার জানা নেই– আজ রাসুল (সা.)-এর সওয়ারী এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। আর আমি এখানে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে দুরুদ পড়ছি আর পাহারাদার নিযুক্ত হয়েছি।'

তিনি আরও বললেন, 'যখনি সময় পাবে আল্লাহকে স্মরণের সাথে সাথে মহব্বতের সহিত রাসুল (সা.)-এর প্রতি সদা-সর্বদা দুরুদ পড়বে। এ মাযারে শায়িত মহান ব্যক্তি নবীর আশেক ও মহব্বতের বুলবুলি হিসেবে আল্লাহর মাহবুব বান্দায় অভিষিক্ত হয়েছেন।'

আমি এ মহান বুযুর্গের এসব কথাবার্তা শুনে আশ্চর্যান্বিত হতে লাগলাম এবং মনে মনে ভীষণ ভয়ও পেয়ে গেলাম। কারণ সত্যিই আমি এ কয়দিনে কোন প্রকার দুরুদ পড়ার কথা মনে করতে পারছিলাম না। আর ইবাদতের প্রতি উদাসীন ছিলাম। সে কারণে আল্লামা ইকবালের নাম স্মরণ করে তাঁর মাযারে দিকে ছুটে এসেছি। এখানে এসেই আমার ভুলগুলোর কথা ভেবে অনুতপ্ত হলাম। এর সাথে সাথে ভয়ে আমার শরীর থেকে ঘাম ছুটতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসলাম। সারা রাত খাটের উপর অচেতন অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু যখন মজ্জুব বুযুর্গের কথা ভেবে গভীর ধ্যানে আল্লাহর তাওহীদের যিকিরের পর নবীর প্রতি মহব্বতের সহিত দুরুদ পড়তে শুরু করলাম অন্তরে গভীর প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলাম। আর এভাবেই হৃদয়ে প্রশান্তির ধারা বইতে লাগল।

www.pathagar.com

ইকবালের সুফিভাব ও দর্শনতত্ত্ব

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও দর্শনতত্ত্বের প্রখ্যাত মনীষীগণ আল্লামা ইকবালের খুদীতত্ত্ব ও আত্মবিলয়ের রহস্য সম্পর্কে গবেষণা করে তাঁকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সুফিকবি ও মুসলিম দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও সুফিবাদের ক্ষেত্রে তার অবদানের কথা চিন্তা করে ইকবালকে আধুনিক সুফিতত্ত্বের আলোচিত ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সুফিকবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মনীষীদের আগ্রহ ছিল সীমাহীন। তিনি মুসলিম জাতিকে সকল প্রকার কলহ দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হবার উপদেশ দানে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন।

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের দর্শনতত্ত্বকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—

১. স্বজ্ঞা
২. খুদী
৩. জড় জগৎ ও
৪. খোদা।

১. **স্বজ্ঞা:** তিনি মনে করেন 'স্বজ্ঞাই' জ্ঞানের উৎস। স্বজ্ঞা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক। বুদ্ধি ব্যক্তি নির্ভর। ড. আল্লামা ইকবাল যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে, স্বজ্ঞা বিশ্লেষণ যোগ্য নয় বরং অবিভাজ্য। এটি হৃদয়ের এক বিশেষ গুণ। স্বজ্ঞা দ্বারা 'কালকে' প্রত্যক্ষ করা যায়। জ্ঞানের উর্ধ্বে মহাজ্ঞানকে 'স্বজ্ঞা' বলে। এটি অতীন্দ্রীয় অনুভূতি যা পরম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করায়।

২. **খুদী:** খুদী বা আত্মসত্তার উপর ইকবাল দর্শন প্রতিষ্ঠিত। খুদীকে আমরা স্বজ্ঞার মাধ্যমে অনুভব করি। যে কোন পরিবেশে খুদী তার অস্তিত্ব বজায়

www.pathagar.com

রাখে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা এই খুদী প্রতিষ্ঠিত হয়। কঠোর পরিশ্রম ও সাধণা দ্বারা খুদী অর্জিত হয়।

৩. **জড় জগৎ:** ইকবালের মতে জড়জগতের অস্তিত্ব আছে। স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা একে অনুভব করি। জগৎ হচ্ছে আমিত্বের প্রকাশ। আমিত্বে আত্মার প্রকাশ। জগতের পরিবর্তনের মধ্যে এক স্থিতিশীল প্রাণশক্তি বিদ্যমান। জগৎ প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত একটি সৃজনশীল প্রাণস্বরূপ।

৪. **খোদা:** খোদা পরম সত্তা এবং পরম খুদী। তিনি দেশ কাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। জগতের সবকিছু পরম খুদীর বহিঃপ্রকাশ। তিনি সর্বজ্ঞাতা, সর্বশক্তিমান এবং চিরন্তন। তিনি অনাদি, অনন্ত, চির অস্তিত্বশীল।

ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (র.)-কে মরমী বাদী মুসলিম দার্শনিক বলা হয়। ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাধক সম্প্রদায়ের নিকট তিনি দার্শনিক ছাড়াও সুফিকবি ও মুসলিম জাগরণের অগ্রসৈনিক রূপে পরিগণিত। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা ও সুফি কবিতা মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিশা নির্দেশ করেছে। এক সময়ে দুনিয়াব্যাপি মুসলমান জাতির কর্তৃত্ব, বিজয়, বীরত্ব, গৌরব ও মহানুভবতার কথা স্মরণ করে দিয়ে তিনি সামনে এগিয়ে চলার নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান করেছেন। সব ব্যর্থতা ভুলে মহান আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছেন। মুসলিম দর্শনকে তিনি অনেক উর্ধ্বে স্থান করে দিয়েছেন। ইসলামকে তিনি এক যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল ধর্ম বল আখ্যায়িত করে সঞ্জীবনী সুধা দান করে গেছেন।

মুসলিম জাতির নব জাগরণই ছিল আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারার মূল লক্ষ্য। এজন্য তিনি সমগ্র মুসলিম জাতির জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে সাম্য, মৈত্রী, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পতাকাতলে সমবেত হবার আহ্বান জানান। তাঁর কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে বিশ্ব জনীনতা : —

'আরব আমার, চীন আমার
ভারত আমার, নয়কো পর
মুসলিম আমি, দুনিয়া আমার
সারা জাহানে বেঁধেছি ঘর।'

—ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (র.)

www.pathagar.com

তিনি গোড়ামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রগতিশীল ধর্মপ্রাণ মুসলমান হতে আহ্বান করেন। ইসলামের ভাবধারা সমাজতান্ত্রিক চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা দান করেন। পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার শক্ত ও দৃঢ় অবস্থান ছিল। তাঁর দার্শনিক উক্তি ছিল—'নিজেকে না জানলে নিজেকে বিকশিত করতে না পারলে জীবন বৃথা'—এটাই খুদীতত্ত্বের মর্মকথা।

অপরদিকে 'খোদাবাদ' তত্ত্বের আলোচনায় ইকবাল মানুষের ভেতরে শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শয়তান আমাদেরকে লোক দেখানো এবাদতের জন্য প্রলুব্ধ করে ও উৎসাহ যোগায় তাই তিনি মুসলমানদের কুরআনের মহান শিক্ষা ও বিশ্বনবীর আদর্শের অনুসরণীয় পথে একনিষ্ঠভাবে দাখিলের আহ্বান করেছেন।

মানুষের মনে লুক্কায়িত সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও মারাত্মক অপর এক দোষ হলো অন্যান্যদের সমর্থন, জনমত গড়ে ওঠা, মানুষের স্বীকৃতি পাওয়া এই সব। এসব সমর্থন ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। যেখানে অর্থ-সম্পদ বিবেচ্য, সেখানে আর্থিক জৌলুস মুখ্য ভূমিকা পালন করে; যেখানে আত্মসম্মানবোধকে শ্রদ্ধা জানানো হয়, সেখানে সামাজিক মর্যাদাবোধের ভিত্তিতে এসব কিছু পরিমাপ করা হয়। বিশ্বাসীরা তাদের ধর্মীয় বিধিনিষেধ প্রতিপালনে অগ্রসর হলে শয়তান এ সুযোগ গ্রহণ করে তাকে ধ্বংসের জন্য। যাদের হৃদয়ে সত্যিকারে সত্য নেই, তারা ধর্মীয় কাজ গুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নয় বরং সামাজিক অবকাঠামোর ধর্মীয় বৃত্তে সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের জন্যই করে। এসব লোক সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে :

পরন্তু ধ্বংস সেই মুসল্লীদের জন্য, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে গাফলতি প্রদর্শন করে। যারা লোক দেখানো কাজ করে।

—সুরা মাউন : ৪-৬

ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ যে শয়তান মানুষকে মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটাবার চেষ্টা করে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্যের কাছে সুনাম কুড়াতে চায়, লোক দেখানের জন্য নামায পড়ে ও সম্পদ ব্যয় করতে চায় তারা শয়তানের সঙ্গীতের লহরীতে পরিণত হয় :

সে সব লোকদের আল্লাহ পছন্দ করেন না, যারা নিজেদের ধন-মাল শুধু লোকদের দেখানোর ছলে ব্যয় করে থাকে আর প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আর না পরকালের প্রতি। সত্য কথা এই যে, শয়তান যার সঙ্গী হয়েছে, তার ভাগ্যে খুব কারাপ সঙ্গীই জুটেছে।

—সুরা নিসা : ৩৮

www.pathagar.com

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা বিশ্বাসীদের জন্য এক বড় সুযোগ। এভাবে একজন বিশ্বাসী পরকালে মুক্তির জন্য নিজেকে পবিত্র করতে পারে। লোক দেখানো স্পৃহা শয়তানের এক নীচ প্রবৃত্তি এটি বিশ্বাসীর ওপর প্রয়োগ করে তার মূল্যবান এবাদত বিনষ্ট করার প্রয়াস চালানো হয়। ফলে না ঈমানদার পরিচ্ছন্ন হতে পারে, না মুক্তির আশা করতে পারে। তাই বিশ্বাসীকে আল্লাহর রাহে খরচ করার সময় শয়তানের এই ওয়াসওয়াসা থেকে সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে এবং সর্ব কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে। এই চোরা গর্ত সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে :

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সে ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না, যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-মাল ব্যয় করে আর না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না পরকালের প্রতি। তার খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ; যেমন একটি পাথুরে চাতাল, যার ওপর মাটির আস্তর পড়ে ছিল—এর ওপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে গেল এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে পড়ে রইল। এসব লোক দান সদকা করে পুণ্য অর্জন করে, তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফিরদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করা আল্লাহর রীতি নয়।

—সুরা বাকারা : ২৬৪

শয়তান কোরআনের পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তাই ইকবাল কোরআনের আদর্শে ইজ্জীবিত হতে মুসলমানদের আহ্বান করেছেন। শয়তান আল্লাহর পথ পরিক্রমার বিরোধিতা করে এবং কোরআনের বাণী থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে। কুরআন না পড়া ও না মানার পরিণাম দোযখের কঠিন শাস্তি। আর শয়তানের কামনাও তাই।

যে ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় কোরান থেকে মুখ ফেরালো সে মূলতঃ আল্লাহ থেকেই মুখ ফেরালো। কেননা কোরান আল্লাহর বাণী এবং বিশ্বাসীদের জন্য জীবন ব্যাপী আলোর উৎস। যারা কুরআনের ঐশী বাণীকে বিশ্বাস করে না, কুরআনের নির্দেশনা মতে জীবন যাপন করে না, তারা বেশি ভয়াবহ বিপদের, শয়তানের আশঙ্কা করতে পারে। তারা যদি বিষয়টি বুঝতে না পারে তবে এই অজ্ঞতা তাদের শয়তানের বৃত্তে নিয়ে যাবে, শয়তানের মুষ্টির ভিতর থাকবে, শয়তানকেই বন্ধু মন করবে। কুরআনে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে :

যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ হতে গাফিল হয়ে জীবন যাপন করে আমরা তার ওপর এক শয়তানকে চাপিয়ে দেই এবং সে এর সঙ্গী-সাথী হয়ে যায়। এই

www.pathagar.com

শয়তানেরাই এই লোকদেরকে হেদায়েতের পথে আসতে বাধা দেয়; কিন্তু এরা নিজেরা মনে করে যে, আমরা সঠিক পথেই চলছি।

—সুরা যুখরুফ : ৩৬-৩৭

এ ধরনের বেখেয়ালীপনা তার ওপরই ক্রিয়াশীল যে পরকালের জীবন-সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছে। সে নিজের খেয়াল-খুশিকেই পথপ্রদর্শক বানিয়ে নিয়েছে। এ ধরনের লোক শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজের আরাম আয়াশে নিমগ্ন থাকে এবং আল্লাহর নাম তার অন্তরে উদয় হয় না, এ ধরনের মানুষ আস্তে আস্তে পশু স্তরে নেমে যায়। পশুর মতই তার চাহিদা। ঘুমের সুখ, খাওয়ার সুখ, আলস্যের সুখ, যৌন সুখ। এ ধরনের নির্লিপ্ত অবস্থা তাকেই আক্রমণ করবে যার পরকালের চিন্তাভাবনা নেই, দুনিয়ার মোহ ও সুখে যে বিভোর, এবং যে নিজ নফসের দাস।

এদের সামনে সে ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করো, যাকে আমরা আমাদের আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলাম; কিন্তু সে সেই আয়াতসমূহ পালন করার দায়িত্ব এড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শয়তান তার পশ্চাতে ধাওয়া করল আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। আমরা চাইলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম; কিন্তু সে তো জমিনের দিকেই ঝুঁকে পড়ে থাকল এবং স্বীয় নফসের খায়েশ পূরণেই নিমগ্ন হলো। ফলে তার অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেল; তুমি তার ওপর আক্রমণ করলেও সে জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে আর তাকে ছেড়ে দিলেও জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে। আমাদের আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা মনে করে অমান্য করে, তাদের দৃষ্টান্তও এটাই। তুমি এই কাহিনী সমূহ তাদেরকে শুনাতে থাকো; সম্ভবত তারা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে।

—সুরা আরাফ : ১৭৫-১৭৬

একজন ঈমানদার অনেকবার কোরান পড়লেও শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুস্কর হতে পারে। শয়তানের প্রলুব্ধ করার অস্ত্র নানা রকম, সে ঐসব ব্যবহার করে ঈমানদারদের ঘায়েল করার চেষ্টা করে। যেহেতু শয়তান জানে যে, কুরআনের প্রতি ঈমানদারের কি তীব্র আকর্ষণ, তাই সে এমনসব কৌশল খুঁজে যা প্রয়োগ করলে মানুষ ও কুরআনের মাঝে তফাৎ সৃষ্টি হয়।

কুরআনের নির্দেশনানুসারে যারা পথ চলতে চায়, তাদের জন্য এ এক বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি। কোরান পাঠ করার পর, অনেকেই কুরআনের নির্দেশনা ও তার ওপর আপতিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, বুঝতে হবে, এমন ব্যক্তির হৃদয় শক্ত ও কঠিন হয়ে গেছে। নবী করিম (সা.) বলেছেন যে, এমন এক সময় আসবে মানুষ কোরান পাঠ করবে, কিন্তু তা কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না

www.pathagar.com

(হৃদয়ে পৌঁছবে না)। এই পরিস্থিতি থেকে সাবধান থাকতে হবে এবং আল্লাহর যিকির করতে হবে :

ঈমানদার লোকদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় আল্লাহর যিকিরে বিগলিত হবে এবং তাঁর নাযিলকৃত মহাসত্যের সম্মুখে অবনত হবে এবং তারা সেই লোকদের মতো হয়ে যাবে না, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে; এতে তাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গেছে এবং আজ তাদের অনেকেই ফাসেক হয়ে রয়েছে?

—সুরা হাদিদ : ১৬

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের শক্তভাবে কোরান আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, যেন শয়তানের ফাঁদে না পড়ে। কেননা, সারা জীবন কোরানই তার গাইড। তাছাড়া বিশ্বাসীরা প্রশ্নবিদ্ধ হবে শুধু শুধু পড়ার জন্য, যদি না কোরান গভীর মনোযোগসহ অধ্যয়ন করা না হয় এবং নির্দেশনা অনুসরণ করা না হয়।

আল্লাহর আয়াত ও হেকমতপূর্ণ যে সব কথা তোমাদের ঘরে শোনানো হয়ে থাকে সেগুলো স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সবচেয়ে বেশি অবহিত।

—সুরা আহবান : ৩৪

আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে যথোপযুক্তভাবে পড়ে, এর প্রতি নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনে। যারা এর সাথে কুফুরী আচরণ করে, মূলত তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

—সুরা বাকারা : ১২১

বিস্মরণশীলতা বা ভুলে যাওয়া শয়তানের একটি মারাত্মক অস্ত্র যা সে অহরহ মানুষের ওপর প্রয়োগ করে থাকে, অথচ মানুষ একে শয়তানী খেলা মনে করে না। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে সে এই কৌশল প্রয়োগ করে চলে। আলোচ্য বিষয়টিকে এখানে সাধারণ ভুলে যাওয়াকে বুঝানো হয়নি। যদিও শয়তান এমনটিও করে থাকে। ভাবতে অবাক লাগে, মানুষ ৬০ বা ৭০ বছর গড়ে যে আয়ু পায় তার পুরো সময়েই সে ধর্ম সম্পর্কে বেখেয়াল থাকে। আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়। তারা চিন্তা করে না সৃষ্টি সম্পর্কে, দুনিয়ায় আগমন, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ধর্মের বাণী এসব তারা বুঝতে চায় না। অনেকের এই উদাসীনতা তাদের কবরের কাছে নিয়ে যায় তবু বোধ হয় না। কুরআনে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

... অধিক পার্থিব সুখ-সম্পদ লাভের চিন্তা চরম গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। এমন কি তোমরা কবর পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হও। (তারপরও তোমরা বুঝতে পারো না)

—সুরা তাকাসুর : ১-২

শয়তান আল্লাহর স্মরণ থেকে মানুষকে গাফেল করে। মুনাফিকরাও সর্বক্ষণ শয়তান পরিবেষ্টিত থাকায় তারাও আল্লাহকে ভুলে থাকে। আল্লাহকে ভুলে থাকার লোকদের শয়তানের দলবদ্ধ লোক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে :
শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসেছে এবং সে তাদের অন্তর হতে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দলভুক্তলোক। জেনে রাখো, শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

—সুরা মুজাদালা : ১৯

শয়তান বিশ্বাসীদেরও ভুলে যাওয়ার বিষ মন্ত্রণা প্রয়োগ করে। এদের ওপর যে বিস্মরণ প্রয়োগ করা হয় তা মূর্তিপূজক ও মুনাফিকদের চেয়ে ভিন্নতর। বিশ্বাসীরা যখন তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রস্তুত হয় তখন শয়তান তাদের ওপর 'ভুলে যাওয়ার' তীর নিক্ষেপ করে। প্রত্যেকেই, তার ধর্মীয় চেতনার বিষয়ে প্রতি মুহূর্তে এই জীবনে পরীক্ষিত হচ্ছে। তাই একজন ঈমানদারকে সব সময় সচেতন থাকতে হচ্ছে। যারা কোরান নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে তাদের সাথে অবস্থান করলে শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্তই করবে। আল্লাহ তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথা বলেছেন :
তুমি যখন দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহের দোষ সন্ধান করছে তখন তাদের নিকট হতে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা এই প্রসংগের কথাবার্তা বন্ধ করে অপর কোন কথায় মগ্ন হয়। আর শয়তান যদি কখনো তোমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়, তবে যখনি তোমার এই ভুলের অনুভূতি হবে, এরপর এই জালিম লোকদের কাছে বসবে না।

—সুরা আনআম : ৬৮

মূলত আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তার বাইরে তো কিছুই ঘটবে না :
কোনো জিনিষ সম্পর্কে কখনো একথা বলো না যে, আমি কাল এ কাজটি করব। যদি আল্লাহ তা না চান। যদি ভুলবশত মুখ হতে এরূপ কথা বের হয়ে পড়ে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার রবকে স্মরণ করো আর বলো : আশা করা যায়, আমার রব এ ব্যাপারে সত্যের নিকটবর্তী কথার দিকে আমাকে পথনির্দেশ করবে।

—সুরা কাহাফ : ২৩-২৪

www.pathagar.com

ভুলে যাওয়া সম্পর্কে আমরা হযরত মুসা (আ.) কাহিনীতে পাই যে এক তরুণ সহকারী, যে হযরত মুসা (আ.) সাথে ভ্রমণ করছিল, মাছ আনতে ভুলে যায়।
সে (খাদেম), বলল : আমরা যখন সে প্রস্তর ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটনা ঘটেছিল তা কি আপনি লক্ষ করেননি? মাছের প্রতি আমার কোন লক্ষ ছিল না আর শয়তান আমাকে এমনভাবে বে-খেয়াল বানিয়ে দিয়েছিল যে, আমি (আপনার নিকট) এর উল্লেখ করতেও ভুলে গিয়েছিলাম। মাছ তো আশ্চর্য রকমভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেছে।

—সুরা কাহাফ : ৬৩

বিশ্বাসীদের আত্মভোলা মন থেকে সাবধান থাকতে হবে এবং যে যে কারণ গুলো এখানে এই কাজে ক্রিয়াশীল তা বিবেচনা করতে হবে। ঈমানদার আনমনা থাকতে পারে না, কাল্পনিক কোন দৃশ্য যা তার মনকে আকর্ষণ করে, ছোটখাট বিষয় নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখে, এসবে মনোনিবেশ করতে পারে না। এরূপ ছোটখাট বিষয় বড় ধরনের গাফলতির জন্ম দেয়। ঈমানদারের জন্য তা খুবই ক্ষতিকর :
হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ'তা আলাকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাকো। আল্লাহ নিশ্চিতই তোমাদের সে আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাকো। তোমরা সে লোকদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা বানিয়ে দিয়েছেন। এ লোকরাই ফাসিক।

—সুরা হাশর : ১৮-১৯

দুনিয়ার খেল-তামাশার দিকে মন নিবদ্ধ না করে বিশ্বাসীকে সব সময় এক আল্লাহকে স্মরণে রাখা উচিত; তাঁকে ভয় করা উচিত এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা উচিত। এসব গভীরভাবে মনে না রাখলে মানুষ যে কোন সময় শয়তানের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়তে পারে।

জড়বাদের প্রতি ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি

পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিরের চটকের মধ্যে তাহার ব্যর্থতা ও শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে ইকবাল বলেছেন :

'দিয়ারে মাগ্ রিবকে রহ্‌নেওআলো! খুদাকী বস্তী দুকাঁ নহী হায়,
খরা জিসে তুম সমঝ্‌তে রহ্‌তে হো ওহ্ কম্ আয়ার হোগা।

তুম্‌হারী তহ্‌যীব আপ্‌নে খঞ্জরসে আাপহী খুদ্‌কশী করেগী
জো শাখে নাযুকপে আইয়ানা বনে গা নাপায়দার হোগা।
বাঙ্গ-ই-দরা

অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ! খোদার লোকালয় দোকান ঘর নয়,
তুমি যাকে খাঁটি সোনা মনে করেছ, এখন সে স্বল্পমূল্য হবে।
তোমাদের সভ্যতা নিজের ছোয়ায় নিজেই করবে আত্মহত্যা,
গাছের ডালে যে পাখির বাসা বাঁধা হয়, সে হবে অস্থায়ী ॥

পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও বস্তুবাদ সম্পর্কে ইকবালের ইসলামী দর্শন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। যার ফলে ইকবাল প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে একমাত্র সুফি ভাব ও সুস্থ ইসলামিক দর্শনই মানব মুক্তি ও কল্যাণের দিশা দিতে সক্ষম। অনেক সময় বস্তুবাদের ভাবপ্রবণতা মানুষের এক ধরনের আবেগ, মানসিক চাঞ্চল্য ও উন্নাসিকতা সৃষ্টি করে। এটা এমন এক মানসিক স্তর যার নিয়ন্ত্রণ মানুষ হারিয়ে ফেলে। এই স্তরে মানুষ কারণ ও যুক্তিবাদ ছাড়া আবেগ দিয়ে পরিচালিত হয়। এটা নিষিদ্ধ। এই অবস্থায় মানুষ যা করে তার উৎপত্তি ভিন্ন এক বৃত্ত থেকে, তখন মানুষ যে সিদ্ধান্ত নেয়, কথা বলে সবই আবেগ উচ্ছ্বাসের ফল বিধায় এই সময় শয়তান বেশি প্রভাব বিস্তার করে; তাই, এ অবস্থায় সব কিছু পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত হয়। এরপরই অনুশোচনা জন্ম নেয়। তাই আমরা বলতে পারি যারা বস্তুবাদে তাড়িত হয়ে ভাবপ্রবণ হয়ে কাজ করে তাদের শেষ কাজ হয় অনুশোচনা করা।

একজন ঈমানদারের চিন্তাভাবনা পরিমিত এবং তার চিন্তার আকাশ মেঘমুক্ত থাকে কেননা তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর নির্দেশনায় হয়। যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন সে কোরআনের নির্দেশনানুসারে কাজ করে এবং এখানে কোন সমঝোতা করে না।

শয়তান মাঝে মাঝে বিশ্বাসীদের ভাবপ্রবণ হতে মন্ত্রণা দেয়। কোরআনে যা আছে তার বিপরীত কিছু করতে অনুপ্রাণিত করে। যেমন, অবিশ্বাসীদের ও কাফেরদের প্রতি ভালবাসা জন্মানো, কোন বিরূপ পরিস্থিতিতে মুষড়ে পড়া বা চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটা এই সব। এই মানসিক বিষয় একমাত্র কোরআনের নির্দেশনা ও রাসুল (সা.) এর সুন্নাত ছাড়া পরিহার করা সম্ভব নয়। তা হলে আল্লাহর সন্তুষ্টিও পাওয়া যাবে, মন ও মনন শীতল হবে।

কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে বিশ্বাসীদের ঐরূপ ভাবপ্রবণ যা বস্তুবাদের যুক্তিকে উপজীব্য মনে করে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কোন ঈমানদারের যেন আল্লাহর শক্রর প্রতি ভালবাসার উদয় না হয় :

www.pathagar.com

তোমরা কখনও এমন দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো সে সব লোকদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে—তারা তাদের পিতাই হোক কিংবা তাদের পুত্রই হোক বা ভাই হোক বা তাদের বংশ-পরিবারের লোক। এরা সেই লোক আল্লাহতা'আলা যাদের হৃদয়ে ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা রূহ দান করে তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের এমনসব জান্নাতে দাখিল করবেন যে সবের নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহমান। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহর প্রতি। এরা আল্লাহর দলভুক্ত লোক। জেনে রাখো, আল্লাহর দলভুক্ত লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।

—সুরা মুজাদালা : ২২

অন্য একটি আয়াতে বলা আছে, যদি কোন ঈমানদার আল্লাহর কোন শত্রুকে ভালবাসে, সে তাকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করবে :

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তুষ্টি লাভের মানসে বের হয়ে থাকো, তা হলে আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধু বানিও না। তোমরা তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো, অথচ যে সত্য তোমাদের নিকট এসেছে তা মেনে নিতে তারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করেছে। আর তাদের আচরণ এই যে, তারা রাসূল এবং স্বয়ং তোমাদেরকে শুধু এ কারণে স্বদেশ হতে নির্বাসিত করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য বের হয়ে থাকো, কেমন করে তোমরা গোপনে তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণী পাঠাও, অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে করো আর যা কিছু প্রকাশ্যে প্রতিটি ব্যাপারই আমি ভালভাবেই জানি। তোমাদের যে ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিত জেনো সে সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

—সুরা মুমতাহিন : ১

এই আয়াতে দেখা যায়, প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য, ভালবাসার বিশ্বাসই মুখ্য। এর বাইরে, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক বন্ধন কোন কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসী না হয় সে খোদার কোন দুশমন একজন বিশ্বাসী বা ঈমানদারের বন্ধু হতে পারে না। কোরআনে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ভাষায় এভাবে বলা হয়েছে :

তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে একটা উত্তম আদর্শ রয়েছে। সে তার জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিল : 'আমি তোমাদের

www.pathagar.com

প্রতি এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মা'বুদের তোমরা পূজা-উপাসনা করো তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরাগভাজন। আমরা তোমাদের সাথে তাবৎ সম্পর্ক অমান্য করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা স্থাপিত হয়েছে ও বিরোধ-ব্যবধান শুরু হয়ে গেছে—যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। ...

—সুরা মুমতাহিন : ৪

এই বিষয়টি অন্যান্য রাসুলদের কাহিনীতেও বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, হযতর ইব্রাহিম (আ.) তার পিতাকে পরিত্যাগ করেন যখন তিনি জানতে পারেন যে তার পিতাকে আল্লাহর শত্রু বলা হয়েছ। (সুরা তাওবা : ১১৪), আমরা হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনায়ও দেখি, তার এক সন্তান ছিল অবিশ্বাসী। আল্লাহ তাকে বলেন : নূহ, সে নিশ্চয়ই তোমার পরিবারভুক্ত নয়। (সুরা হুদ : ৪৬), কেননা একজন বিশ্বাসীর সত্যিকার পরিবার সদস্য হলো অন্য বিশ্বাসীরা। তাই বিশ্বাসীরা যদি অন্য বন্ধু খোঁজায় ব্যস্ত হয় তবে তাদের দোসর শয়তানই হয়।

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে আল্লামা ইকবাল কুরআনের আদর্শকে ধারণ করতে উৎসাহিত করেছেন

আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের সুপ্ত আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

যেমন জার্মান দার্শনিক নিট্‌শে পূর্ণ মনুষ্যকে বলেন সুপারম্যান (Superman)। ইকবাল তাকে বলেছেন 'মর্দে মু'মিন'। তার বর্ণনায় তিনি বলেছেন :

হাথ হায় আল্লাহ বন্দা-এ-মুমিনকা হাথ,
গালিব ও কার-আফরী কার-কুশা কার-সাব।
খাকীও নূরী নিহাদ, বন্দায়ে মাওলা সিফাত,
হরদো জাহাঁ সে গনী উসকো দিল বেনিয়ায়।

অর্থাৎ আল্লার হাত 'মুমিন' মানুষের হাত
শক্তিশালী কর্মস্রষ্টা কর্মপ্রসায়ী কর্মকারী।
পার্থিব কিন্তু স্বর্গীয় স্বভাব, দাস কিন্তু প্রভুর গুণান্বিত,
ইহপরলোকের অভাব রহিত তার হৃদয় নিরুদ্বেগ।

কবির বাণী আল্লাহর সেই মহাবাণীরই প্রতিধ্বনি :
ওয়ালা তাহিনু তাহযানূ ওয়া আনতুমু-ল
আ'লাওনা, ইন কুনতুম মু'মিনীন

www.pathagar.com

নিরুৎসাহ হয়োনা, শোক করো, তোমারই শ্রেষ্ঠ জাতি
যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন (বিশ্বাসী) হও।

একজন বিশ্বাসীকে সঠিক পদ্ধতি ও পন্থা অবলম্বন করা উচিত যাতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারে। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তার সময় ক্ষেপণ করা অনুচিত। কোরআনের আয়াতানুসারে : 'তোমাদের কাজ শেষ হলে, এক প্রভুকে স্মরণ করো, ... (সূরা ইনশিরাহ : ৭) যদি মানুষের কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে না হয় তবে এক কাজ শেষ করার পর সে শয়তানের আরেক কাজে জড়িত হয়ে পড়বে। শয়তানের এই ফাঁদে যে পা দিয়েছে সে দিশেহারা হয়ে যায়, হাজারো খুঁটিনাটিতে মন নিবিষ্ট হয়, আসল উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হয়। অনেক সময় সে যে সকল কাজে ব্যাপ্ত ও ব্যস্ত থাকে তা মূলত কিসের জন্য তারও অর্থ খুঁজে পায় না।
হযরত মুসা (আ.)-এর কাহিনীতে আল্লাহপাক এই অবস্থার এক উদাহরণ দিয়েছেন। মুসা (আ.) তার অনুসারী, ইহুদীদের বলল যে, আল্লাহ তাদের গরু কোরবানীর নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর অনুসারীরা মুসা (আ.)-কে অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন অনেক প্রশ্ন করতে থাকে। গরু কেমন হবে, কি রং হবে, ছোট হবে না বড় হবে কিনা ইত্যাদি প্রচুর প্রশ্ন। মুসা (আ.) যখন সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন তখন দেখা গেল যে এই নির্দেশ মানাই কষ্টকর হচ্ছে।' ...তারা তা কুরবানী করল। কিন্তু অনেকেই তা করতে পারলো না। (সূরা বাকারা : ৭১) তাদের অসহিষ্ণু কথা ...'আপনি কি আমাদের সাথে বিদ্রুপ করছেন? ....' এসব কথায় তার জাতির লোকজন প্রায়ই তাকে অস্বীকারের পর্যায়ে চলে এসেছিল, অন্য কথায় শয়তানের কাছাকাছি অবস্থান করছিল। তাদের ভ্রান্ত যুক্তির মধ্যে শয়তান পরিচালিত প্রতারণা কাজ করছিল। শয়তানী চক্রান্তে, খুঁটিনাটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করায়, কোরবানী ও ত্যাগের কাজটি জটিল রূপ পরিগ্রহ করে এবং অনেকের পক্ষে তা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।
শয়তানের আর একটি সাধারণ ধোঁকা হলো মানুষ যখন কোন ভাল কাজে এবাদতে নিয়োজিত হয় তখন তার একনিষ্ঠতা বিনষ্ট করার জন্য একটি ভাল বা পুণ্য কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। ফলে মানুষ দ্বিতীয় কাজের প্রতি উৎসাহিত হয় ও প্রথম কাজটির একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা দূরীভূত হয়। এভাবে শয়তান মানুষের পুণ্য কাজের মান কমিয়ে দেয় বা বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। আল্লাহ তা'য়ালা কালামে পাকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় সে সকল অবস্থান স্থলের চিত্র অংকন করেছেন যেখানে ইবলিস ও তার সঙ্গীরা চিরকাল থাকবে। নিম্নে আমরা কালামে পাকের কিছু আয়াতাংশের অনুবাদ পেশ করছি যাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইকবাল তাঁর খোদাবাদের দর্শনে প্রত্যেক

www.pathagar.com

মুসলমানদের জন্য কুরআনের শিক্ষা ও বিশ্বনবীর প্রকৃত আদর্শের অনুসরণ করে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরলৌকিক মুক্তি লাভের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি আমাদের সতর্কও করেছেন যেন আমরা শয়তান ও তাঁর কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারি। যা আমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা ও বিশ্বনবীর আদর্শ থেকে দূরে ঠেলে দেয় ইকবাল দর্শনে তা নানাভাবে আলোচিত হয়েছে :

বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী

আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনে কথার ব্যাপারে। প্রকৃত পক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।
আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্য দোযখই যথেষ্ট, আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা।

—বাকারা- ২০৪-২০৬

দীন বিমুখ মানুষ

(ভালো ভাবে জেনে নাও) তোমাদের মধ্যে যারা দীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।

—বাকারা- ২১৭

সুদখোর

অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত রয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা সে ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

—বাকারা-২৭৫

যারা এতিমদের হক ভক্ষণ করে

তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল, অক্ষম সন্তান সন্তুতি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে তারাও আশংকা করে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে

www.pathagar.com

ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। যারা এতিমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং সত্বরই তারা আগুনে প্রবেশ করবে।

—সূরা নিসা-৯-১০

আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতাকারী

এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মত চলে। তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন। যে গুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। যেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

—সূরা নিসা-১৩-১৪

আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকারকারী

এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি যে সব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবো। তাদের চামড়াগুলো যখন আগুনে জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।

—সূরা নিসা-৫৬

মুনাফিক

নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে যাবে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমাবরদার হয়েছে। তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপুণ্য দান করবেন।

—সূরা নিসা- ১৪৫-১৪৬

জুলমকারী

হে বনী আদম! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য হতে পয়গম্বর আগমন করে, তোমাদেরকে আমার আয়াত সমূহ শোনায়। তবে যে ব্যক্তি সংযত হয় এবং সৎ কাজ অবলম্বন করে। তাদের কোন আশংকা নেই। এবং তারা

www.pathagar.com

দুঃখিত হবে না। যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তা থেকে অহংকার করবে। তারাই দোযখী এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালেমকে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের গ্রন্থে লিখিত অংশ পেয়ে যাবে এমনকি যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নেয়ার জন্য পৌছে, তখন তারা বলে ওরা কোথায় গেল? যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আহ্বান করতে? তারা উত্তর দেবে আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফের ছিলো।

আল্লাহ্ বলবেন—তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যে সব সম্প্রদায় চলে গেছে তাদের সাথে তোমরাও দোযখে চলে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে, তখন অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি যখন সবাই তাতে পতিত হবে তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিলো, অতএব আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ্ বলবেন—প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ, তোমরা জান না। পূর্ববর্তীরা পবর্তীদের বলবে, তাহলে আমাদের ওপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে।

—সুরা আল-আরাফ-৩৫-৩৯

দীন নিয়ে তামাশাকারী

জান্নাতীরা দোযখীদের ডেকে বলবে—আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। অতএব তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে, হ্যাঁ, অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে—আল্লাহ্র অভিসম্পাত যালেমদের ওপর। যারা আল্লাহ্র পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিলো। উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আরাফের ওপর অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদের ডেকে বলবে—তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। যখন তাদের দৃষ্টি দোযখীদের ওপর পড়বে। তখন বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ যালেমদের সাথী করো না। আরাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে—তোমাদের দলবল ও উদ্ধত তোমাদের কোন কাজে আসেনি। এরা কি তারাই যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি

www.pathagar.com

অনুগ্রহ করবে না। প্রবেশ কর জান্নাতে তোমাদের কোন শংকা নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।
দোযখীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে—আমাদের ওপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও, তারা বলবে—আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন। তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিক জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলো এবং যেমন তারা আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করত।

—আরাফ- ৪৪-৫১

সম্পদ জমা করা

আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (যে দিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে সুতরাং এখন আস্বাদন কর জমা করে রাখার স্বাদ।

—আত-তাওবাহ- ৩৪-৩৫

অপকর্মকারী

আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ অসৎ কর্মের বদলায়, সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের মুখ-মণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে, এরা হর দোযখবাসী, এরা এতেই থাকবে অনন্তকাল।

—ইউনুস-২৭

স্বীয় রবকে অস্বীকারকারী

আপনি যদি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে তাদের এ কথা বিস্ময়ের যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব তখনও কি নতুন ভাবে সৃজিত হব? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই লৌহ শৃংখল পড়বে এবং এরাই দোযখী, এরা তাতে চিরকাল থাকবে।

—সুরা রা'দ ০৫

www.pathagar.com

স্বীয় রবের আদেশ অমান্যকারী

যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সব কিছু থাকে এবং তার সাথে এর সমপরিমাণ আরও থাকে তবে সবই নিজেদের মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দেবে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান।

—সুরা রা'দ-১৮

আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গকারী

যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

—সুরা রা'দ-২৫

শয়তানের প্রতিশ্রুতিতে ভরসাকারী

সবাই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে আমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। অতএব, তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে কিছু মাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে—যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুতি হই বা সবর করি সবই সমান। আমাদের রেহাই নেই। যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে—নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের ওপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিলো না। কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ এখন তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা যালেম তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

—ইবরাহিম- ২১-২২

নবীদের দাওয়াতের বিপরীত আমলকারী

যে দিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীতে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশ সমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে পেশ

www.pathagar.com

হবে। তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পর শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখ-মণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

—সূরা ইবরাহিম- ৪৮-৫১

হক্ব অস্বীকারকারী

বলুন—সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি যালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।

যার বেষ্টনি তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখ-মণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।

—সুরা কাহাফ-২৯

আল্লাহ্র সাথে শরীককারী

যে দিন তিনি বলবেন, তোমরা যাদরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব একটি মৃত্যু গহ্বর। অপরাধীরা আগুন দেখে জেনে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না।

—সুরা কাহাফ- ৫৩-৫৩

অহংকারী

মানুষ বলে আমার মৃত্যুর পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতোপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিলো না। সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চার পাশে উপস্থিত করব। অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্র সর্বাধিক অবাধ্য। আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকযোগ্য। আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য

www.pathagar.com

ফয়সালা। অতঃপর আমি পরহেজগারদেরকে উদ্ধার করবো এবং যালেমদের নতজানু অবস্থায় সেখানে ছেড়ে দেব।

—সুরা মারইয়াম- ৬৬-৭২

অন্যায়কারী

নিশ্চয় যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না।

—সুরা ত্বোয়া-হা-৭৪

জুলুমের বোঝা বহনকারী

সে দিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে। যার কথা এদিক সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদুগুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে না, সেই চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী সত্তার সামনে সব মুখ-মণ্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে।

—সুরা তোয়াহা, ১০৮-১১১

কুফুরী কাজ সম্পাদনকারী

এ দুই বাদী-বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব, যারা কাফের তাদের জন্যে আগুনের পোষাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি, তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে—দহন শাস্তি আস্বাদন কর।

—সুরা হজ্জ, ১৯-২২

নিজেকে দোযখে নিক্ষেপকারী

যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে—হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এতো তার একটি কথার কথামাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না। এবং একে

www.pathagar.com

অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা বীভৎস আকার ধারণ করবে। তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হতো না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। তারা বলবে—হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর। আমরা যদি পুনরায় তা করি তবে আমরা গোনাহ্গার হবো। আল্লাহ্ বলবেন—তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের এক দল বলত—হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে, এমনকি তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম, আল্লাহ্ বলবেন—তোমরা পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়। তারা বলবে—আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব, আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আল্লাহ্ বলবেন তোমরা তাতে অল্প দিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে? তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?

—সূরা আল-মুমিনুন-৯৯-১১৫

কিয়ামতকে অস্বীকারী

বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে আমি তার জন্যে আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। আগুন যখন তাদেরকে দূর থেকে দেখবে—তখন তারা শুনতে পারবে তার গর্জন ও হুংকার। যখন এক শিকলে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে—আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকোনা, অনেক মৃত্যুকে ডাকো।

—সূরা ফুরকান- ১১-১৪

পূজাকারী

(কিয়ামতের দিন) জান্নাত আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। তাদেরকে বলা হবে—

www.pathagar.com

তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। ইবলিস বাহিনীর সকলকে তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে—আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম। যখন আমরা তোমাদের বিশ্ব পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। আমাদেরকে দুষ্ট কর্মীরাই গোমরাহ করেছিলো। অতএব, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন সুহৃদ বন্ধুও নেই। হায় যদি কোন রূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম তবে আমরা বিশ্বাসস্থাপনকারী হয়ে যেতাম।

—সুরা আশ্-শুআরা-৯০-১০২

মন্দকাজকে সঙ্গী গ্রহণকারী

যে ব্যক্তি মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাকে আগুনে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে তোমরা যা করেছিলে তারই প্রতিফল তোমরা পাবে?

—সুরা নমল-৯০

দাম্ভিক

যখন ওদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন ওরা দম্ভের সাথে এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দু'কান বধির। সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।

—সুরা-লোকমান, ৭

অবিশ্বাসী

যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব, আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি। আমি ইচ্ছা করলে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম। কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবো। অতএব, এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। আমিও তোমাদের ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর।

—সুরা সেজদাহ- ১২-১৪

www.pathagar.com

অবাধ্যতাকারী

যারা অবাধ্য হয় তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।

—সূরা সেজদাহ-২০

আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কে কষ্টদানকারী

যারা আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন অবমাননা কর শাস্তি। যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

—সূরা আহযাব-৫

কিয়ামত নিয়ে হাস্যরসকারী

লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলুন—এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। আপনি কি করে জানবেন যে, সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন আগুনে তাদের মুখ-মণ্ডল ওলট পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে—হায় আমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতাম।

তারা আরো বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন।

—সূরা আহযাব- ৬৩-৬৮

আল্লাহর আয়াতকে ব্যর্থ প্রমাণের অপচেষ্টাকারী

কাফেররা বলে—আমাদের ওপর কিয়ামত আসবে না, বলুন—কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তার অগোচরে নয় অণু-পরমাণু কিছু। না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। তিনি পরিণামে যারা মুমিন ও সৎকর্ম পরায়ন, তাদেরকে প্রতিদান দিবেন, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও

www.pathagar.com

সম্মানজনক রিযিক। আর যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায় তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

—সুরা সাবা- ৩-৫

কুরআনকে অবিশ্বাসকারী

কাফেররা বলে—আমরা কখনও এ কুরআনকে বিশ্বাস করবো না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবও নয়। আপনি যদি পাপীদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।
অহংকারীরা দুর্বলদের বলবে—তোমাদের কাছে হেদায়েত অসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম বরং তোমরাইতো ছিলে অপরাধী।
দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে বরং তোমরাই তো দিন রাত চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তার অংশীদার সাব্যস্ত করি। তারা যখন শাস্তি দেখবে তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। বস্তুত আমি কাফেরদের গলায় বেড়ী পরাব। তারা সে প্রতিফলকেই পেয়ে থাকে যা তারা করত।

—সুরা সাবা-৩১-৩৩

অকৃতজ্ঞ

আর যারা কাফের হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন—তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে—হে আমাদের পালনকর্তা! বের করুন আমাদেরকে আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? ওপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল অতএব আস্বাদন কর। যালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।

—সুরা ফাতির- ৩৬-৩৭

কিয়ামতে কী হবে?

তারা আল্লাহকে যথার্থ রূপে বোঝেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আসমান সমূহ ভাজ করা থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

www.pathagar.com

শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেঁহুশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে। আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও স্বাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে, তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। প্রত্যেকে যা করেছে তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে, তখন তার দরোজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে—তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোন পয়গম্বর আসেনি। যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াত সমূহ আবৃত্তি করতো এবং সতর্ক করতো এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে হ্যাঁ। কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। বলা হবে—তোমরা জাহান্নামের দরোজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।

—সূরা আল-যুমার-৬৭-৭২

ফয়সালার দিনকে অস্বীকারকারী

সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র, যখন তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে, (ঐ সব জিনিষ যে গুলোর সংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো তখন) বলবে—দুর্ভাগ্য আমাদের। এটাইতো প্রতিফল দিবস। বলা হবে—এটাই ফয়সালার দিন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। একত্রিত করা হবে গোনাহ্গারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের ইবাদত তারা করতো আল্লাহ্ ব্যতীত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত করা হবে জাহান্নামের পথে।

—সূরা আস-সাফফাত- ১৯-২৩

জাহান্নামের অতলে নিপতিত ব্যক্তি

(জান্নাতবাসীগণ) একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের একজন বলবে—আমার এক সঙ্গী ছিল। সে বলতো, তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হবো? আল্লাহ্ বলবেন—তোমরা কি তা উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। সে বলবে—আল্লাহর কসম, তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে

www.pathagar.com

দিয়েছিলে—আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না থাকলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না। আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হবো না। নিশ্চয় এই মহা সাফল্য। এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।
এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ? আমি যালেমদের জন্যে একে বিপদ করেছি। এটি একটি বৃক্ষ। যা উদ্‌গত হয় জাহান্নামের মূলে। এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদরপূর্ণ করবে। তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। তারা তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছিলো বিপথগামী অতঃপর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে তৎপর ছিলো। তাদের পূর্বেই অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিলো, আমি তাদের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছিলাম।

—সুরা আস সাফফাত- ৫০-৭২

দুষ্টলোক

দুষ্টদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা। তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব, কত নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল। এটা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ। অতএব, তারা একে আস্বাদন করুক। এধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। এই তো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য অভিনন্দন নেই। তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তারা বলবে—তোমাদের জন্যতো অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। অতএব, এটি কতই না ঘৃন্য আবাসস্থল। তারা বলবে—হে আমাদের পালনকর্তা, যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে, আপনি জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। তারা আরও বলবে—আমাদের কি হলো যে, আমরা যাদেরকে মন্দলোক বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে এখানে দেখছি না, আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে দিয়েছিলাম, না আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? এটা অর্থাৎ জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী।

—সুরা ছোয়াদ- ৫৭-৬৪

আসল দেউলিয়া

অতএব, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে ইচ্ছা তার ইবাদত কর। বলুন—কিয়ামতের দিন তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের জন্যে ওপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা

www.pathagar.com

থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালা তার বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ! আমাকে ভয় কর।

—সুরা আল-যুমার-১৫-১৭

আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারী

তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর। তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে। যাতে কেউ না বলে, হায়, হায় আল্লাহ্ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

অথবা না বলে, আল্লাহ্ যদি আমাকে পথ প্রদর্শন করতেন। তবে অবশ্যই আমি পরহেজগারদের একজন হতাম। অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোন রূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎ কর্মপরায়ন হয়ে যাব। হ্যাঁ তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল, অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে।

যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি?

—সুরা আল-যুমার-৫৫-৬০

অন্যায়ে উল্লাসকারী

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা কোথায় ফিরছে? যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। অতএব, সত্বরই তারা জানতে পারবে। যখন বেড়ি ও শৃংখল তাদের গলদেশে পড়বে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে। অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে—ওরা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে। বরং আমরাতো ইতোপূর্বে কোন কিছুর পূজাই করতাম না। এমনিভাবে আল্লাহ্ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। এটা এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। প্রবেশ কর তোমরা জাহান্নামের দরোজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য। কত নিকৃষ্ট দাম্ভিকদের আবাসস্থল।

—সুরা মুমিন-৬৯-৭৬

www.pathagar.com

আল্লাহর শত্রু

যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কোন কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। অতঃপর যদি তারা সবুর করে, তবুও জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা ওযর জাহির করে, তবে তাদের ওযর কবুল করা হবে না। আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম অতঃপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আগমন তাদের দৃষ্টি শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল। যা বাস্তবায়িত হয়েছিলো তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

—সূরা হা-মীম সেজদাহ ১৯-২৫

প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কারা?

পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা বলছে—আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি? জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবনত এবং অর্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মুমিনরা বলবে—কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার পরিজনদের ক্ষতি সাধন করেছে। শুনে রাখ, পাপাচারীরা স্থায়ী আযাবে থাকবে।

আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন গতি নেই

—সূরা আশ-শুয়ারা-৪৪-৪৬

আপরাধীদের কী আর হবে?

নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। আমি তাদের প্রতি

www.pathagar.com

জুলুম করিনি কিন্তু তারাই ছিল যালেম। তারা ডেকে বলবে—হে মালেক! পালনকর্তা আমাদের কিসসাই শেষ করে দিন। সে বলবে—নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে—তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম পৌছেছিলো। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মে নিস্পৃহ।

—সুরা আয্-যুখরুফ-৭৪-৭৮

দোযখীদের আহার

নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ, পাপীদের খাদ্য হবে। গলিত তামার মত পেটে ফুটতে থাকবে। যেমন ফুটে পানি। একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব ফেলে দাও। স্বাদ গ্রহণ কর। তুমিতো সম্মানীত-সম্ভ্রান্ত। এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে।

—সুরা আদ-দোখান-৪৩-৫০

কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী

আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়, প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে, তোমরা যা করতে আজ তার প্রতিফল দেয়া হবে। আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছ ও সৎকর্ম করেছ। তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন, এটাই প্রকাশ্য সাফল্য। আর যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাদের কাছে কি আয়াত সমূহ পঠিত হতো না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।

যখন বলা হতো—আল্লাহর ওয়াদ সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে জানি না কিয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো তা তাদেরকে গ্রাস করে নেবে।

বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব। যেমন তোমরা এদিনের সাক্ষাৎ কে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই। এটা এজন্যে যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত

www.pathagar.com

করেছিলো। সুরতাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবাও চাওয়া হবে না।

—সুরা আল-জাসিয়া ২৮-৩৫

অনুমান ও ধারণায় সিদ্ধান্তদাতা

অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক। যারা উদাসীন, ভ্রান্ত। তারা জিজ্ঞাসা করে—কিয়ামত কবে হবে? যে দিন তারা আগুনে পতিত হবে। তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

—সুরা আয-যারিয়াত- ১০-১৪

যালেম

অতএব, এই যালেমদের প্রাপ্য তাই যা ওদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিলো। কাজেই ওরা যেন তা আমার কাছে তাড়াতাড়ি না চায়। অতএব, কাফেরদের জন্যে দুর্ভোগ সেই দিনের, যেদিনের প্রতিশ্রুতি ওদেরকে দেয়া হয়েছে।

—সুরা আয-যুরিয়াত ৫৯-৬০

মিথ্যারোপকারী

সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছিমিছি কথা বানায়। সেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে এই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্যে সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

—সুরা আত্‌তুর- ১১-১৬

অপরাধীদের অবস্থা কেমন হবে?

হে জীবন ও মানবকুল, ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ব্যাপ্তি অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকর করবে? ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে, যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্ত বর্ণে রঞ্জিত

www.pathagar.com

চামড়ার মত হয়ে যাবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?
সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন? অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে, অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? এটাই জাহান্নাম যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলতো। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। অতএব, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

—সূরা আর-রাহমান-৩৩-৪৫

বামপার্শ্বস্থ লোকদের অবস্থা

বামপার্শ্বস্থ লোক, কতই না হতভাগ্য তারা। তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে ও উত্তপ্ত পানিতে এবং ধুম্র কুঞ্জের ছায়ায়। যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। তারা ইতোপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল তারা সদা সর্বদা ঘোরতর পাপ কাজে ডুবে থাকত। তারা বলতো আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব। তখনও কি পুনরুত্থিত হবো? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণও। বলুন—পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর, হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারীগণ তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে।

—সূরা আল ওয়াক্বিয়া- ৪১-৫২

যারা ঈমানকে হেফাজত করেনি

মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবার পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ তারা আল্লাহ তা'য়ালা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে
হে কাফের সম্প্রদায়! তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে।

—সূরা আত্-তাহরীম- ৬-৭

যারা পরকাল সম্পর্কে ভাবেনি

যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান, যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার

www.pathagar.com

উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি?
তারা বলবে—হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিলো, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ তা'য়ালা কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ।
তারা আরও বলবে—যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক।

—সুরা আল-মুলক- ৬-১১

যারা সেজদা করেনি

গোছ পর্যন্ত পা খোলা দিনের কথা স্মরণ কর। সেদিন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হবে। তবে তারা তাতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হতো।

—সুরা আল-কালাম- ৪২-৪৩

যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে

যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। সে বলবে—হায়, আমার আমল নামা যদি আমায় না দেয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। আমার ধন সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না, আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল, ফেরেশতাদেরকে বলা হবে ধর একে, গলায় বেড়ি পড়িয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। অতঃপর তাকে শৃংখলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করতো না।
অতএব, আজকের দিনে এখানে তার কোন সুহৃদ নেই এবং কোন খাদ্য নেই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত গোনাহগার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।

—সুরা আল-হাক্কাহ-২৫-৩৭

যে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়

সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত এবং পর্বত সমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত। বন্ধু বন্ধুর খবর নেবে না। যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে; তার স্ত্রীকে

www.pathagar.com

তার ভ্রাতাকে। তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, তবুও নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। কখনও নয়, নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে। সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল এবং বিমুখ হয়েছিল, সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল।

—সূরা আল মাআরিজ- ৮-১৮

যে খারাপ কাজ করেছে

প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। কিন্তু ডানদিকস্থরা, তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে, বলবে—তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে—আমরা নামায পড়তাম না। অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। অতএব, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।

—সূরা আল-মুদ্দাসসির-৩৮-৪৮

মিথ্যাবাদীরা

চল তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। চল তোমরা তিন কুণ্ডলী বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। যে ছাঁয়া সুনিবিড় নয় এবং আগুনের উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। যেন সে পীতবর্ণ উষ্টশ্রেণী। সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না। সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

—সূরা মুরসালাত- ২৯-৩৭

সীমালংঘণকারী

নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে। সীমালংঘণকারীদের আশ্রয়স্থল রূপে তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। তথায় তারা কোন শীতল পানীয় আস্বাদন করবে না। কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। নিশ্চয় তারা হিসাব নিকাশ আশা করত না এবং আমার আয়াত সমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করতো। আমি সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত

www.pathagar.com

রেখেছি। অতএব, তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব।

—সূরা নাবা- ২১-৩০

পার্থিব জীবনকে প্রাধান্যদানকারী

অতএব, যখন মহাসংকট এসে যাবে অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘণ করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

—সূরা নাযিআত- ৩৪-৪১

খারাপ লোক

এবং যাকে আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে। সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে তার পরিবার পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিলো। সে মনে করত যে, সে কখনো ফিরে যাবে না। কেন যাবে না, তার পালনকর্তাতো তাকে দেখতো।

—সূরা ইনশিক্বাক- ১০-১৫

অবাধ্য মানুষ

আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে, কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকারে আসবে না।

—সূরা গাশিয়াহ- ১-৭

যারা হাক্কুল ইবাদের প্রতি খেয়াল করেনি

মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন, এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন। তখন বলে আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন, এটা অমূলক। বরং তোমরা এতিমকে সম্মান কর না এবং মিসকীনকে অনুদানে পরস্পরকে

www.pathagar.com

উৎসাহিত কর না এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল এবং তোমরা ধন সম্পদকে প্রাণ ভরে ভালবাস। এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হবে এবং আপন পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? সে বলবে—হায়, এ জীবনের জন্য যদি আমি কিছু আগে প্রেরণ করতাম, সেদিন তার শাস্তির মত কেউ শাস্তি দেবে না এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দেবে না।

—সূরা আল ফাজর- ১৫-১৬

আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারী

আর যারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে তারাই হতভাগ্য। তারা আগুন পরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্ধ থাকবে।

—সূরা বালাদ- ১৯-২০

যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে

অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্জলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে। যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

—সূরা লাইল- ১৪-১৬

প্রাচুর্যের লালসা

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। এমনকি (এ চিন্তা নিয়েই) তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও। এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে। যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। তা অবশ্যই দিব্য প্রত্যয়ে, এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

—সূরা তাকাসুর- ১-৮

পরনিন্দাকারী

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে। সে মনে করেছে তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। কখনও না সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে। এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে। লম্বালম্বি খুঁটিতে।

—সূরা হুমাযাহ-১-৯

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইকবাল চর্চা

আল্লামা ইকবাল তাঁর কাব্য সাধনার সুখ্যাতি জীবদ্দশায়ই অবলোকন করে গেছেন। ১৯০৮ সালে পাশ্চাত্যের প্রাণকেন্দ্র লন্ডনে ডক্টরেট ডিগ্রীর থিসিস গ্রন্থ Development of Metaphysics in persia এবং ১৯২০ সালে 'আসরারে খুদী' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ Secrets of Self প্রকাশিত হলে বিশ্বের খ্যাতনামা জ্ঞানী-গুণী, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর কালজয়ী প্রতিভার পরিচিতি সীমানা বিস্তৃত করে বিশ্বের নানা ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। ইকবাল তখন মুসলিম দুনিয়ার গন্ডি অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে একজন বহুল আলোচিত সমালোচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে।

উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের জ্ঞানী-গুণী মহলেও ইকবালের কাব্য-সাধনার ছোঁয়া লেগেছে। একই ভাষাভাষী ও একই ভূখণ্ডে অধিক সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠী বসবাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। তৎকালীন সময়ে প্রায় দশ কোটি এবং বর্তমানে ষোল কোটির অধিক উম্মতে মুহাম্মদী (সা.) এদেশে বসবাস করছেন। তাই বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণকারী একটি দেশ। স্বাভাবিকভাবে তাই জানসাধারণ তথা সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইকবাল-সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার প্রসঙ্গ আসে। এজন্য আমরা বাংলাদেশে ইকবাল চর্চা পর্যায়ে কিছু তথ্য পেশ করতে চাই।

এক.

ইকবালের বেশ কয়েকটি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য দু'একটি ছাড়া অধিকাংশ অনুবাদ গ্রন্থই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নানা কারণে ইকবাল-কাব্যের খুব একটা আলোচনা হয়নি। বিগত কয়েক বছর থেকে ইকবাল প্রতিভার পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছে মাত্র।

১৯৮১ সালে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা' (ফররুখ আহমদ অনূদিত) বইটি স্বাধীনতাত্তোর প্রকাশিত ইকবালের লেখা থেকে প্রথম কাব্য-গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে

www.pathagar.com

ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া' বইটির পুনর্মুদ্রণও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হলো আজ ইকবালের প্রকাশিত কোন বইয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

দুই.

বলা বাহুল্য বাংলাদেশে আল্লামা ইকবালকে জীবন্ত রেখেছেন বাংলাদেশের আলেম সমাজ। বলা যায় বাংলাদেশের প্রকাশনা-জগতে ইকবাল চর্চার দীনতা সত্ত্বেও এদেশের ওলামা-মাশায়েখ, বক্তা-ওয়ায়েজগণের মাধ্যমে ইকবালের সের ও মর্মস্পর্শী বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছেছে সর্বতোভাবে। ইকবাল পবিত্র কুরআনের মাহত্ম্য, গীত, অনুভূতি ও নবীর প্রেম ও আদর্শকে মুসলিম জাতির সামনে এমন মর্মস্পর্শী ও আকুলভাবে পেশ করেছেন যে তাদের হৃদয়ে আল্লাহর স্মরণ ও নবীর প্রেম জাগ্রত হয়ে খাঁটি মুমিন হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে তিনি সফল স্বার্থক হয়েছেন। তাঁর সুফি মননের দ্যুতি ও দিক-নির্দেশনা সমগ্র বিশ্বের মুসলিম হৃদয়কে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ও নবীর প্রেম ও আদর্শের পথে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। তাই তাঁর রচিত উর্দু ও ফার্সী সেরের মধ্যে যেমন আল্লাহর প্রশংসাগীতি ও মাহত্ম্যের মর্মস্পর্শী আবেদন জীবন্ত ভাবে মুসলিম হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে তেমনি নবীর প্রেম ও আদর্শের বর্ণনা ও প্রশংসাও গভীরভাবে তাদের অন্তরকে ঝলসে দিয়েছে। সকলের হৃদয়ে ইশকের নহর প্রবাহিত হয়েছে।

তাই এদেশের ইসলামী সম্মেলন, সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, ওয়াজ মাহফিল ও ইসলামী সাহিত্যে ইকবাল কাব্যের প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়। বস্তুতপক্ষে বলতে গেলে পারস্যের বিখ্যাত সুফি সাধক আল্লাম জালালুদ্দীন রুমি (রা.)-এর মসনবী শরিফের পরই আল্লামা ইকবালের শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ার জনপ্রিয়তা নির্ণয় করা যায়। অতএব আমরা একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি, আল্লামা ইকবাল এদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত নাম।

তিন.

ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অধুনালুপ্ত ইকবাল একাডেমী, ঢাকা (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার। এ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন মরহুম মিজানুর রহমান, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ মনীষী। তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একাডেমীর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হচ্ছে– ১. প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান (Development of Metaptysics in

www.pathagar.com

persia) মূল ড. মুহাম্মদ ইকবাল; অনুবাদ কামালুদ্দিন খান (১৩৭২ বাংলা), ২. আরমুগানে হিজায (হেজাযের সওগাত), মূল ড. মুহাম্মদ ইকবাল; অনুবাদ : গোলাম সামদানী কোরাইশী, ৩. ইকবাল : দেশে-বিদেশে : সম্পাদনা মিজানুর রহমান (আশ্বিন ১৩৭৪ বাংলা), কালাম-ই-ইকবাল (নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ) গোলাম মোস্তফা (১৯৫৯ ইং) এসব গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য এবং অনেক গ্রন্থের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমি আল্লামা ইকবালের সমগ্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ অনেক কষ্ট করে নানাভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের চেষ্টা করেছি। এসবের অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক রহস্যের সন্ধান পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছি। এসবের মধ্যে রয়েছে ইকবালের সুফি কাব্য ও তত্ত্ব রহস্য, আত্মবিলয়ের রহস্য, খোদাতত্ত্ব, নবীপ্রেম তত্ত্ব ও আদর্শের অনুসরণ এবং নানা রচনা নিয়ে প্রকাশিত 'ইকবাল সমগ্র' গ্রন্থটি বিরাট কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে সালমা বুক ডিপো ৩৮/২ ক বাংলাবাজার থেকে।

চার.

বিশিষ্ট সাহিত্যিক মোহাম্মদ সুলতানও 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া' অনুবাদের জন্য সরাসরি ইকবালের কাছ থেকে অনুমতি পত্র লাভ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত পুস্তকটি ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ অনুবাদের ভাষাও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এ বইয়ের শীর্ষভাগেও আল্লামা ইকবালের সহস্তে লিখিত 'অনুমতি পত্র' এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের স্বহস্তে লিখিত' প্রশংসাপত্র পাঠক-পাঠিকাদেরকে আনন্দে আপ্লুত করে। নজরুলের অভিমতটি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

'সুলতান এর 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'র' কাব্যানুবাদ পড়লাম আসল শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া পাশে রেখে। অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সার্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের অপূর্ব সৃষ্টি এই 'শেকওয়া' ও 'জওয়াবে শেকওয়া'। উর্দু-হিন্দী-ভাষী ও বাংলাভাষী ভারতবাসীর মুখে মুখে আজ শেকওয়ার বাণী। সেই বাণীকে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত দুরূহ মনে করেই আমি এতে হাতে দিতে সাহস করিনি। কবি সুলতানের অনুবাদ পড়ে বিস্মিত হলাম। অরিজিন্যাল ভাবতে এতটুকু অতিক্রম না করে এর অপরিমাণ সাবলীল সহজ গতিভঙ্গি দেখে। পশ্চিমের বোরকা পরা মেয়েকে বাঙলার শাড়ির অবগুণ্ঠনে যেন আরো বেশি মানিয়েছে। (স্বাক্ষর : নজরুল ইসলাম, ১৫ই ভাদ্র ১৩৭৪ বাংলা)।

১৯৮৪ সালে অনুবাদ গ্রন্থটির ৩য় সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এটিও এখন দুষ্প্রাপ্য।

www.pathagar.com

পাঁচ.

বাংলা ভাষায় অনূদিত কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ার অনুবাদই হয়েছে সর্বাধিক। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, স্বাধীনতা (১৯৭১) পূর্বকালে ছয়জন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদকরা হলেন– ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রকাশকাল : ১৯৪৫), আশরাফ আলী খান, (প্রকাশকাল : ১৯৪৬), মীজানুর রহমান (প্রকাশকাল : ১৯৫৩), আশরাফ আলী খান (প্রকাশকাল : ১৯৫৫), মাওলানা তমীযুর রহমান (প্রকাশকাল : ১৯৩৮ শেকওয়া, ১১৪৬ জওয়াবে শেকওয়া) মনীরুদ্দীন ইউসুফ (প্রকাশকাল : ১৯৬০)।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. ইকবাল : জীবন ও বাণী– ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রেনেসাঁস পাবলিকেশন্স ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫ ও দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৪৯, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

২. মহাকবি ইকবাল : লতীফা রশীদ, ১৩৫৪ বাংলা, বৃন্দাবান ধর বুক হাউস, ঢাকা।

৩. ইকবালয : ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৫৮, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স।

৪. আল্লামা ইকবাল : আবু যোহা নূর মোহাম্মদ, পাক কিতাব ঘর, ঢাকা প্রথম প্রকাশ ১৯৬০।

৫. ইকবালের শিক্ষা দর্শন : মূল : খাজা গোলাম সাইয়েদাঈন, অনু : সৈয়দ আবদুল মান্নান, অনুবাদ কাল ১৯৪৫-৪৬, প্রকাশকাল ১৯৫৮, মাহফুজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৬. ইকবাল : দেশে-বিদেশে : সম্পাদনা–মীযানুর রহমান, ইকবাল একাডেমী, ঢাকা (পূর্ব পাকিস্তান) ১৯৬২ ইং।

৭. আসরারে খুদী : ড. মুহাম্মদ ইকবাল। অনু সৈয়দ আবদুল মান্নান, আল-হামরা লাইব্রেরী, কলিকাতা। তমদ্দুন পাবলিকেশন্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৪৫।

৮. রুমূযে বেখুদী : ড. মুহাম্মদ ইকবাল, অনুবাদ : আবুল ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক ফরীদী, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, পাকিস্তান, পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৯. হেজাযের সওগাত (আরমুগানে হিজায) ড. মুহাম্মদ ইকবাল অনুবাদ : গোলাম সামদানী কোরাইশী, ইকবাল একাডেমী, করাচী, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৬২।

১০. প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান (Development of Metaptysics in persia) ড. মুহাম্মদ ইকবাল। অনুবাদ : কামালুদ্দীন খান, ইকবাল একাডেমী। প্রকাশকাল ১৩৭২ বাংলা।

১১. কালাম-ই-ইকবাল : (নির্বাচিত কবিতা সংকলন) অনুবাদ : গোলাম মোস্তফা, ইকবাল একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৫৯।

১২. ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন (The Reconstruction of Riligious Thought in Islam) ড. মুহাম্মদ ইকবাল। অনুবাদ : কামালুদ্দীন খান, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, আ. ফ. মু. আবদুল হক ফরীদী। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩।

১৩. ইকবালের কাব্য-সঞ্চয়ন : মনীর চৌধুরী ইউসুফ : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০।

১৪. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা : (অনুবাদ) ফররুখ আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ১৯৮১।

১৫. ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৬. রুবাইয়াতে হাফিজ–কাজী নজরুল ইসলাম।

১৭. রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম–কাজী নজরুল ইসলাম।

www.pathagar.com